জ্যৈষ্ঠের হলুদ দুপুর

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক

সাহিত্যশ্রী

৭৩, এম. জি. রোড

কলিকাতা-৯

১

সবাই মিলে বাইরে এসে সর্বাণীর ব্যাকইয়ার্ডে বসল। জ্যোৎস্নার আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। অনেক রাত হয়েছে। চারিদিক নিঃঝুম চুপচাপ। সর্বাণীর বাগানে বেল জুঁই আর হানিসাক্‌ল ফুটে আছে অসংখ্য। ফেন্সের চারিদিকে গোলাপ আর মরশুমি ফুলের সমারোহ। গ্রীষ্মের উতল বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। বাইরে একটা গোলটেবিলের পাশে অনেকগুলো সাদা প্লাস্টিকের চেয়ার। সবাই বসে পড়ল মুখোমুখি, টেবিলটাকে ঘিরে— লাবকের জ্যোৎস্নার রাতে।

টেক্সাসের এক ছোট্ট শহর এই লাবক। লোকসংখ্যা দু' লাখের মতো। ছোট্ট য়ুনিভার্সিটি টাউন। এই শহরের সব-কিছু গড়ে উঠেছে টেক্সাস টেক্ য়ুনিভার্সিটি ঘিরে। এই শহর ডালাস বা হিউস্টনের মতো মেট্রোপলিস হয়ে ওঠেনি। তি ন হাজার ফুট উঁচু— সাদার্ন হাইপ্লেনস। যতদূর দেখা যায় সমতলভূমি। কোনও উঁচু-নিচু জমি নেই। এখানে না আছে পাহাড় না আছে সমুদ্র। এখানে গাছপালা কম। বিরাট আকাশ। বড় শহরের মতো এখানে মানুষের ভিড় নেই। পরিষ্কার ছিমছাম শহর। এখানে শব্দদূষণ কম। গাড়ি দুর্ঘটনা, খুন, জখম, ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি— ইভনিং নিউজের প্রধান খবর নয়। প্রকৃতি এখানে রুক্ষ। গ্রীষ্মে যেমন দাবদাহ, শীতে তেমনি হাওয়া আর বরফের ঝড়। বসন্তের শুরুতে মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় আর টর্নেডো। র‍্যাঞ্চিং, পেট্রোলিয়াম আর তুলোর জন্য সমৃদ্ধিশালী এই লাবকের চারপাশের ছোট ছোট জনপদ। এখানে এখনও দেখা যায় সত্যিকারের কাউবয় ঘোড়ায় চড়ে ধুলো উড়িয়ে হাজার হাজার গোরু নিয়ে যাচ্ছে। এইসব রাখাল ছেলেদের হাতে কৃষ্ণের বাঁশি নেই। এর পরিবর্তে কোমরে গোঁজা রিভলভার। মাথায় ময়ূরের পালকের মুকুট নেই, আছে বিরাট কাউবয় হ্যাট।

চারিদিকে দিশি ফুলের গন্ধে মুন্নিকে যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। একগুচ্ছ হানিসাক্‌ল খোঁপায় গুঁজে মুন্নি জিজ্ঞেস করে, "আমাদের দেশে এই ফুলকে কী বলে জান?"

অনি বলে, "শহরের লোকেরা বলে 'মধুমালতী'। সাঁওতাল গ্রামে এর নাম

শুনেছি 'রাতসোহাগী'। এই উগ্র মধুর গন্ধে মেয়ে-মরদদের পাগল করে দেয়। ওরা ঘর ছেড়ে বাইরে খোলা আকাশের নীচে, আগুন জ্বালিয়ে মাদল বাজিয়ে সারারাত নাচে এই ফুলের নেশায়।"

রাণা বলে, "অনিদার কথা বিশ্বাস কোরো না মুন্নিদি। অনিদা চিরকালের রোম্যান্টিক। কাব্য করে বানিয়ে বানিয়ে বলছে।"

মুন্নি চেয়ারটায় আরাম করে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, "সামারের রাতে লাবকটা অদ্ভুত ভাল লাগে। একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। কোনও পলিউশন নেই। পোকামাকড় নেই। মশা মাছি নেই। আমি এত নীল আকাশ আর ঝকঝকে তারার মালা লস্ এঞ্জেলেসে কখনও দেখিনি। সত্যি ওপরে তাকিয়ে দেখো, কোটি কোটি তারার সমারোহ, কোটি কোটি গ্যালাক্সি, কী বিরাট ইউনিভার্স। তার মাঝে ছাদনাতলার নীচে আমরা ক'জন বসে আছি। ভাবতেই কেমন লাগে? কতদিন আকাশ দেখিনি এমন করে। খুব ছোটবেলা বাবা আমাকে কিছু কিছু তারা ও গ্রহ চিনিয়ে দিয়েছিল। সব ভুলে গেছি। অনি, তুমি সব চেন? তোমার কোনটা ফেভারিট?"

অনি বলে, "ছোটবেলায় পড়েছিলাম, বশিষ্ঠের শাপে অরুন্ধতী আকাশের তারা হয়ে গেছিল। আমার খুব অরুন্ধতীকে খুঁজতে ইচ্ছে করে। আমার এক অ্যাস্ট্রনমার বন্ধুকে বলেছিলাম চিনিয়ে দিতে, ও বলে ইংরেজি নাম না বললে ও খুঁজে পাবে না। মনে পড়ে কোনও এক কবির কিছু লাইন—

"অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে
রাত্রি হল।"

সবাই চুপচাপ। হঠাৎ সর্বাণীর দিকে তাকিয়ে মুন্নি বলে, "সর্বাণী, তোমার পার্টিতে কম করে শ'খানেক ইন্ডিয়ান এসেছিল, তাই না? তুমি পারও বটে। সবক'টা রান্না দারুণ হয়েছিল। রসগোল্লা সুপার। পার্টিহাউস থাকাতে অত লোক বোঝা যাচ্ছিল না। এত জায়গা থাকাতে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। একটা বিরাট গ্রুপ সুইমিং পুলের চারপাশে বসে খাচ্ছিল দেখলাম। বেশ-কিছু লোককে দেখলাম বারান্দায়। মেয়েরা অবশ্য ঘরের মধ্যেই হইচই করছিল। লাবকে এত ইন্ডিয়ান আছে আমার ধারণা ছিল না। আমি জানি বেশ-কিছু ডাক্তার আছে এই শহরে, মা'র অসুখের সময় আলাপ হয়েছিল। এখানে অন্যান্য ইন্ডিয়ানদের প্রফেশন কী? দেখে তো সবাইকে বড়লোক মনে হল।"

সর্বাণী বলে, "বেশ-কিছু ইন্ডিয়ান এখানে য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর, তোমার বাবা আর অনির মতো টেক্সাস টেকে পড়ায়। কিছু ইঞ্জিনিয়ার আছে টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টে কাজ করে। এ ছাড়া আছে বেশ কিছু গুজরাতি ব্যবসায়ী, এরা হোটেল মোটেল ও

লিকার স্টোর্সের মালিক। বছরে একবার সবাইকে নেমন্তন্ন করি। ওরাও পালটা নেমন্তন্ন করে। ছোট শহরে এমনিভাবেই মিলেমিশে থাকতে হয়। এখানে বাঙালির সংখ্যা কম। গোটা ছয়েক ফ্যামিলি। তারমধ্যে আবার দলাদলি আছে।"

রাণা বলে, "সর্বাণীদি, সারাদিন তোমার খুব খাটাখাটুনি গেছে। একটু রিল্যাক্স করো। আমি হিউস্টন থেকে একটা ভাল বোর্দো নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। এসো, আমরা সেলিব্রেট করি। অনিদা, তোমার ওয়াইন ওপেনারটা কোথায়?"

"চলো, আমি তোমার সঙ্গে ভেতরে যাচ্ছি।"

অনি ও রাণা বাড়ির ভেতরে ঢোকে। রাণা পাশের ঘর থেকে ওর সুটকেশটা খুলে ওয়াইনের বোতলটা নিয়ে আসে। অনি ড্রয়ার খুলে ওয়াইন ওপেনারটা দেয় রাণাকে। এর মধ্যে অনির ছোট ছেলে অর্ঘ্য সবাইকে শুভরাত্রি বলে শুতে চলে যায়।

"অনিদা, চারটে ওয়াইন গ্লাস দাও তো। তোমার কোনও ট্রে আছে? একটু তা হলে সাজিয়ে নিতে পারি। বাইরেটা এত সুন্দর। সারারাত জেগে আড্ডা মারতে ইচ্ছে করছে। লাবকটা আমি সত্যিই মিস করি। তিনটে বছর আমরা কী আনন্দেই এখানে ছিলাম। হিউস্টন এত বড় শহর, সারা বছর ধরে পালা-পার্বণ লেগেই আছে। কয়েক শো বাঙালি তো হবেই হিউস্টনে। অনেকের সঙ্গেই চেনাশোনা। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যেমন ইন্টিমেসি রয়েছে, তেমন আর কখনওই হবে না। তোমরা আমাদের আত্মীয়ের চেয়েও বড়। সত্যি বলছি।"

রাণা সব ব্যাপারেই পরিপাটি। ও টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার। বছর তিনেক লাবকে ছিল রাণা, ফুলু ও ওদের দুই মেয়ে মেঘনা আর শ্রেয়া। তখন খুব হইচই হত। প্রতি উইক এন্ডে পার্টি লেগে থাকত। গভীর রাতে সবাই সর্বাণীকে অনুরোধ করত গান গাইবার জন্য। তখন সর্বাণী গাইত রবীন্দ্রসংগীত আর অতুলপ্রসাদের গান। বড় দরদ দিয়ে। ফুলুর ছোট মেয়ে শ্রেয়ার জন্মের সময় রাণা অফিসের কাজে জার্মানিতে ছিল। এক সপ্তাহের জন্য। অনি আর সর্বাণীই ফুলুকে হাসপাতালে নিয়ে যায় রাত বারোটায়। অনেক কষ্ট করে রাণাকে যোগাযোগ করা হয় জার্মানিতে। শ্রেয়ার যখন এক বছর, রাণা বদলি হয়ে যায় রোমে। অনি, সর্বাণী ও ছোট ছেলে অর্ঘ্য ওদের রোমের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল এক সামারে। খুব মজা হয়েছিল সেবার। সবাই মিলে রাণার ভ্যানে বেড়াতে গিয়েছিল ফ্লোরেন্স আর ভেনিসে। মেঘনা আর শ্রেয়া অর্ঘ্যকে কিছুতেই আসতে দেবে না। কিছুদিন হল রাণা হিউস্টনে আবার বদলি হয়ে এসেছে রোমের পাট চুকিয়ে। সর্বাণীর পার্টি শুনে রাণা চলে এসেছে একদিনের জন্য লাবকে। ফুলু ফোন করে অনুযোগ করে সর্বাণীকে, "দেখলে রাণাটা কেমন সেলফিশ, আমি দুই মেয়েকে নিয়ে এখানে হাবুডুবু খাচ্ছি, আর রাণা কেমন দিব্যি হাওয়া খেতে খেতে তোমার ওখানে পার্টিতে যাচ্ছে।"

ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে সবাইকে ওয়াইনের গ্লাস দেয় রাণা। চিয়ার্স বলে সবাই গ্লাস তোলে।

"থ্যাঙ্ক য়ু রাণা", কান্না ভেজানো গলায় মুন্নি বলে।

"কী হল মুন্নিদি, কাঁদছ কেন?" রাণা জিজ্ঞেস করে।

সর্বাণী বলে, "মুন্নি ওর মা'র কথা বলছিল।"

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুন্নি বলে, "জানো সর্বাণী মা'র জন্য ইউসিএলএ-র হাসপাতালে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। ওখানকার ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার পৃথিবী-বিখ্যাত। মা কিছুতেই এল না আমার কাছে। ছ' মাসে সব শেষ। আমি কিছুই করতে পারলাম না মা'র জন্য।

"যেটা আমার আশ্চর্য লাগে মা সারাজীবন বিদেশে কাটিয়েও আমার বিয়েটা মেনে নিতে পারেনি। আসলে মা খুব কনজারভেটিভ ছিল। ভেবে দেখো আমাদের বিয়ে তিরিশ বছর হয়ে গেল। মা কোনওদিনই ব্রুসকে জামাই বলে মেনে নিতে পারেনি আমেরিকান বলে। এ তো এক ধরনের রিভার্স ডিসক্রিমিনেশন। মা-কে একদিন আমি বলেছিলাম, তুমি তো 'ফিডলার অন দ্য রুফে'র টেভির মতো চিৎকার করছ ট্রাডিশন ট্রাডিশন করে। কিছুতেই ব্রুসকে মেনে নিতে পারছ না বিয়ের এত বছর পরেও।"

"মন খারাপ কোরো না মুন্নি। আমাকে নিয়েও অনিদের বাড়িতে প্রচণ্ড ঝামেলা হয়েছিল। আমরা মুখে যত বড়াই করি-না-কেন আমরা ক্ল্যানিশ, যে যার নিজের গণ্ডির মধ্যে থাকতে ভালবাসি। গণ্ডির বাইরে গেলেই সন্দেহ, সংশয়। আমি জানি না আমার ছেলেরা কাদের বিয়ে করবে। কিন্তু মেয়ে যদি ভাল হয়, সে আমেরিকান হোক, কী ইন্ডিয়ান হোক, আমি ইন্টারফেয়ার করব না। আমি চাই ওরা সুখী হোক।"

"আমার ব্যাপারে মা উদাসীন থাকলেও, আমার মেয়েদের, বুজু, পিয়াকে মা অদ্ভুত ভালবাসত। আমার দুই মেয়ের জন্যই মা আমার ওখানে মাঝে মাঝে গেছে। প্রতি সামারে আমি মাসখানের জন্য দুই মেয়েকে লাবকে পাঠিয়ে দিতাম। যখন ওরা স্কুলে পড়ত। বাবা আবার উলটো। বাবা ব্রুস বলতে অজ্ঞান। বাবা একটু মেল শোভোনিস্ট। বাবার ধারণা মেয়েরা সায়েন্স বোঝে না। ব্রুস কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বলে বাবা ওর সঙ্গে ফিজিক্সের নানাধরনের গল্প করে। আমাকে আবার বলে, 'ব্রুসের মাথাটা খুব পরিষ্কার— আমেরিকান জুইশ বলে।'

"প্রচণ্ড অভিমান ছিল মা'র আমার ওপর। জানি না ছোটবেলা থেকে মা মাতৃহারা বলে কি না। ব্রুসকে বিয়ে করার পর মা কেমন যেন সব সম্পর্ক কেটে দিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। যতটুকু করণীয় করত, কিন্তু প্রাণখুলে মনখুলে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলেনি। জানো সর্বাণী, মাঝে মাঝে তোমার ওপর আমার হিংসে হত। মা সুখদুঃখের সব গল্প করত তোমার সঙ্গে। মনে হত আমার

চেয়ে তোমাকে মা বেশি ভালবাসত। শেষের দিকে, লিভার ক্যানসারের প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও ফোনে আমায় বলত, মুন্নি, সংসার ছেড়ে লাবকে তোমায় ছুটে ছুটে আমায় দেখতে আসতে হবে না। এখানে অনি ও সর্বাণী আছে। খুব দরকার হলে ওরাই আমাকে দেখবে।— ব'লে আবার কাঁদতে থাকে মুন্নি। প্রচণ্ড জেদি ছিল মা। মারাও গেল নিজের বিছানায় শুয়ে। শেষ সময় আমি থাকতে পারলাম না। এ দুঃখ আমার যাবে না। আমাকে যেন ইচ্ছে করেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল।"

অনির মনে পড়ে সোনাদির মৃত্যুর কথা। আগের দিন সন্ধেবেলা সর্বাণী ও অনি ডক্টর দাশগুপ্তর জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিল। ডক্টর দাশগুপ্ত চুপ করে বসে ছিলেন বসার ঘরে। "তোমরা এসেছ, ভালই লাগছে। দেখো-না, সোনা কেমন ঝিম মেরে শুয়ে আছে। কোনও কথা বলছে না।"

অনি ও সর্বাণী সোনাদির ঘরে ঢোকে। কোমাটোজে বিছানায় শুয়ে আছে সোনাদি, লেপটা ঠিকমতো গায়ে দিয়ে দেয় সর্বাণী। কপালে হাত রাখে। কী শান্তিতেই ঘুমিয়ে আছে সোনাদি। আগের দিন খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, খুব কষ্ট হচ্ছিল।

সর্বাণী বসার ঘরে এসে টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে দেয় ডক্টর দাশগুপ্তর জন্য। প্রায় আশি বছর বয়স হয়েছে। কেমন যেন অসহায় হয়ে গেছেন সোনাদির অসুখে। "আসুন, আপনার জন্য একটু খাবার এনেছি। খেয়ে নিন, আমরা আপনার পাশে বসে গল্প করছি।" সর্বাণী বলে।

খেতে খেতে পুরনো দিনের গল্প করেন ডক্টর দাশগুপ্ত। পরেশনাথ মন্দিরের গায়ে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটের বাড়ির কথা। অনিরা একসময় ওই পাড়াতেই থাকত। অনির মনে আছে ওর মেজো পিসির বিয়ের সময় বরযাত্রীরা ডক্টর দাশগুপ্তের বসার ঘরে বসেছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। অনির তখন হয়তো পাঁচ বছর হবে। ডক্টর দাশগুপ্ত স্মৃতিরোমন্থন করে বলছেন সত্যেন বোসের কথা। যার সঙ্গে বহুবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়িয়েছেন সতীর্থ হিসেবে।

"জানো তো, সোনা ছিল আমার ছাত্রী। আমি তখন স্কটিশ চার্চে ফিজিক্স পড়াই। সোনা ফিজিক্স নিয়ে বি এস্‌সি পড়ছে। একদিন সোনার সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেছি। বালিগঞ্জ প্লেসে— বিরাট মার্বেল প্যালেস। আমার তো দেখে মাথা ঘুরে গেছে। ওর বাবা গ্লাসগোর বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। আর আমার বাবা সাধারণ কেরানি। আমরা ঠাসাঠাসি করে বদ্রীদাসের বাড়িতে ভাড়া থাকি। তবু ওই বাড়িতে সোনা একদিন বউ হয়ে এল। খুব কষ্ট করেছে সারাজীবন আমার জন্য।" বলতে বলতে চোখে জল এল ডক্টর দাশগুপ্তর।

অনি ও সর্বাণী এই গল্প অনেকবার শুনেছে। খাওয়া শেষ হলে বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ডক্টর দাশগুপ্ত বলেন, "তোমরা এখন বাড়ি যাও, রাত বারোটা

বাজে। অর্ঘ্য বাড়িতে একা একা আছে। মুন্নি কালকেই ফিরে আসছে এখানে। এবার বেশিদিন থাকবে বলেছে। মা'র দেখাশোনা করবে।"

পরের দিন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই অনি চলে যায় ডক্টর দাশগুপ্তর কাছে। অনি পৌঁছে দেখে দরজাটা খোলা। ডক্টর দাশগুপ্ত সোফায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। টেলিভিশনটা চলছে। হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে বলেন, "অনি এসেছ। ভালই হয়েছে। সোনা মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে। চলো একবার দেখে আসি। তার পর তুমি একটু চা বানাবে।"

সোনাদির কপালে হাত রাখে অনি। কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গেছে সারা শরীর। কোনও পালস্ নেই। অনি তাড়াতাড়ি ডক্টর রাওকে ফোন করে, শেষদিকে উনিই সোনাদিকে দেখাশোনা করতেন।

ফোন পেয়েই ডক্টর রাও চলে আসেন। সোনাদির বুকে স্টেথিস্কোপটা লাগিয়েই বুঝতে পারেন সব শেষ। "সরি, ডক্টর দাশগুপ্ত, উই লস্ট হার।"

চিরকালের অভিমানিনী সোনাদি লাবকে নিজের খাটে শুয়ে মারা গেলেন।

সর্বাণীর কথায় অনি সংবিৎ পেল।

"মুন্নি, সত্যিই কি তুমি ডক্টর দাশগুপ্তকে তোমার ওখানে নিয়ে যেতে চাও।"

"কী করব বলো? মা তো আমায় কিছুই করতে দিল না। চিরকালই সরিয়ে রেখেছিল। বাবা এখন মা'র স্মৃতি আঁকড়ে এই বাড়িতে পড়ে আছে। দিনরাত চিন্তা হয়। কখন যদি হার্ট অ্যাটাক হয়— জানতেও পারব না। বুঝতে পারি, চারিদিকে মা'র সাজানো সংসার। এই পরিচিত পরিবেশের মধ্যে থেকে বাবা মা'কে খুঁজে পায়। বাবা চিরকালই অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসর। ফিজিক্স ছাড়া কোনওদিনই কিছু বোঝেনি। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই ল্যাবরেটরিতে কাটিয়েছে। মা চিরকালই বাবাকে আগলে রেখেছে। দোকান বাজার কোনওদিনই কিছু করতে দেয়নি। মা ড্রাইভ করতে ভালবাসত। বাবা চিরকালই ড্রাইভারের সিটের পাশে। বাবার কিন্তু ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ড। সন্ধেবেলা ফিরে মা'র সঙ্গে গল্প করত, ফিজিক্সের— এক্স-রে লেজারের এক্সপেরিমেন্ট অথবা সত্যেন বোস, ফাইনম্যান আর ক্যালটেকের গল্প। মা মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠত, 'তুমি কি ফিজিক্স ছাড়া কোনও কথাই বলতে পার না?' "

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মুন্নি আবার শুরু করে, "জান সর্বাণী, মা'র মৃত্যুর পর বাবা কেমন জবুথুবু হয়ে গেছে। সারাদিন দেখার জন্য একটা মেড রেখে দিয়েছি— বয়স্ক মেক্সিকান ভদ্রমহিলা বেনিটা-ই সব রান্নাবান্না করে দেয়। আমিও যখন আসি, মাঝে মাঝে রান্না করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেনিটা গরম করে বাবাকে খেতে দেয়। তুমিও মাঝে সাঝে রান্না করে দিয়ে আস। গল্প কর। জান, বাবা আর ইদানীং হাঁটতে পারে না। ঘরের মধ্যে সোফায় বসে টিভি খুলে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় না টিভি দেখে। আমি তো আর বাবার মনের মধ্যে

যেতে পারি না। মনে হয় দিনরাত মা'র কথা ভাবে। মাঝে মাঝে ভুলে যায় মা আর নেই। হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে, 'সোনা, এদিকে শুনে যাও একবার।' শুনে আমার দু'চোখ ভরে জল আসে। তোমরা ছাড়া কোনও বন্ধুবান্ধব নেই বাবার।"

অনি বলে, "মুন্নি, ডক্টর দাশগুপ্তকে একা বাড়িতে খুব অসহায় লাগে। ওনাকে দেখে একটা জাপানি হাইকুর কথা মনে পড়ে—

'দ্য পিয়ারসিং চিল আই ফিল
মাই ডেড ওয়াইফস কোম্ব ইন আওয়ার বেডরুম
আন্ডার মাই হিল।' "

মুন্নি বলে, "বাবা কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না। বাড়ির বাইরে কখনও যায় না। মনে হয় মেন্টাল ডিপ্রেশনে ভুগছে। আমি বাবাকে ওখানকার ডাক্তার দেখাতে চাই। বাবা এবার রাজি হয়েছে আমার সঙ্গে লস্ এঞ্জেলেসে যেতে। আমি কালকেই বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি। যতদিন পারি আমার কাছে রেখে দেব।"

সর্বাণী বলে, "মুন্নি, এই সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে সবাইকে যেতে হয়। মৃত্যু একটা বড় ইকোয়ালাইজার। গরিব বড়লোক কোনও ফারাক নেই। আমি এখনও নিউ ইয়ার্সের দিনে ভয়ে ভয়ে থাকি। নাইন্টি থ্রি-র নতুন বছরে রাত বারোটার ঠিক পরেই কলকাতা থেকে মাসি ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সর্বাণী, সর্বনাশ হয়ে গেছে, তোমার মা আর বেঁচে নেই।' সেইদিনের কথা এখনও ভাবলে ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি মাসির কথা। দু'মাস আগে ঠিক পুজোর সময় আমি অর্ঘ্যকে নিয়ে মা'র কাছে ছিলাম কলকাতায়। মা'কে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলাম। কত আনন্দই করেছি একসঙ্গে। মৃত্যুর আগের দিনও মা'র সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। মা হাসতে হাসতে বলে, 'জানিস সর্বাণী, কয়েকদিন আগে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম একটা মাঠের পাশ দিয়ে। বাচ্চাছেলেরা খেলা করছিল। ওদের একটা বল মাথায় লাগে। আমি তো সরষে ফুল দেখতে শুরু করলাম। যা হোক ডাক্তার দেখিয়েছি। কোনও চিন্তা করিস না। সব ঠিকঠাক।'

'অনি আরেকটা ফোনে ছিল, ও জিজ্ঞেস করল, 'মাথায় কোনও ব্যথা আছে কি? একটা এক্স-রে করা ভীষণ দরকার।' মা হাসতে হাসতে বলে, 'মাথাটা একটু টিপটিপ করে। মাথা থাকলে মাথাব্যথা হবেই।' অনি তখন বলে, 'একজন নিউরোলজিস্টকে ইমিডিয়েটলি দেখানো দরকার।' মা উত্তরে বলে, 'অনি, ওপার থেকে যদি ডাক আসে তুমি কি ঠেকাতে পারবে? আমার জন্য চিন্তা কোরো না। কালকে সারাদিন গৌরীর বাড়িতে কাটাব। ওখানেই নেমন্তন্ন। শঙ্খ, অর্ঘ্যর কথা বলো। ওরা কেমন আছে? ওদের নিয়েই আমার চিন্তাভাবনা।

ওরাই আমার স্বপ্ন। এবার ফোনটা আমার দুই নাতিকে দাও। ওদের সঙ্গে কথা বলি।'

ললমা অনেকক্ষণ ধরে শঙ্খ আর অর্ঘ্যর সঙ্গে কথা বলল। শঙ্খকে বলল, 'এবার আমেরিকায় এলে হার্ভার্ডের কাছে ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে তোমায় নিয়ে থাকব। তুমি দিনরাত পড়াশুনো করবে। আমি হরেক রকমের রান্না করে রাখব তোমার জন্য, তোমার ফেভারিট রান্না, এমনকী ফুচকা।' মানুষ কতই স্বপ্ন দেখে। পরের দিন আর মা নেই।"

সবাই চুপ করে সর্বাণীর কথা শুনছে। সর্বাণী ওর মা'র মৃত্যুর কথা কাউকে কোনওদিন বলেনি। অনি ভাবছে মার কথা বলে ও যদি একটু হালকা হতে পারে তো হোক। সর্বাণী আবার শুরু করে, "পরের দিন মা বেহালায় আমার মাসির বাড়িতে যায়। সারাদিন গল্পগুজব করে। বাড়িতে সবাই ছিল, মাসি, মেসোমশাই, মাসতুতো ভাই আর বোন। সন্ধেবেলা হঠাৎ মা বলে, আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, আমি একটু শুয়ে পড়ি। ঘুম থেকে উঠে একসঙ্গে খাওয়া যাবে। এই বলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘণ্টা দুয়ের পরে মা ঘুম থেকে ওঠেনি দেখে মাসি ডাকাডাকি শুরু করে। কোনও উত্তর নেই। মা অজ্ঞান হয়ে আছে। ওরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হসপিটালে নিয়ে যায়। প্রথমে পিজিতে যায়। কিছুতেই ভর্তি করল না! নিউ ইয়ার্স ছুটির দিন। ভাবতে পার এমার্জেন্সিতে কোনও ডাক্তার নেই? এর পর ওরা গেল পার্কসার্কাসে, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। অনেক দেরি হয়ে গেছিল। ডাক্তার দেখে বলল, 'আমাদের কিছু করার নেই। উনি মারা গেছেন।'

"জান মুন্নি, কলকাতা বলেই বিনা চিকিৎসায় আমার মা মারা গেল। পরে এখানে ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছি, একে বলে 'হেমাটোমা'। বলটা মাথায় লেগে ব্রেনে একটু ইন্টারন্যাল হেমারেজ হয়। এখানে স্পোর্টসম্যানদের খেলতে গিয়ে হামেশাই হয় হেমাটোমা। খুব মাইনর অপারেশন। একটা সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে ব্লাড ক্লটটা বের করে দেয়। তখন আর প্রেশারটা বিল্ড আপ করতে পারে না ব্রেনে।"

"মার মৃত্যুর পর পাগলের মতো সারারাত চিৎকার করে কেঁদেছি। ভগবান একী তুমি করলে, আমি কী দোষ করেছি। শঙ্খটা চুপ করে বসে আছে। অর্ঘ্যটা ছোট, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। সারারাত ধরে বরফ পড়ছিল। এর মধ্যে অনেক কষ্ট করে অনি একটা ফ্লাইটের টিকিট জোগাড় করেছে। ও আমার সঙ্গে ডালাস পর্যন্ত এসেছিল। আমার জন্য মা'র ডেড বডি কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিয়েছিল। একা একা কলকাতায় পৌঁছলাম। চিরকাল মা এয়ারপোর্টে আসে। এবার আমার মামা আর মাসিরা এসেছিল। মা'র সব কাজ নিজেই করলাম পুরুত ডাকিয়ে, যাতে কোনও ত্রুটি না হয়। মা'র শ্রাদ্ধের দিন লাবক থেকে একটা

প্যাকেট পৌঁছয়, তাতে অনি, শঙ্খ আর অর্ঘ্য লিখে পাঠিয়েছিল মা'র স্মৃতির উদ্দেশে। শ্রাদ্ধবাসরে আমি পড়লাম। সবার চোখে জল। মা'র সব কাজ শেষ করে সর্বস্বান্ত হয়ে লাবকে ফিরলাম। মনে হল কেউ আমার নেই। এক বছর কোথাও আমি বের হইনি। চুপচাপ বসে থাকতাম। অনি রান্নাবান্না করত। স্কুল থেকে ফিরে অর্ঘ্য আমার সঙ্গে শুয়ে থাকত। ওকে চুপ করে জড়িয়ে রাখতাম। মুন্নি, আমার ভাই বোন, মা বাবা কেউ নেই। মা'র চলে যাওয়ায় একটা দিক আমার শেষ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।"

মুন্নি সর্বাণীকে জড়িয়ে ধরে। দু'জনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। রাণা ও অনি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘাসের ওপর হাঁটে। পূর্ণিমার চাঁদটা পশ্চিম আকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে তখন।

অনেকক্ষণ পরে রাণা শুরু করে, "আমার মনে হয় সবার জীবনেই সুখদুঃখের একটা প্যাকেজ আছে। কারও আগে আসে, কারও পরে আসে। আমার কথা ভাবো। নাইনটি সেভেনে বাবা মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে, ঠিক পরের বছর মা মারা গেলেন ক্যানসারে। মা চিরকালই সাহসী ছিলেন। দশ বছর ধরে ক্যানসার, কোনওদিন কোনও অনুযোগ, অভিযোগ শুনিনি। মা'র মৃত্যুর পর আমারও মনে হয়েছিল পৃথিবীটা ফাঁকা হয়ে গেল। বাবা ছিলেন রাশভারী কিন্তু মা ছিলেন মাইডিয়ার। মা'র কাছেই আমার যত আবদার ছিল। কিন্তু দেখো, আমরা সবাই দুঃখ পেয়েছি, তবুও কেমন মানিয়ে নিয়েছি। সংসার যেমন চলছিল, তেমনি চলছে। কারও জন্য কিছু আটকে থাকে না। আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখতেই হবে, সুখের স্বপ্ন, আনন্দের স্বপ্ন।"

"জানো মুন্নিদি, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মা'র মৃত্যুর পর আমার ছোট বোন রত্নার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা নেই দু'বছর। দু'জনেই আমেরিকায় থাকি। কিন্তু যোগাযোগ নেই। ভাবতে পার?"

"সেটা কেন হল?" প্রশ্ন করে মুন্নি।

রাণা বলে, "তুমি হয়তো জান না মুন্নিদি, আমার জন্ম এদেশে বস্টনে। আমার জন্মের সময় বাবা এম আই টি-তে ছিলেন। আমার বয়স যখন বছর দুই, বাবা-মা'র ধারণা হল এদেশে ছেলে মানুষ করা কঠিন। প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হলে নাকি অন্যের দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারে না। বাবা মাইসোরে একটা ভাল চাকরি নিয়ে চলে যান। আমার ছোটবেলাটা ওখানে কেটেছে। যার জন্য কানাড়া আমার মাতৃভাষার মতো। শেষ জীবনে রিটায়ার করে বাবা মা কলকাতায় ফিরে আসেন। আমি তখন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি, ছোট বোন রুমা ডাক্তারি পড়ছে। আমাদের নিউ আলিপুরের বাড়িটা বাবার সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে তৈরি, নিজেই তদারকি করে বানিয়েছিলেন। বলতেন, 'দোতলাটা রত্নার জন্য, তিনতলাটা রাণার। আমরা বুড়োবুড়ি একতলায় থাকব।' বিয়ে করে ফুলুকে নিয়ে ওই বাড়িতে

বেশ-কিছু বছর ছিলাম। ফুলু আর আমি মনের মতো করে তিনতলাটা সাজিয়েছিলাম। নতুন ধরনের ফার্নিচার, বেশ-কিছু ভাল পেইন্টিং। ব্যালকনির টবে ছিল নানা ধরনের ফুলের গাছ। তার পর তো রত্না আর আমি দু'জনেই এদেশে চলে আসি। বাড়িটা এখন ফাঁকা পড়ে আছে। একটি এজেন্সিকে দিয়েছি দেখাশোনার জন্য। যদি কখনও দেশে ফিরি, ওই বাড়িতে থাকব ভেবেছি। যখনই কলকাতা যাই, ওই বাড়িতে প্রাণ পাই। বাবা-মা'র কত স্মৃতি জড়ানো। রত্না খুব শক্ত মেয়ে। জানই তো নর্থ ক্যারোলাইনায় ওর বিরাট পসার। প্রচুর পয়সা। ও খুব প্রাগ্‌ম্যাটিক। মনে হয় রত্নার সেন্টিমেন্ট খুব কম। ও বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চায়। এই নিয়ে রত্নার সঙ্গে আমার ঝগড়া। দেখো এদেশে আমরা দু'জনেই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত। বাড়ি বিক্রি করে ও টাকা আমার চাই না। দিনের পর দিন দেখেছি বাবা বাড়িটা তৈরি হবার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতেন, তদারক করতেন, কী করে বাড়িটা তৈরি হয়। মাইসোর থেকে কলকাতায় ফিরে মা কতই খুশি ছিলেন ওই বাড়িতে নতুন করে সংসার করতে। রত্না কী করে পেছনের সব স্মৃতি ঝট করে কেটে দিতে পারে, আমি ভাবতে পারি না। ওই বাড়ির মধ্যেই আমি বাবা-মা'র স্মৃতি খুঁজে পাই। জান একা একা যখন ওই বাড়িতে যাই, হঠাৎ যেন মার গলা শুনতে পাই, 'রাণা, তোকে খেতে দিয়েছি। ভাত জুড়িয়ে গেল, আয় বাবা।' "

অনি বলে, "শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্‌গর পড়নি? "সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।"

বিচিত্র এই সংসার। লাইফের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কী জান, রাণা? যারা আমাদের সবচেয়ে কাছের তাদের সঙ্গেই আমাদের বিবাদ বেশি। যুগে যুগে বাবার সঙ্গে ছেলের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, ভাইয়ের সঙ্গে বোনের, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর— ঝগড়া, মারামারি, চুলোচুলি লেগেই আছে। রামায়ণ-মহাভারতই পড়, আর পাড়াপড়শি, আত্মীয়স্বজন দেখো, একই ছবি। দুঃখ পেয়ো না। পৃথিবীর এই দুঃখ মারামারি, হাতাহাতি, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য থেকেও মনে হয়— জীবনের দাঁড়িপাল্লায় দুঃখের চেয়ে সুখ বেশি, পাপের চেয়ে পুণ্যের, মন্দের চেয়ে ভালর। এর উলটো হলে পৃথিবীটা পাগলা গারদে ভর্তি হয়ে যেত।"

হঠাৎ মুন্নির সেল ফোনটা বেজে ওঠে। ডক্টর দাশগুপ্ত ফোনে। 'মুন্নি, বাড়ি ফিরবে না, কোথায় তুমি? রাত দুটো বেজে গেছে। আমি চিন্তা করছি তোমার জন্য।'

"এক্ষুনি আসছি বাবা। আমি সর্বাণীদের বাড়িতে।"

মুন্নি বলে, "গল্প করতে করতে খেয়াল ছিল না। এবার আসি। বাবা চিন্তা করছে। আজ শুধু দুঃখের গল্প হল। কালকে অন্য কথা হবে।"

সবাই ঘরে ঢোকে। সর্বাণী বলে, "মুন্নি, কাল এখানে ব্রাঞ্চ খাবে। রাণাও থাকবে। বিকেলের প্লেনে তোমরা যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। খুব ভাল লাগল

যে তোমরা আমার পার্টিতে এতদূর থেকে এসেছ। বাড়ি পৌঁছে একটা ফোন কোরো।”

অনি রাণাকে বলে, “তুমি শঙ্খর ঘরে শুয়ে পড়ো। কাল ঘুম থেকে ওঠার কোনও তাড়া নেই। যতক্ষণ খুশি ঘুমুতে পারো।”

সর্বাণী বলে, “কাল দেখা হবে রাণা। গুড নাইট।”

২

ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে অনির ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে চারটে বাজে। এত ভোরে কে ফোন করল?

“হ্যালো” ঘুম জড়ানো চোখে বলে অনি।

“দাদা, আমি ঈশান কথা বলছি।”

“কী খবর? সব ভাল তো? মা ভাল আছে?”

“না রে— ভাল খবর নেই। মণিদা মারা গেছে।”

“পাগলের মতো কী বলছিস ঈশান? ইন্দ্র মারা গেছে? কী করে, কী হল?” এর মধ্যে সর্বাণী বিছানায় উঠে বসে। “কার সঙ্গে এত ভোরে কথা বলছ?”

“ঈশান টেলিফোনে, ইন্দ্র নাকি মারা গেছে?”

“কী বলছ তুমি? সর্বাণী আর-একটা ফোন নিয়ে বসে, “কী হয়েছে ঈশান? সব খুলে বল ইন্দ্রর কথা। কী করে মারা গেল? কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?” চিৎকার করে সর্বাণী। “না রে বউদি— অ্যাক্সিডেন্ট নয়। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে মণিদা। গতকাল রাতে কারবি আংলঙ থেকে শুটিং শেষ করে ফেরে। ট্রাইবদের ওপর মণিদারই একটা লেখা গল্প। শুটিং, মিউজিক, ডিরেকশন— সবই মণিদার। মা বলছিল এত খুশি নাকি মণিদাকে বহুদিন দেখেনি।

“সারা রাত ধরে মাকে আর নিশাবউদিকে গল্প শুনিয়েছে মণিদা। গল্প শেষ করে মণিদা সকালের দিকে ঘুমুতে যায়। দশটার সময় ঘুম থেকে উঠে নিশাবউদিকে চা দিতে বলে। খুব নাকি টায়ার্ড দেখাচ্ছিল মণিদাকে। মাসখানেক ধরে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম সবই অনিয়মিত ছিল। খুব খেটেছিল মণিদা ফিল্মটা শেষ করতে। চা খেয়ে বউদিকে বলে, ‘আমার একটু কাজ আছে ইন্দ্রপুরীতে— যাব আর আসব। ঘণ্টাখানেক লাগবে। বিবেক এসেছে বম্বে থেকে, ওর সঙ্গে একটু দরকার। ভাল করে রান্না করে রেখো। আমি দুপুরে এসে বাড়িতে খাব।’ মা, বউদি সবাই মণিদাকে বারণ করল যেতে এইসময়। জানই তো মণিদা কারও কথাই শোনে না। স্টুডিয়োতে বিবেকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। ওরা তাড়াতাড়ি মণিদাকে বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ততক্ষণে

সব শেষ। স্টুডিয়োর লোকেরাই মণিদার ডেড বডি বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

"জানিস দাদা, মা মণিদাকে সিল্কের পাঞ্জাবি পাজামা পরিয়ে দিয়েছে। মণিদার শরীরটা ধরে চুপ করে বসে আছে, মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায় কার কপালে। এ দৃশ্য দেখা যায় না। ঘরে একটা বড় বরফের স্ল্যাবে মণিদাকে শুইয়ে রেখেছে। খুব সুন্দর ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। বাড়ি ভর্তি লোক। টেলিভিশনে বার বার মণিদার মৃত্যুর খবর বলছে। ওর গান শোনাচ্ছে। আমি দুপুরেই জামশেদপুর থেকে ফিরে সোজা নাকতলার বাড়িতে এসেছি মণিদার সঙ্গে গল্প করব বলে। বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি হাজার হাজার লোক, বড় রাস্তা পর্যন্ত ভিড়। রিপোর্টার, টেলিভিশন স্টুডিয়োর লোক। কিছুই বুঝতে পারিনি। ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মাঝখানে মণিদা শুয়ে, মালা আর চন্দনে সাজিয়ে দিয়েছে। মা আস্তে আস্তে মণিদার কপালে হাত দিয়ে আদর করছে। মা আমাকে দেখে বলে, 'ঈশান আয়, ইন্দ্র আর নেই।' বলে হাউ হাউ করে কান্না।"

সর্বাণী বলে, "ঈশান বাড়ি থেকে ফোন করছিস তো? ফোনটা ছেড়ে দে। আমি এক্ষুনি ফোন করছি। সব-কিছু শুনতে চাই।"

"না রে বউদি, কাল থেকে আবার আমাদের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে। আমি পাশের বাড়ির চিত্রার ফোনটা ব্যবহার করছি। ওদের ফোন নাম্বারটা হচ্ছে, ফোর-সেভেন-ওয়ান-টু-টু-টু-থ্রি।"

"ঈশান, ফোনটা ছেড়ে দে। আমি ফোন করছি এই নাম্বারে।" সর্বাণী বলে।

ঘণ্টাখানেক ধরে ঈশান বলে গেল পর পর ঘটনা। অনি আর সর্বাণী শুনছে আর কাঁদছে। একটু পরে ঈশান বলে, "অনেক কথা হল। এবার আমি মা'র কাছে যাই। দিদি, সন্দীপদা চলে এসেছে। খেয়াকে খবর দিয়েছি শিলিগুড়িতে। মণিদার খবরটা ছোড়দা আর উৎসবকে জানিয়ে দে। আমি আর ওদের আলাদা করে ফোন করলাম না। চিত্রাদের ফোন নাম্বারটা ওদের দিয়ে রাখিস। তোরা ঠিক রাত দশটায় চিত্রাদের বাড়িতে আবার ফোন করিস। আমি তখন থাকব। মণিদার শেষটুকু তখন বলতে পারব।" এই বলে ঈশান ফোন ছেড়ে দেয়।

অনি বিছানা থেকে উঠে বসবার ঘরের সোফায় গিয়ে বসে। ভোর হয়ে গেছে। পুবদিকের কাচের জানলা দিয়ে প্রথম উষার আলো এসে পড়েছে। সর্বাণী পাশে এসে চায়ের কাপটা এগিয়ে দেয়। "অনি, তুমি এক্ষুনি কলকাতায় চলে যাও। মার কথা ভাবতে পারছি না। ইন্দ্রর শোকে মা বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। এখন যদি মা'র কিছু হয়, দুঃখের সীমা থাকবে না। তুমি মা'র পাশে দাঁড়াও। তুমিই একমাত্র সংসারটা ধরে রাখতে পারবে। নিশা বাপী আর তুলির কী হবে ভাবতে পারি না। একমাত্র তুমিই বোধহয় মাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। ইন্দ্র আর তুমিই ছিলে মা'র ফেভারিট। প্লিজ মা'র কাছে যাও।"

অনি উঠে দাঁড়ায়, "দেখি পাসপোর্ট আর ভিসা ঠিকমতো আছে কি না'— এই

বলে পাশের ঘরে চলে গেল। সুটকেশটা খুলে পাসপোর্টটা বের করে। ভাল করে দেখে বলে, "না সব-কিছুই ঠিক আছে। এখন একটা টিকিট জোগাড় করা দরকার। সামারে দেশে যাবার টিকিট পাওয়া মুশকিল। রাণাকে বলে দেখি। ওর অনেক ট্র্যাভেল এজেন্ট জানাশোনা আছে। এর মধ্যে আকাশ আর উৎসবকে ফোন করে ইন্দ্রর কথা জানিয়ে দি।"

ছোট ভাই উৎসব থাকে ক্যালিফোর্নিয়ায়— মেজোভাই আকাশ থাকে কানেটিকাটে। অনি ঘোরের মধ্যে উৎসব আর আকাশকে ইন্দ্রর মৃত্যুর ঘটনা বলে— ঈশানের কাছে যেমনভাবে শুনেছিল। সর্বাণীও ফোনে ছিল। মাঝে মাঝে কথার খেই ধরিয়ে দিচ্ছিল অনিকে।

উৎসব বলে, "দাদা, মণিদা যখন আমার কাছে এসেছিল দু' বছর আগে, স্যাক্রামেন্টো টিভির জন্য ছোট একটা ফিচার ফিল্ম করেছিল, তোদের কাছে সেই ক্যাসেটটা আছে কি? তা হলে একটা কপি পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"আমার কাছে একটা কপি আছে। ইন্দ্রই দিয়েছিল।" অনি ভাবছে ইন্দ্রর কথা। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে টেক্সাসে এসেছিল ইন্দ্র দু' সপ্তাহের জন্য। খুব তাড়া তখন ইন্দ্রর। অনেক করে থাকতে বলেছিল অনি আর সর্বাণী। ইন্দ্র বলে— "দাদা, তুই বুঝতে পারছিস না। আমাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে। সেখান থেকে আসামে। কারবি ভাষায় একটা নতুন অপেরা করছি, "হাই-মু"। সম্পূর্ণ কারবি উপজাতিদের নিয়ে। ওদের গান, ওদের নাচ, ওদের বাঁশি, ওদের মাদল, ওদের ঢোলক, ওদের মন্দিরা, ওদের দোতারা দিয়ে এই অপেরাটা তৈরি করেছি। ওরাই গাইছে ওরা নাচছে। সামনের মাসে বিরাট করে উদ্বোধন। আসামের সব বড় বড় ডিগনিটারিরা আসছে। কলকাতা ফিরেই আমাকে ছুটতে হবে ডিফুতে। বেশ-কিছু রিহার্সাল দরকার। এর আগে এই ধরনের অপেরা আমাদের দেশে কখনও হয়নি।"

"দেশে থাকতে তো কখনও কারবিদের নাম শুনিনি ইন্দ্র। এরা কারা, কোথায় থাকে, কী করে?" সর্বাণী জিজ্ঞেস করে।

ইন্দ্র বলে, "আসাম আর মেঘালয়ের মাঝে কারবি আংলঙ— পাহাড় ঘেরা স্বপ্নরাজ্য। কারবিদের দেখতে অনেকটা বার্মিজদের মতো। ভাষারও অনেক মিল। ভীষণ স্বাধীনচেতা লোক এরা। বাইরের জগতের সঙ্গে এরা খুব কম যোগাযোগ রাখে। শহুরে সভ্যতা এখনও ঢোকেনি। ওদের মধ্যে এখনও বেশ-কিছু আদিবাসী আছে যারা গভীর জঙ্গলে থাকে। বিষের তিরে হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি মেরে আগুনে ঝলসে খায়। আইসোলেশনের জন্য নিজেদের একটা ভাষা, নিজেদের একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কারবি আংলঙে।"

"তোর সঙ্গে আলাপ হল কী করে?" অনি জিজ্ঞেস করে।

"পলিটিকাল কানেকশন বলতে পারিস। ওরা একটু নকশালাইট। যার জন্য আমার ওখানে ভীষণ খাতির। বেশ লাগে ওদের মাঝে থাকতে। কলকাতার

লোকের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। জানিস দাদা, খুব ইচ্ছে আছে ওদের নিয়ে একটা ফিচার ফিল্ম করি। একটা দারুণ গল্প লিখেছি ওদের নিয়ে। এখন শুধু একজন অনেস্ট প্রডিউসার দরকার, যে টাকা মেরে দেবে না। মদন আমাকে যে চোটটা দিয়েছিল তার পর থেকে আর কোনও ফিচার ফিল্ম করতে পারলাম না।"

অনির মাসতুতো ভাই মদন। নিজের মেজোমাসির ছেলে। অনির সঙ্গে মদনের খুব ভাব ছিল ছোটবেলায়। ওর চাকরি চলে যাবার পর ইন্দ্রই বলেছিল, 'মদনদা, টাকাপয়সার ব্যাপারটা আমি একদম বুঝি না। তুমি যদি আমার ফিনান্সটা দেখ, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছবি তোলার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারি। গান লিখতে পারি।'

ইন্দ্রই মদনকে ফিল্ম প্রডাকশনের পার্টনার করে নিয়েছিল। ইন্দ্রের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে সেই মদনই ইন্দ্রকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। ব্যাঙ্ক থেকে ইন্দ্রর সব টাকা নিয়ে কোথায় চিরকালের পলাতক হয়ে আছে মদন।

থ্যাঙ্কস গিভিং-এ ইন্দ্রর জন্য সর্বাণী লাবকের স্থানীয় বাঙালিদের নেমন্তন্ন করেছিল। অনেকেই এখানে ভাল গান গায়। এ ছাড়া হিউস্টন থেকে রাণার কিছু বন্ধুবান্ধব এসেছিল। সারারাত ধরে ইন্দ্র গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিল। অনির মনে পড়ল সেই রাতের কথা। সর্বাণীকে জিজ্ঞেস করে "থ্যাঙ্কস গিভিং-এর রাতে ইন্দ্রর গানের যে টেপটা করেছিলাম, সেটা কোথায় জান?"

সর্বাণী বলে, "আমরা তো ভিডিও করিনি, একটা অডিও টেপ আছে। দেব?" এই বলে সর্বাণী খুঁজতে যাকে টেপটা। হঠাৎ বলে, "শঙ্খর জন্মদিনে আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে ইন্দ্র যে গান করেছিল, তার ভিডিওটা আছে। চালিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ", মাথা নাড়ে অনি। সর্বাণী ভিডিওটা চালিয়ে দেয়। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ইন্দ্রকে। গিটারটা নিয়ে গান গাইছে। সঙ্গে শঙ্খ বাজাচ্ছে বেহালা, ওদের ভাগ্নে দীপু ধরেছে হারমোনিয়াম। অদ্ভুত দরাজ গলা ইন্দ্রর। বাউল গাইছে একটার পর একটা। মনে পড়ছে নাইনটি সেভেনের সামার। অনি ডাইনোসর এক্সপিডিশনে কাজ করছিল গুজরাটের কাছে, বালাসিনোর গ্রামে। সেবার অনি সর্বাণী, শঙ্খ ও অর্ঘ্যকে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা মাসখানেক ছিল অনির কাছে। সবাই মিলে ডাইনোসর খোঁজাখুঁজির কাজে অনিকে সাহায্য করেছিল। তার পর সর্বাণী দুই ছেলেকে নিয়ে চলে যায় ব্যাঙ্গালোর, তার পর কলকাতায়। অনি থেকে যায় গুজরাটে কাজের জন্য। শঙ্খর জন্মদিনে নতুন ফ্ল্যাটে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব— সবাইকে ডেকেছিল সর্বাণী। চারতলার ওপর সুন্দর ফ্ল্যাট মনোহরপুকুর রোডে। চারিদিক খোলামেলা। বিরাট বসার ঘরে সবাই মিলে ফ্লোরে বসে। অনি ভিডিওটা দেখছে। ইন্দ্র গান গাইছে। একটার পর একটা। হঠাৎ সর্বাণীর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র বলে, 'বউদি, মনে আছে আমাদের ফেভারিট রবীন্দ্রসংগীতগুলো। আমার সঙ্গে গাইবে?' সর্বাণী গলা দেয় ইন্দ্রর সঙ্গে। অর্ঘ্য ভিডিওটা তুলেছিল ঠিক

প্রফেশনালের মতো। পরে ইন্দ্র ওর কপিটা পেয়ে বলেছিল, 'অর্ঘ্য তো কাকার মতো ফিল্ম ডিরেক্টর হবে মনে হচ্ছে।'

গানের শব্দে রাণা আর অর্ঘ্য ঘুম থেকে উঠে বসার ঘরে এসেছে। অনি আর সর্বাণীর থমথমে মুখ দেখে রাণা বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কোনও খারাপ খবর আছে।

"অনিদা, কী হয়েছে, তোমরা ইন্দ্রর গান শুনছ? ভিডিওটা দারুণ তো?"

"এইমাত্র কলকাতার থেকে খবর পেলাম ইন্দ্র মারা গেছে হার্ট অ্যাটাকে। রাণা, আমি ভাবতে পারছি না ইন্দ্র আর নেই। মনে আছে, আমরা কী হইচই করেছিলাম বছর দুয়েক আগে এই ঘরে বসে?"

"কী বলছ অনিদা? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ইন্দ্র মারা গেছে কী করে?"

"মণিকাকা মারা গেছে?" অর্ঘ্য চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। সর্বাণী অর্ঘ্যকে জড়িয়ে ধরে। সব গল্প করে। অর্ঘ্যকে বলে, "তুমি একটু দাদাকে স্যানডিয়েগোতে ফোন করে দাও। বাবা হয়তো কাল-পরশু কলকাতায় চলে যেতে পারে।"

অনি রানাকে বলে, "রাণা, আমাকে একটা কলকাতার টিকিট জোগাড় করে দিতে পার? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেতে চাই।"

রাণা বলে, "তুমি ভেবো না অনিদা, আমি টিকিট জোগাড় করে দেব।"

এর মধ্যে মুন্নি ঘরে ঢোকে। সর্বাণী ওকে ইন্দ্রর কথা বলে। অর্ঘ্য ভিডিওটা রিওয়াইন্ড করে চালিয়ে দেয়। সব ঘটনা শুনে মুন্নি বলে, "এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কাল সারারাত আমরা মৃত্যুর কথা বলেছি। অনি তখন চুপ করে শুনছিল আমাদের কথা। তোমাদের মুখে, মার মুখে ইন্দ্রর কত গল্প শুনেছি। টিভির দিকে তাকিয়ে বলে, "এই বুঝি ইন্দ্র গান গাইছে, অনেকটা অনির মতো দেখতে। মুখের দাড়িটায় আর ছোট চশমায় স্টিফেন স্পিলবার্গের মতো দেখাচ্ছে। একটা ইনটেলেকচুয়াল-এর ছাপ আছে। আবার কোথায় যেন চে গুয়েভারার মতো রিভলিউশনারি স্ট্রিক।

"ইন্দ্র ফিল্ম ডিরেক্টর ছিল না?" মুন্নি জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, ইন্দ্র ওর ফিল্ম 'শঙ্খিনী'র জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পেয়েছিল! রৌপ্যকমল— আঞ্চলিক ভাষায় শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য। এদেশের অস্কারের মতো। এর পর ইন্দ্র আরেকটা ফিচার ফিল্ম করে 'মহাকাল'— দু' বন্ধুর গল্প। এক বন্ধু মিউজিশিয়ান, আমেরিকায় চলে আসবে। খুব নাম করবে, অনেকটা জুবিন মেহতার মতো। আর-এক বন্ধু নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বে। ধরা পড়ে জেল খাটবে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শুনবে আমেরিকা থেকে ওর বন্ধু কলকাতায় ফিরেছে। একটা পিয়ানোর পারফরমেন্স দেবে কলামন্দিরে। আমন্ত্রণ করেছে নকশালপন্থী বন্ধুকে। ও যাবে কি যাবে না ভাবছে। আদর্শের

সঙ্গে এমন দ্বন্দ্ব এমন সংঘাত আমি কোনও বাংলা বইয়ে দেখিনি। নকশাল বন্ধুর গল্পটা অনেকটা ইন্দ্রর নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব।

"সবচেয়ে খারাপ লাগে, 'মহাকাল' বইটা কোনওদিন রিলিজ হয়নি। এ যেন ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'। এমন একটা বলিষ্ঠ মুভি কখনও দেখিনি। কোনও কম্প্রোমাইজ নেই। প্রোডিউসার বইটা আটকে রাখল। ইন্দ্রকে না জানিয়ে বাইরে বিক্রি করার চেষ্টায় ছিল। ইন্দ্রর ভাগ্যটাই খারাপ। শেষ ফিল্মটা অনেক চেষ্টা করে শুরু করল দশ বছর পর। শেষ করার পর ও নিজেই দেখে যেতে পারল না।"

সর্বাণী তাড়া লাগায় রাণাকে। "রাণা, লক্ষ্মীটি। একটা প্লেনের টিকিট জোগাড় করে দাও অনির জন্য। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। অনির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা যাওয়া দরকার।"

"তোমার কর্ডলেস ফোনটা দাও সর্বাণীদি। আমি পাশের ঘর থেকে চেষ্টা করছি।" এই বলে রাণা পাশের ঘরে চলে যায়। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে আসে। বলে—

"একটা টিকিট পাওয়া গেছে অনেক চেষ্টা করে। এমার্জেন্সি কোটায়। থাই এয়ারলাইনসে। একটু বেশি ভাড়া পড়বে। দু' হাজার ডলারের মতো। লস্ এঞ্জেলেস থেকে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসে যেতে হবে। ইকনমি ক্লাসে কোনও টিকিট নেই। যদি বল তো এক্ষুনি কনফার্ম করতে পারি।"

হাতের লেখা চিরকুট দেখে রাণা বলে, "আগামী কাল সকাল দশটায় লাবক থেকে প্লেন ছাড়বে। লাবক-ডালাস-লস্ এঞ্জেলেসে। লস্ এঞ্জেলেস থেকে দুপুর একটায় ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ছাড়বে। ব্যাঙ্ককে একটা রাত থাকতে হবে। ওরাই এয়ারপোর্ট হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছে। সকাল দশটায় ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতা, দুপুর বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবে।"

"ভালই হবে, ব্যাঙ্ককে একটু রেস্ট হবে," মুন্নি বলে।

"অনিদা, তোমার ক্রেডিট কার্ডটা দাও। ফ্লাইটটা কনফার্ম করে দি। আজ রাত দশটায় ফেডেক্সে তোমার টিকিটটা বাড়িতে এসে যাবে।"

"থ্যাঙ্ক য়ু রাণা। বড় উপকার করলে।"

সর্বাণী বলে, "অনি, আমি শঙ্খর সঙ্গে একটু আগে কথা বললাম। ও আজ রাতেই লাবকে আসছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

সর্বাণী সবাইকে খেতে দেয়। খেতে খেতে মুন্নি বলে, "রাণা, অনির ফ্লাইট নাম্বারটা দাও তো। আমি অনির সঙ্গে দেখা করব লস্ এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে। আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে। বাবাকে নিয়ে গোছগাছ করে একটু পরেই রওনা দিতে হবে।"

মুন্নি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে। অনির দিকে তাকিয়ে বলে, "খুব খারাপ

লাগছে ইন্দ্রর কথা শুনে। খুব সাবধানে যেয়ো এতটা পথ। কাল দেখা হবে এয়ারপোর্টে", এই বলে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

রাণা বলে, "মুন্নিদি, তোমার ফ্লাইটে আমিও হিউস্টনে যাচ্ছি। একটু পরেই দেখা হবে এয়ারপোর্টে।"

সন্ধের সময় ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বড়ছেলে শঙ্খ এসে পৌঁছয় লাবক এয়ারপোর্টে। সর্বাণী গিয়ে শঙ্খকে নিয়ে আসে। শঙ্খ বাবাকে জড়িয়ে ধরে। ইন্দ্রর সঙ্গে শঙ্খর চিরকালই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শঙ্খর তখন কতই বা বয়েস হবে। বড় জোর এগারো। গ্রীষ্মের ছুটিতে সবাই কলকাতা বেড়াতে গেছে। ইন্দ্র তখন ন্যাশনাল টিভির জন্য সিরিয়াল করছিল। "ডিয়ারেস্ট মম"। প্রতিদিন শঙ্খকে স্টুডিয়োতে নিয়ে যেত। শঙ্খ ওই টিভি সিরিয়ালে বেশ-কিছু জায়গায় বেহালায় সুর দিয়েছিল। ইন্দ্র খুব ভালবাসত শঙ্খকে। সাইলেন্ট মুভিটা দেখিয়ে বলত 'তোর মনের মধ্যে ছবিটা দেখে যে অনুভূতিটা হচ্ছে সেইটাই তুই বেহালায় বাজা।' শঙ্খ খুব সুন্দর বাজিয়েছিল সেই ছবিটায়। শঙ্খর সঙ্গে ওর পিসতুতো ভাই দীপুও বাজাত গিটার। দীপুকে গিটার শিখিয়েছিল ইন্দ্র, মনের মতো করে। শঙ্খ আর দীপু, দু'জনকেই খুব ভালবাসত ইন্দ্র ওদের সংগীতের প্রতিভার জন্য।

শঙ্খ গিটারটা নিয়ে বাবার কাছে বসে। মণিকাকার বেশ-কিছু বাউল গান বাবাকে শোনায়। হার্ভার্ডে পড়ার সময় শঙ্খ কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ব্যান্ড তৈরি করে, "করিশমা"। সারা আমেরিকায় ওরা ইন্ডিয়ান ক্লাসিকের নানা ধরনের প্রোগ্রাম করে। ওদের ব্যান্ডে জাকির হোসেনের এক ছাত্র আছে— সন্দীপ। প্রতি প্রোগ্রামে শঙ্খের বেহালা আর সন্দীপের তবলা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়। এ ছাড়া শঙ্খদের গ্রুপে আছে গৌরব ও তার বউ ফাল্গুনী। ফাল্গুনী গান শিখেছিল সুলতান খান আর কিশোরী আমনকরের কাছে। অদ্ভুত সুন্দর গলা ফাল্গুনীর। গৌরব গায় গজল ও বেশ-কিছু হিন্দি ফিল্মের গান। এ ছাড়া ওদেরই দলে আছে হারীল— ভাল গিটার বাজায়। শঙ্খ মাঝে মাঝে মণিকাকার বাউল গান করে ফাংশনে। গৌরব ইংরেজিতে তার মানে বলে দেয় সুন্দর করে। ফোক মিউজিকের আবেদন সর্বজনীন। শঙ্খ পাঁচ বছর বয়স থেকে বেহালায় ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিক বাজায়। কলকাতায় একবার বেড়াবার সময় শিশিরকণা ধরচৌধুরীর কাছে ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিকের তালিম নিয়েছিল। সেই থেকে ও ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিকের ভক্ত। রবিশঙ্কর, আলি আকবর, চৌরাশিয়া আর সুলতান খানের সব সিডিই আছে শঙ্খর। হার্ভার্ড থেকে পাস করে শঙ্খ এখন স্যানডিয়েগোতে গবেষণা করছে। সল্ক ইনস্টিটিউটে নিউরোসায়েন্স। আমাদের ব্রেন কী করে বাইরের জগতের ছবি বিশ্লেষণ করে— এর ওপর শঙ্খর গবেষণা। মানুষের দেড় কেজি ওজনের ব্রেন বোধহয় বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়। ব্রেনের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটারও হার মেনে যায়।

ঠিক দশটার সময় সর্বাণী ফোন করল কলকাতায়, পাশের বাড়ির চিত্রাকে। ঈশান ফোনের কাছেই বসেছিল। সারাদিন আকাশ আর উৎসবের সঙ্গে টেলিফোনে ইন্দ্রকে নিয়ে অনেক গল্পই করেছে অনি আর সর্বাণী। কখনও হাসির, কখনও কান্নার। আকাশ ইন্দ্রর ঠিক ওপরের ভাই। ও ছোটবেলার স্কুলের মজার মজার গল্প করল ইন্দ্রকে নিয়ে। আকাশ খুব ভাল ক্ল্যাসিকাল গান গায়, মেহেদি হাসানের মতো। উৎসব সবার ছোট। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের ইকনমিস্ট। ইন্দ্রর 'অশ্বমেধ' ব্যান্ডে উৎসব বাজাত বেস্। কখনও বা কোরাসে গাইত। ঈশান ছিল ইন্দ্রর পরের— ছায়ার মতো ইন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। ঈশানকে নিয়ে ইন্দ্র 'বাঁদর-খেলা' দেখাত— 'হিজড়ে-নাচ' দেখাত আত্মীয়-স্বজনের বিয়ের বাসর রাতে। ঈশান ইন্দ্রের মতো গিটার বাজায়, গান গায়। ঈশান ইঞ্জিনিয়ার। এম এন দস্তুরে কাজ করে। ঈশান শান্তভাবে, সুন্দর করে ইন্দ্রর শ্মশানে নিয়ে যাবার সব ঘটনা বলল। শেষ সময় আর কান্না চেপে রাখতে পারেনি ঈশান।

পরের দিন ভোরবেলা অনি বেরিয়ে যায় কলকাতার পথে। ঠিক দুপুর একটায় অনির প্লেন ছাড়ল লস্ এঞ্জেলেস থেকে। মুন্নি এয়ারপোর্টে এসেছিল। এখন টুরিস্ট সিজন— জুন মাস। থাই এয়ারলাইনসে ঠাসা লোক। প্লেনের দোতলায় এল অনি। ফার্স্ট ক্লাস। এখানে যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। সব মিলিয়ে কুড়ি জনের বেশি হবে না। বেশির ভাগ সিটই ফাঁকা। অনির পাশের সিটে কেউ নেই। ইচ্ছে করলে পুরো পথটা শুয়ে যেতে পারবে। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে প্লেন চলছে। ষোলো ঘণ্টার পথ ব্যাঙ্কক। জানলার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রর কথা ভাবছে অনি। মনে পড়ছে লাবকে যখন ইন্দ্র এসেছিল, সবাই মিলে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল কার্লসবাদ ক্যাভার্নে— নিউ মেক্সিকোতে। লাবক থেকে গাড়িতে ঘণ্টা চারেক লাগে। আমেরিকার ন্যাশনাল পার্ক কালর্সবাদ ক্যাভার্ন। তিরিশ কোটি বছর আগে পার্মিয়ান যুগে টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকোর অনেকটা জায়গা সমুদ্রে ঢাকা ছিল। নীল সমুদ্রের জল ঘিরে ছিল অসংখ্য প্রবাল দ্বীপ। অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রিফের মতো। এই পার্মিয়ান বেসিনেই টেক্সাস আর নেউ মেক্সিকোর সব পেট্রোলিয়ামের রিজার্ভ। কার্লসবাদে সেই প্রবাল পাথরগুলো মাটির নীচের জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অপূর্ব গুহা তৈরি করেছে। বিরাট বিশাল সেইসব গুহা। সেই গুহার ছাদ থেকে মুক্তোর রঙে স্তম্ভের মতো মাটিতে নেমেছে স্ট্যালাক্‌টাইট— উলটোদিকে মাটি থেকে ওপরে উঠেছে স্ট্যালাগমাইট। লাইমস্টোনের অপরূপ কারুকার্য দেখে ইন্দ্র দারুণ খুশি। কোনওটা মন্দিরের মতো— কোনওটা রাজপ্রাসাদের মতো। প্রকৃতির কী আশ্চর্য সৃষ্টি। ইন্দ্র বলেছিল, 'মহাভারতে যে ময়দানব যুধিষ্ঠিরের জন্য স্ফটিকের প্রাসাদ তৈরি করেছিল, ঠিক সেরকমই দেখাচ্ছে রে। কী দারুণ জিনিস দেখালি দাদা। মনটা ভরে গেল।'

ফেরার সময় ইন্দ্র অনির পাশের সিটে বসেছিল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনি বেশ জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিল। রাস্তা একদম ফাঁকা। ইন্দ্র ছোটবেলার গল্প করেছিল। হঠাৎ বলে 'দেখ দাদা, আমাদের বাড়িতে যে সব ঘটনা ঘটেছে তুই যদি লিখে রাখতে পারিস একটা ছোটখাটো মহাভারত হয়ে যাবে। লেখ-না। তোর লেখা 'পৃথিবীর শেষ প্রান্তে' বেস্ট সেলার লিস্টে ছিল বহুদিন। তুই চেষ্টা করলে পারবি। পরে বড় হয়ে শঙ্খ, অর্ঘ্য পড়বে। এটা আমাদের পরিবারের একটা দলিল হয়ে থাকবে।'

'জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার?' অনি ঠাট্টা করে।

'ঠাট্টা নয়, তুই ভেবে দেখ আমাদের বাড়িতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে— একটার পর একটা— ভাল-মন্দ মিশিয়ে একটা উপন্যাস হয়ে যেতে পারে। ভেবে দেখ কলোনির কথা, কী কষ্টটাই মা-বাবা করেছে। তবু এত দারিদ্র্যের মধ্যে আমরা কিন্তু আনন্দ করেই বড় হয়েছি, লেখ-না দাদা? আমাদের চ্যাটার্জি ফ্যামিলির 'মেঘে ঢাকা তারা'র গল্প।'

'পঁচিশ বছর প্রবাসী জীবনে বাংলাটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে ইন্দ্র। এর মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কত উন্নতি হয়ে গেছে, লেখার স্টাইল কত পালটে গেছে। তুই লেখ-না। তোরা তো এর মধ্যে আছিস। আমি বাংলায় চিঠি লিখতে গেলে কথা খুঁজে পাই না। চর্চার অভাবে অনেক কথাই ব্রেন থেকে বেমালুম মুছে গেছে।'

'শোন দাদা, তোর কতগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে। প্রথমত তুই বাড়ির বড় ছেলে, বেশ-কিছু ঘটনা তুই জানিস, বিশেষ করে মা-বাবার ছোটবেলার কথা, বরিশালের কথা— যেটা আমরা জানি না। দ্বিতীয়ত, তোর মধ্যে কেমন যেন একটা নির্লিপ্ততা আছে। আমরা হলে একটা দল নিয়ে নেব, আমাদের লেখায় পক্ষপাতিত্ব থাকবে। ছোটবেলায় 'মহাস্থবির জাতক' পড়েছিলাম, দাদা সেইরকম করে আমাদের ঘটনাই তুই লিখে রাখ। প্লিজ।'

অনি বলে, 'দেখ ইন্দ্র আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তুই অর্জুন। বাড়ির মধ্যমণি। তোকে ঘিরেই আমাদের বাড়ির ঘটনা পল্লবিত হয়েছে। তুই আমাদের বাড়ির নায়ক। যদি লিখি তোকে কেন্দ্র করেই লিখতে হবে।'

ইন্দ্রর কথা মনে পড়ে অনির। সত্যি ভাইদের মধ্যে ইন্দ্রই ছিল অর্জুন।

অনি ঠিক করল ও তাদের বাড়ির সব ঘটনা লিখে রাখবে। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, বঞ্চনার কথা। ইন্দ্রর কথা মনে পড়ে অনির। ইন্দ্রর অনুরোধ রাখবে। ওদের পরিবারের ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। সাধারণ কাহিনী, মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। হয়তো অনেক প্রামাণ্য তথ্যের হেরফের হবে এই লেখায়। তবুও ইন্দ্রর জন্য এই বই লিখবে— নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের অনুভূতি নিয়ে। এই লেখায় নাই বা থাকল সাহিত্যের মারপ্যাঁচ, নাই বা রইল

ইতিহাসের নিখুঁত পঞ্জিকা। কোনও বইপত্র নাড়াচাড়া না করে মনের ঘটনাগুলো সাজাবে। আস্তে আস্তে তো সবাই চলে যাচ্ছে। ওদের বাড়ির ঘটনাগুলো বলার কেউ লোক থাকবে না। কোথা থেকে শুরু করবে এই আত্মকাহিনী ভাবছে অনি প্লেনে বসে।

এয়ারহোস্টেস খাবার দিয়ে যায়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় অনি। চারদিক অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্লেনের ডানার প্রান্তে ছোট ছোট আলো জ্বলছে আর নিভছে। টিপটিপ করে জোনাকির মতো। রুপোলি ডানার চিল মহাকাশের অন্ধকারে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলেছে পশ্চিমের আকাশে।

খাওয়া শেষ করে একটা ছোট্ট লিকারের গ্লাস নিয়ে অনি ভাবে ইন্দ্রর কথা। ইন্দ্র আর নেই ভাবতেই ওর সব দুঃখ উথলে উঠল। ঈশানের কাছে শোনা পরপর ঘটনা সাজাতে শুরু করে। ইন্দ্রর জন্য ওদের পারিবারিক ঘটনা লিখে রাখবে। ঠিক আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনীর মতো করে লেখা কিছু ঘটনার সংকলন। দিনক্ষণ হয়তো ঠিক হবে না। পাঠক-পাঠিকারা হয়তো ভুল ধরবে। তা ধরুক। ও লিখছে ইন্দ্রর স্মৃতির জন্য। ব্রেনের মধ্যে কত স্মৃতিই সংরক্ষিত আছে কম্পিউটার ফাইলের মতো। সেই ফাইলগুলো খুলবে একটার পর একটা। কিছু ফাইল মুছে গেছে চিরকালের জন্য। ইন্দ্রকে দিয়েই শুরু করা যাক। ইন্দ্রর মৃত্যু নিয়েই। হেমছায়ার মন নিয়ে ইন্দ্রকে ভাবতে বসে অনি। ইন্দ্রর শেষ দিনের কথা। মা ইন্দ্রকে জড়িয়ে আছে। মা সত্যিই ইন্দ্রকে ভালবাসত।

৩

ইন্দ্রর শরীরটা হিম হয়ে গেছে এই ভরা জ্যৈষ্ঠের হলুদ দুপুরে। সাদা বরফের স্ল্যাবে শুয়ে আছে ইন্দ্র নাকতলার বসার ঘরে। হেমছায়ার মনে নেই কতক্ষণ ইন্দ্রর বুকের ওপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছিলেন। তাঁর দামাল, দুরন্ত ছেলে ইন্দ্র আজ চুপ করে শুয়ে আছে চিরশান্তিতে— ঘরের ঠিক মাঝখানে। চারিদিকে কত মুখ তাকিয়ে আছে হেমছায়ার দিকে। সবার চোখে জল। হেমছায়ার মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীটা ঘুরছে নাগরদোলার মতো। কেমন ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে আছেন ইন্দ্রর দিকে। চেনা-চেনা মুখ হারিয়ে যাচ্ছে বারে বারে। পৃথিবীটা কেমন যেন ছোট হয়ে আসছে, দমবন্ধ হয়ে আসছে হেমছায়ার। কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ইন্দ্রর এই আকস্মিক মৃত্যুকে। ইন্দ্র কি সত্যিই চলে গেছে চিরকালের জন্য? নাকি তিনি এক দুঃস্বপ্ন দেখছেন? ইন্দ্রর নিষ্প্রাণ দেহটা ঝাঁকি দিয়ে হেমছায়া কেঁদে উঠলেন, "ইন্দ্র, একটু কথা বল, চোখ মেলে তাকা। দ্যাখ্, কত লোক তোকে দেখতে এসেছে।"

হেমছায়া ভাবতে চেষ্টা করছেন। এই তো কিছুক্ষণ আগে জলখাবার খেয়ে ইন্দ্র বের হল স্টুডিয়োতে। যাবার আগে বলে গেল "মা, আমি এখুনি ফিরে আসব।" তিন ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। কী মর্মান্তিক ঘটনা। একটা জলজ্যান্ত ছেলে কিছু জানান না দিয়েই চলে গেল? আলতো করে ইন্দ্রর বুকের ওপর কান রাখলেন হেমছায়া। বন্ধ হয়ে গেছে ইন্দ্রর বুকের ধুকপুকি। উড়ে গেছে অচিন পাখি খাঁচা ছেড়ে। ইন্দ্র আর কোনওদিন কথা বলবে না। মা বলে ডাকবে না কোনওদিন। কোনওদিন আর গান গাইবে না। কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না হেমছায়া। একী সর্বনাশ হয়ে গেল। ইন্দ্রকে শক্ত করে ধরে আছেন হেমছায়া। আস্তে আস্তে ওর কপালে, চুলে, মুখে আদর করছেন। একটু তর সইল না ইন্দ্রর। এই সাতসকালে ইন্দ্রর বের হবার কোনও দরকার ছিল কি? কেন জোর করে ইন্দ্রকে ধরে রাখলেন না এই ভেবে নিজেকে অপরাধী লাগছে হেমছায়ার। এই শরীরে এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়? ছেলে পাগলের মতো খেটেছে এই ফিচার ফিল্মটা শেষ করার জন্য। নিজে দেখে যেতে পারল না নিজের শেষ সৃষ্টি। হেমছায়ার মনে হল জীবনে কোনও কিছুর কোনও মানে নেই। শেষ বয়সে সন্তান হারাবার কী ভয়ংকর শাস্তি।

ভাববার চেষ্টা করছেন হেমছায়া ইন্দ্রর শেষ ক'টা মুহূর্ত। মাস দুয়েক বাড়ির বাইরে ছিল ইন্দ্র সুটিং করার জন্য। গতকাল রাতে ঝড়ের মতো ফিরল ইন্দ্র আসামের কারবি আংলঙ থেকে। কারবি উপজাতির ওপর একটা ফিচার ফিল্ম শেষ করেছে ইন্দ্র-- নিজের লেখা, নিজের সুর, নিজের পরিচালনা। নতুন ছবির নাম "রংবিন"। সারারাত ধরে মাকে গল্প বলছিল ইন্দ্র। পাশে ওর বউ নিশা তন্ময় হয়ে শুনছে ইন্দ্রর কথা।

"জানো মা। রংবিন মানে গোলকধাঁধা। একটা মায়ার রাজ্য। একটা প্যারালাল ওয়ার্ল্ড। ওখানে ভুল করে কেউ ঢুকে পড়লে আর বেরতে পারে না। ওই গোলকধাঁধার দেশে এক শহুরে ছেলে ঢুকে পড়েছিল। সেখানে এক ট্রাইবাল চিফের মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। তার পর কীভাবে মৃত্যুর হাত থেকে নায়ক উদ্ধার পায় তারই গল্প এই ছবিতে।" কারবি উপজাতির জীবনযাত্রা ধরে রেখেছে ইন্দ্র এই ছবিতে। শহরের সঙ্গে গ্রামের দ্বন্দ্ব, নতুনের সঙ্গে পুরনোর সংঘর্ষ এই ছবিতে। এদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইন্দ্রর এই নতুন ছবিতে। শুটিং চলার সময় অমানুষিক খেটেছে ইন্দ্র। খাওয়া দাওয়া, ঘুম— সব-কিছুর অনিয়ম হয়েছে। কেন জানি না ভীষণ তাড়া ছিল ইন্দ্রর। কত কী করার আছে বাকি। ছবি শেষ করতেই হবে। বিদেশ থেকে আনতে হবে জয়মাল্য। এত খুশি ইন্দ্রকে বহুদিন দেখেননি হেমছায়া।

ইন্দ্রকে শক্ত করে ধরে আছেন হেমছায়া। ওর চোখ দুটো বোজা। মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। কিছুতেই সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারত না ইন্দ্র। এই

নিয়ে কম ঝক্কি পোয়াতে হয়নি হেমছায়ার। স্কুল, কলেজে সবসময় দেরি করে ফেলত ইন্দ্র। বহুক্ষণ ডাকার পর চোখ তুলত ইন্দ্র। হাই তুলত, তার পর শুয়ে পড়ত পাশ ফিরে। কিছুতেই উঠতে চাইত না ইন্দ্র ভোরবেলা। ইন্দ্র ছিল নিশাচর। রাতের সঙ্গেই ওর ছিল বন্ধুত্ব। যখন রাত বাড়ত, তখনই ইন্দ্রর কাজের জোয়ার। অনেক দেরি করে ঘুমতে যেত। ভোরবেলা অঘোরে ঘুমত ইন্দ্র। কী শান্তিতেই ইন্দ্র আজ ঘুমচ্ছে গ্রীষ্মের এই ভরদুপুরে। হেমছায়া পুরনো দিনের মতো আবার বলে উঠলেন—"ইন্দ্র, ওঠ। তোর জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। দেরি হয়ে যাবে।"

সাদা ফুলে সাজিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রকে। রজনীগন্ধা, জুঁই আর বেলফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে ওর মরদেহ। ফুলের ভারে ওর ব্যথা লাগছে না তো? বিয়ের সময় এই ইন্দ্রই মালা, টোপর, চন্দন কিছুই পড়েনি। চিরকালের বিদ্রোহী ইন্দ্র। কোনওদিনই ইন্দ্র নিয়ম মানেনি। সোজা পথে কখনও হাটেনি। কারও কথাই ইন্দ্র কোনওদিন শোনেনি। ও নিজের পথ নিজে খুঁজেছে। সবাই ওকে অনুসরণ করেছে। ইন্দ্র ছিল পথপ্রদর্শক। এখন তো আর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই ইন্দ্রর। এই সুযোগে সবাই সাজিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রকে মালায় আর ফুলে।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন হেমছায়া। ঘরভর্তি লোক। সবাই কাঁদছে ইন্দ্রকে ঘিরে। একপাশে ইন্দ্রর গীটারটা পড়ে আছে। দেয়াল জুড়ে বুক শেলফে ঠাসা বই। তার ওপর সারি সারি ক্যাসেট। দেয়ালে পিকাসোর একটা ছবি। তার পাশে ইন্দ্রর আর নিশার বিয়ের ছবি। কী সুন্দর বিয়ের ছবিটা তুলেছিল তুষার। ইন্দ্রর তখন কত বয়েস হবে। তিরিশের কাছাকাছি। ইন্দ্র যে বিয়ে করবে ভাবতেই পারেননি হেমছায়া। কী সুন্দর দেখতে ছিল ইন্দ্র। একগাল দাড়ি। চোখের কোণে সবসময় হাসি। সালংকারা নিশাকে সুন্দর দেখাচ্ছে ইন্দ্রর পাশে। ইন্দ্রর পছন্দ করা বউ। ভূপালে চাকরি করার সময় ইন্দ্রর সঙ্গে নিশার আলাপ। খুব অল্প বয়স তখন নিশার। ইংরেজিতে এম এ, উর্দু মেশানো হিন্দি বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। ইন্দ্রর পাশাপাশি সবসময় থেকেছে নিশা। ইন্দ্রর বেপরোয়া, বাউন্ডুলে জীবন নিয়ে কখনও অভিযোগ করেনি নিশা। ওর চোখে ইন্দ্র এক বিরাট শিল্পী। ইন্দ্রর শিল্পসত্তা বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিশা সব কষ্টই সইতে রাজি। ইন্দ্রর ফিল্মের ব্যাপারে নিশাই ছিল সত্যিকারের সহকর্মী। আজ ইন্দ্র চলে গেল। নিশাকে দেখবে কে? হেমছায়ার মনে হল নিজেকে শক্ত হতে হবে নিশার কথা ভেবে, ওদের ছেলেমেয়ে— বাপি ও তুলির কথা ভেবে। যতদিন পারেন হেমছায়া ওদের আগলে রাখবেন। আবার নতুন করে দায়িত্ব বাড়ল হেমছায়ার। ইন্দ্রর বউ ও ছেলেমেয়ের দায়িত্ব এখন ওঁর ওপর। হেমছায়া ভাবছেন ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। আসামে যাবার ঠিক আগেই এই ইন্দ্রই হেমছায়াকে জোর করে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন হল হেমছায়া আশিতে পা দিয়েছেন। শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না কয়েক মাস ধরে। শারীরিক যন্ত্রণা গোপন করে

রেখেছিলেন। হঠাৎ একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে যান। প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ইন্দ্র জোর করে যোধপুর পার্কের এক নার্সিংহোমে নিয়ে গেল মাকে। সেখানে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল হেমছায়ার। ধরা পড়ল অসুখ। মাসখানেক ছিলেন নার্সিংহোমে। যত্নে, ওষুধে ও চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন হেমছায়া। বাড়ি ফিরে দেখেন বাথরুমটা নতুন করে রেখেছে ইন্দ্র বিলিতি কায়দায়, মা"র যাতে কষ্ট না হয়। চমকে দেওয়াই ছিল ইন্দ্রর কাজ। মা'কে সুস্থ করে তড়িঘড়ি করে ইন্দ্র ছুটল কারবি আংলঙে দলবল নিয়ে— নতুন ফিল্ম করার উন্মাদনায়। ফিল্ম শেষ করার আগে নিজেই ইন্দ্র চলে গেল। কী নিষ্ঠুর এই পৃথিবী। কান্নায় ভেঙে পড়েন হেমছায়া।

"আমায় নিঃস্ব করে গেলি ইন্দ্র। আমি কী নিয়ে থাকব।"

কত কী ভাবছেন হেমছায়া। ইন্দ্রর ছোটবেলার কথা, ইন্দ্রর বড় হবার কথা। ভাবছেন প্রয়াত স্বামী আনন্দশেখরের কথা। চোদ্দো বছর আগে আনন্দশেখর মারা গেছেন এমনি এক গ্রীষ্মের ভরদুপুরে। আনন্দশেখরের সঙ্গে ইন্দ্রর মিল ছিল অনেক ব্যাপারে। দু'জনেই খুব আড্ডা, গান-বাজনা, লোকজন, হইচই ভালবাসত। দু'জনেরই খুব সবাইকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল। দু'জনেই ছিল অসম্ভব রাগী। এদের দু'জনকে সামলাতে হেমছায়াকে হিমসিম খেতে হয়েছে। হেমছায়ার অন্য ছেলেমেয়েরা সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। ইন্দ্রই থেকে গেছে কলকাতায় মা-বাবাকে নিয়ে। হেমছায়ার মতো আনন্দশেখরও একদিন মাথা ঘুরে বাথরুমে পড়ে যান। ইন্দ্র তখন বাড়ি ছিল। বাবাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় ইন্দ্র। ইন্দ্রর অনেক বন্ধুই ডাক্তার। তারা সবাই আনন্দশেখরের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। ইন্দ্র তখন বেশির ভাগ সময়ই হাসপাতালে কাটাত বাবার কাছে। কুড়ি দিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি চলল। আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠলেন আনন্দশেখর। আর ভাল লাগছিল না হাসপাতালে। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে যাবেন এই নিয়ে ইন্দ্রকে তাড়া দিচ্ছিলেন। ইন্দ্র খোঁজ নিয়ে জানল একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আনন্দশেখর ফিরবেন বাড়িতে।

ইন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরল সেদিন। বাবার ঘরটা সাজিয়ে রাখল ইন্দ্র। কোণে সেতারের ধুলো ঝেড়ে রাখল। আলমারির ওপরে বেহালা খুলে দেখল তারগুলো সব সুরে বাঁধা আছে কি না। দেয়ালে বাবার ছবিটা দেখল ইন্দ্র। সাদা অ্যাপ্রন পরা টেস্টটিউব হাতে রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে ছবিটা কে যেন তুলেছিল। খুব গর্ব লাগে ইন্দ্রর বাবাকে নিয়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিষ্য ছিলেন আনন্দশেখর। একদিকে বিজ্ঞানী, একদিকে সংগীতের পূজারি। সব যন্ত্রই বাজাতে পারতেন আনন্দশেখর। বাবার থেকেই ইন্দ্র পেয়েছে সংগীতের অনুপ্রেরণা, বিভিন্ন যন্ত্র-বাদনের পারদর্শিতা। আনন্দশেখর বাজাতেন বেহালা ও

সেতার সমান দক্ষতায়। গভীর রাতে বেহাগ আর পিলুতে সুর তুলতেন তিনি। করুণ মূর্ছনায় ভেসে যেত সেই সুর। কেমন যেন এক বিষাদ, বিষণ্নতা সেই সুরে। বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র এইসব কথা ভাবছিল। বিকেলের দিকে নিয়ে আসবে বাবাকে বাড়িতে। হেমছায়াও খুশি। ইন্দ্রর সঙ্গে হেমছায়াও যেতে চান হাসপাতালে আনন্দশেখরকে নিয়ে আসতে।

"ইন্দ্র, আমাকে নিয়ে যাবি তো হাসপাতালে?"

"নিশ্চয়ই মা, তোমার বরকে তো তুমিই নিয়ে আসবে।" চিরকালের ঠাট্টা করার অভ্যেস ছিল ইন্দ্রর। মা'র সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ হাসপাতাল থেকে ফোন এল।

"ইন্দ্রবাবু, এক্ষুনি চলে আসুন, আপনার বাবা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হয় ছোটখাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে।"

ইন্দ্র আর হেমছায়া ট্যাক্সি নিয়ে যখন হাসপাতালে পৌঁছল, তখন আনন্দশেখর পৌঁছে গেছেন মৃত্যুর দোরে। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে ইন্দ্র। এত কান্না ওর জমেছিল? আস্তে আস্তে আত্মীয়স্বজন খবর পেয়ে সব চলে আসে হাসপাতালে। ইন্দ্রকে কেউ সামাল দিতে পারছে না। রাগে, দুঃখে, যন্ত্রণায়, অভিমানে ইন্দ্র পাগলের মতো করছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না বাবার মৃত্যুকে। পাগলের মতো গেয়ে ওঠে—

"কথা দিয়া বন্ধু চইলা গ্যালা"

বাবাকে শ্মশানে নিয়ে গেছে ইন্দ্র পাগলা ভবার গান গেয়ে।

"নদী ভরা ঢেউ। বোঝে না তো কেউ"

সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য!

বাবার মৃত্যুর পর ইন্দ্র মাকে আগলে রেখেছে। বাইরে ইন্দ্রর যতই পাগলামি থাক, ফিরে এসে মা'র সঙ্গে একটু গল্প করা চাই। এটা ওর বহু বছরের অভ্যেস। ইন্দ্রর খুব গর্ব হেমছায়া একটু বেশি ভালবাসেন ওকে। এই নিয়ে ইন্দ্রর ভাইবোন কম খোঁটা দেয়নি হেমছায়াকে। "মা তো ইন্দ্র বলতে অজ্ঞান। ওর কোনও দোষ দেখতে পায় না।" হেমছায়া মুচকি হেসে বলেন, "আমার কাছে আমার সব ছেলে-মেয়েই সমান। তবে ইন্দ্রটা পাগল বলে ওর জন্য আমার যত চিন্তাভাবনা।"

হেমছায়া নিজেকে জিজ্ঞেস করেন—"সত্যিই কি ইন্দ্রর ওপর ওঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল?" হয়তো তাই। বাড়ির মধ্যে এই ইন্দ্রই দিয়েছে হেমছায়াকে আনন্দ, দুঃখ, চিন্তাভাবনা, সম্মান। ওর অশান্ত, বল্গাহীন জীবনের মতো ওর মৃত্যুটাও বেপরোয়া, উদ্ধত। সত্তরের দশকে ইন্দ্রকে প্রায় হারাতে বসেছিলেন হেমছায়া। তিন বছর ঠিকমতো ঘুমতে পারেননি ইন্দ্রর চিন্তাভাবনায়। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতেন যদি ইন্দ্রর ছায়া দেখা যায়। কতদিন ঠিকমতো খায়নি ছেলেটা। কী সর্বনাশা নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে ইন্দ্র। কোথায় আছে, কী করছে ইন্দ্র কিছুই জানেন না হেমছায়া। ইন্দ্রর কত বন্ধুই মারা পড়েছে সি আর পি-র গুলিতে। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো গভীর রাতে ইন্দ্র বাড়িতে আসত। "মা, কিছু খাবার আছে?" তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করতে যান হেমছায়া। কেমন যেন কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ইন্দ্রর। জামাকাপড় নোংরা, ছেঁড়া। স্নান করে গভীর রাতে খুব তৃপ্তি করে খেত ইন্দ্র। যতক্ষণ ইন্দ্রর ঘুম না আসত হেমছায়া কাছে বসে থাকতেন। "কোথায় থাকিস ইন্দ্র। আর আমাকে কত কষ্ট দিবি?" "আমার জন্য চিন্তা কোরো না মা। তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়ো।" যতক্ষণ ইন্দ্রর ঘুম না আসত, হেমছায়া চুলে হাত বুলাতেন। ঘুম ভেঙে দেখেন ইন্দ্র পাশে নেই। সূর্য ওঠার আগেই মিলিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে সারা বাড়িটা ঘিরে রাখত সি আর পি। ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজত জিনিসপত্র। সবাই ভয়ে তটস্থ। আনন্দশেখরকে জেরা করত। কোথায় ইন্দ্র আছে। রাইফেল দেখিয়ে শাসাত। ইন্দ্রকে পেলে গুলি করে মেরে ফেলবে। হেমছায়ার বুকটা কেঁপে যেত ভয়ে। সেবার ভগবান ইন্দ্রকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এবার তো কোনও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না ইন্দ্রকে হারাবার। বহুদিন পরে ইন্দ্রর ভাল সময় আসছে এই ভেবে খুব খুশি ছিলেন হেমছায়া। হঠাৎ এ কী সর্বনাশ হল? কেন হল? প্রচণ্ড জোরে কেঁদে উঠলেন। গতকাল আসাম থেকে ফিরে সারারাত ঘুম হয়নি ইন্দ্রর। রাত তিনটে পর্যন্ত মা'র সঙ্গে গল্প হল। তার পর নিশার সঙ্গে। সকাল আটটায় ইন্দ্রর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায় হেমছায়ার। ইন্দ্র নিশাকে ডাকছে, "নিশা, আমাকে একটু বের হতে হবে। একটু চা বানাবে? তার সঙ্গে পরোটা?" নিশা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে যায়। কাজের মেয়েটা ভোর-ভোর এসে গেছে। হেমছায়া উঠে পড়েন বিছানা থেকে।

"কী রে ইন্দ্র? এত ভোরে উঠেছিস কেন? একটু বিশ্রাম নে কয়েকদিন। তার পর কাজে বেরোবি। বাড়াবাড়ি করিস না। কী চেহারা হয়েছে দেখেছিস?"

"সত্যি বলছি মা, আজকেই সকালে একটু কাজ। আমি একটু ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োটা ঘুরে আসব। বম্বে থেকে বিবেক এসেছে। ও আজকেই রাতের প্লেনে ফিরে যাবে। ওর সঙ্গে একটু দেখা হওয়া দরকার। আমি দুপুর বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। এ ছাড়া অশোক বিশ্বনাথনের নতুন ফিল্মে সুর দিতে হবে। অশোক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাব আর আসব। ফিরে এসে কবজি ডুবিয়ে মাংস খাব। তার পর ঘুমব। তোমরা ঘুমবে?"— হাসিখুশির ছড়ার মতো ইন্দ্র বলে ওঠে।

নিশা চা ও পরোটা নিয়ে আসে। খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে ইন্দ্র। হেমছায়া পাশে এসে বসেছেন। নিশাও বসে। ইন্দ্রর গল্পের নেশা পেয়ে বসেছে। অনেক কথা জমে

আছে ইন্দ্রর। খেতে খেতে বলল ইন্দ্র, "জান নিশা, আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। নচিকেতার মতো আমি যেন যমের মৃত্যুপুরী ঘুরে এসেছি। বাপিই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছে।"

পাশের খাটে ইন্দ্রর বড় ছেলে বাপি অঘোরে ঘুমচ্ছে। ইন্দ্র ঘুমন্ত ছেলেকে অনেক আদর করল।

"কী হয়েছিল তোমার?"

চোখে মুখে উদ্‌বেগের ছাপ নিশার।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চারমিনার ধরায় ইন্দ্র। আস্তে আস্তে জীবনমৃত্যুর অভিজ্ঞতা বলে ইন্দ্র:

"ঠিক ফেরার আগের দিন ডিফুতে আমার মাথাটা ঘুরে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। এ এক মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা। বই-এ পড়েছি যে অনেকেই মৃত্যুর আগে জীবনের সব ঘটনা পরপর দেখতে পায় ছবির মতো। একে বলে "নিয়ার ডেথ-এক্সপিরিয়েন্স।" আমারও ঠিক তাই হয়েছিল। জ্ঞান হারাবার পরেই মনে হল আমি এক স্বপ্ন দেখছি— কী স্পষ্ট, কী বাস্তব। যেন আমি একটা পুরনো অ্যালবাম বহুদিন পরে দেখছি। কত ঘটনাই ভুলে গিয়েছিলাম। কে যেন পরপর আমার জীবনের সব ছবি সাজিয়ে রেখেছে। স্বপ্ন শুরু হল সেই পরেশনাথ মন্দিরের কাছে শ্রীনাথ ভবনে। আমি তখনও হাঁটা শিখিনি। সবাই কোলে করে আমায় নিয়ে ঘুরছে। মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছে। হাতে আমার কাঠি আইসক্রিম। হঠাৎ দেখি বেলঘরিয়া কলোনিতে মাটির বাড়িতে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আমি আর ছোড়দা কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছি বারান্দা থেকে। চারিদিক জলে ভরে গেছে। আমি আমার ফেভারিট সিলকের নেভি সুটটা পরে। হঠাৎ দেখি বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝকমকিয়ে সূর্য— আমরা সেজেগুজে নেতাজির জন্মদিনে প্রভাতফেরীতে বের হয়েছি। সবাই মিলে সেই গানটা গাইছি—

"আজ জানুয়ারি তেইশে তব জন্মদিন স্মরণীয় হয়ে থাকে
চির অম্লান। চির আয়ুষ্মান চিরআয়ুষ্মান।"

"এরমধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছি। বেহালার মঞ্জুবীথির বাড়িতে পাড়ার সব বন্ধুদের নিয়ে মাঝের পুকুরটায় স্নান করছি। হঠাৎ একটা সাপ সাঁতার কাটছিল। আমি কপ করে সাপটাকে ধরে সবাইকে ভয় দেখাতে লাগলাম। সবাই ভয়ে জল থেকে উঠে পড়ল। আমি তখন সাপটাকে মহাদেবের মতো গলায় জড়িয়ে রাখলাম।" মা চিৎকার করছে জানলা থেকে— 'ইন্দ্র, একী পাগলামি করছিস? সাপটাকে ছেড়ে দে?'

হেমছায়া তন্ময় হয়ে শুনছে ইন্দ্রর আত্মকাহিনী।

"তার পর?" নিশা জিজ্ঞেস করে।

"গল্প শুনতে হলে ট্যাক্সো লাগবে। নিশা, আর-এক কাপ চা বানাতে বলো" এই বলে ইন্দ্র তার গল্পের খেই ধরে।

"হাঁপাচ্ছিস কেন ইন্দ্র?" হেমছায়া বলে ওঠেন।

"ও কিছু না, আমি একটু টায়ার্ড। তার পর শোনোই-না স্বপ্নের কথা।"

একটু দম নিয়ে ইন্দ্র আবার গল্প বলা শুরু করে।

"জান মা রডনিকে দেখলাম স্বপ্নে। ও যে মারা গেছে মনেই হল না। সেই সুন্দর চেহারা, সেই হাসি-হাসি মুখ। আমাদের বাড়িতে চা খাচ্ছে। আবার দেখি ওর সব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে খিদিরপুরে। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছি। আমাদের ব্যান্ড "আর্জ" পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁতে বাজাচ্ছে। আমার গায়ে রং-বেরঙের সিলকের জামা, মাথায় বড় বড় চুল। আমি জিমি হেনড্রিক্সের মতো গিটার বাজাচ্ছি, আর প্রাণ খুলে গান গাইছি ট্রিংকাতে। বাবা জোরে জোরে চণ্ডীপাঠ করছে। হঠাৎ দেখি কাকা— মানে অসীম চ্যাটার্জি আমার কাছে এসে বলছে— 'ইন্দ্র, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। বেকার ল্যাবরেটরির পেছনে দেখা করিস সন্ধে ৬ টার সময়।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দ্র আবার শুরু করে সেই স্বপ্নের কথা: "প্রচণ্ড অন্ধকার। কে যেন আমায় লাঠি দিয়ে ভীষণ জোরে মারছে। আমার হাতদুটো পেছনে বাঁধা। কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ একটা তীব্র আলো— দেখি বেহালা থানার সেই পাজিটা— রতন ঘোষ আমাদের সবাইকে বেধড়ক মারছে থানার মধ্যে। তার পর হঠাৎ দেখি দমদম জেলে। তুমি আর দাদা অনেক খাবার নিয়ে দেখা করতে এসেছ। সঙ্গে জেলার অনিন্দ্যবাবু। দাদা গিটারটা নিয়ে এসেছে। কিছুতেই ওরা অ্যালাউ করল না গিটারটা জেলের মধ্যে বহুদিন পরে আমি একটু গিটারটা টুংটাং করে ফিরিয়ে দিলাম দাদাকে।

"হঠাৎ দেখি আমি ভূপালে। টাই পরে চাকরি করছি "মে অ্যান্ড বেকারে" মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে। কলকাতার জন্য মন আনচান করছে। প্রবাসী জীবন আর ভাল লাগছে না। এর মধ্যে নিশার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। আমি কলকাতা ফিরে এসেছি। শুরু করেছি আমার নতুন ফিল্ম "শঙ্খিনী"। সুন্দরবনের আবাদে শ্রীলা মজুমদারকে বকাবকি করছি শুটিং-এর সময়।"

হেমছায়া বলে, "হ্যাঁরে ইন্দ্র, তুই স্বপ্নেও বকাবকি করিস? এত রাগ কেন তোর? একটু শান্ত হ।"

"শোনোই-না আমার অটোবায়োগ্রাফি। অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিযান। স্বপ্নের মধ্যে দেখি দিল্লিতে প্রেসিডেন্ট জৈল সিং-এর হাত থেকে রৌপ্যকমল নিচ্ছি শঙ্খিনী ছবির জন্য। হঠাৎ দেখি বাপিকে কোলে করে এই বাড়ির ছাদে ঘুরছি সন্ধেবেলা। নিশা যেন কোথায় বেরিয়েছে। বাপি কান্নাকাটি

করছে। জ্যোৎস্নার আলো চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বাপিকে বলছি—

'আয় চাঁদ আয়, সোনার কপালে টিপ দিয়ে যা।'

রেডিয়োতে কে যেন রবীন্দ্রসংগীত গাইছে—

'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব।'

খুব ভাল লাগছে গানটা শুনতে। ঠিক বউদি এইরকম করে গাইত দরদ দিয়ে। হঠাৎ বাপি জোরে জোরে কান্না শুরু করে দিল, 'বাবা বাবা, বাড়ি চলো বাড়ি চলো— মা'র কাছে যাব।'

কী বিরাট ঝাঁকুনি। বাপির ডাকে আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়। জ্ঞান ফিরে দেখি আমাকে একটা খাটে শুইয়ে দিয়েছে। সবাই চারিদিকে ঘিরে। বাদলবাবু বললেন— "ইন্দ্রবাবু, আমাদের কী ভয়টাই পাইয়ে দিয়েছিলেন শেষ দিন। আধঘন্টা আপনি সেন্সলেস ছিলেন। আপনি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা হাসপাতালে ফোন করেছি। আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি একটু চেক করার জন্য। যদি কোনও ওষুধ লাগে। অন্তত প্রেসারটা চেক করা দরকার। সামনে এতটা পথ। আমরা তো ভাবছিলাম ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স আসছে।"

ইন্দ্র নতুন কাপে চুমুক দিয়ে বলে, আমি বাদলবাবুকে বকে দিলাম। "দেখুন বাদলবাবু, আপনাদের সব-কিছুতেই বাড়াবাড়ি। আমার কিছুই হয়নি। কলকাতায় ফিরি, তার পর ডাক্তার দেখানো যাবে। ও-সব অ্যাম্বুলেন্সের ঝামেলা করবেন না।"

"তার পর তো প্লেনে করে সবাই পৌঁছে গেলাম কাল রাত্রিবেলা। এইটুকু জীবনে অত বেশি ভয় পেলে হয়?"

ইন্দ্র বলে, "জানো নিশা, বাপিই আমাকে মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরিয়ে আনল। ওরা বলছে আমি নাকি আধঘন্টা অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন কত বছর। বাপি যদি আমাকে এত জোরে ডাকাডাকি না করত, আমার এই পোড়া ঘুম হয়তো ভাঙত না।" এই বলে ঘুমন্ত বাপিকে আবার আদর করে। লম্বায়-চওড়ায় বাপিকে ইন্দ্রর চেয়ে বড় দেখায়। বাপি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

হেমছায়া স্তব্ধ। ইন্দ্র বলে, "যাই, এবার একটু ঘুরে আসি স্টুডিয়োটা।" উঠে পড়ে সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে।

নিশা বলে, "তোমাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। এখন বেরোচ্ছ কেন এই ভোরবেলা? দুটোদিন রেস্ট নাও। তার পর শুরু কোরো তোমার কাজ। দেখা

কোরো বন্ধুদের সঙ্গে। শুধু কাজ আর কাজ। নিজের দিকে কখনও নজর দিয়েছ? আয়নায় মুখ দেখো একবার। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ।"

ইন্দ্র উঠে আয়নায় মুখ দেখে। নিশাকে রাগাবার জন্য বলে ওঠে, "কী হ্যান্ডসাম দেখতে লোকটা। একে বলছ টায়ার্ড? কেমন যেন পাঞ্জাবি রক্ত বইছে আমার শরীরে। গুরু গোবিন্দের বংশধর।" এই বলে হাতের গুলিটা দেখায় নিশাকে। ইয়ার্কি করতে ইন্দ্রর জুড়ি নেই। হঠাৎ বাথরুম থেকে একটা গামছা নিয়ে এসে মাথায় পাগড়ি বেঁধে বলে ওঠে—

"সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ
যব গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউ"

ইন্দ্রর ভঙ্গি দেখে হেমছায়া হাসতে থাকেন। বলেন, "ইন্দ্র, তুই আর বড় হলি না।" হঠাৎ ইন্দ্র বলে, "আমার বাঁ হাতটা কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে। নিশ্চয়ই বেকায়দায় শুয়েছিলাম। যা হোক, কথায় কথায় বেলা হচ্ছে। আমি ঘুরে আসি।"

নিশা বলে, "লক্ষ্মীটি, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। সারারাত ঘুমোওনি। রান্না হলে আমি তোমায় ডেকে দেব। বিকেলে না হয় স্টুডিয়োতে যেয়ো। তোমার রেস্ট দরকার।"

হেমছায়া নিশার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন—

"ইন্দ্র, একটু বিশ্রাম কর। তার পর বের হবি। বাড়াবাড়ি করিস না। তেমন হলে বিবেক আর অশোককে ফোন করে দে। ওরা বিকেলে তোর সঙ্গে দেখা করে যাবে।"

ইন্দ্রকে বোঝায় কার সাধ্য। ও যখন ঠিক করেছে যাবে— ও যাবেই। কেউ ওকে ধরে রাখতে পারবে না।

নিশার কাছে এসে শম্ভু মিত্রের মতো গলাটা নকল করে আবৃত্তি করে ওঠে ইন্দ্র:

"অত চুপিচুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো, একি প্রণয়েরই ধরন।"

নিশা চেঁচিয়ে বলে, "কী সব আবোল তাবোল বকছ?"

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলে—"ঠাট্টাও বোঝো না নিশা। মরতে চাইলেই কি আর মরতে পারা যায়। মরা খুব কঠিন ব্যাপার। বেঁচে থাকাটা সোজা। ভাগ্যবানরা তাড়াতাড়ি মরে কাউকে কষ্ট না দিয়ে।"

ইন্দ্রর মৃত্যুর ওপর একটা অদ্ভুত রোমান্স ছিল। বাউলদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ফারাক খুব কমই দেখত।

একদিন ও পরের ভাই ঈশানকে বলেছিল—

"ঈশান, আমি যদি মরে যাই, আমাকে মাটির ভেতর গর্ত করে বসিয়ে দিবি। বাউলদের যেমন করে। সঙ্গে দিবি আমার গিটার আর কিছু চারমিনারের প্যাকেট। হিন্দুদের ডেডবডি পাওয়া মুশকিল। সব পুড়িয়ে দেয়। নিয়ান্ডারথাল বেরিয়াল সাইটের মতো আমার কঙ্কাল ভবিষ্যৎ অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের কাছে গবেষণার বিষয় হবে। ভেবে দ্যাখ কী দারুণ ব্যাপার। মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে আমার কঙ্কাল বের করছে পঞ্চাশ হাজার বছর পরে। হয়তো এক সুন্দরী ফরাসি মেয়ে পিএইচ ডি করছে আমার কঙ্কালের ওপর। বাঁ হাতের ইন্টার-ফ্যালেনজিয়াল জয়েন্ট থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে আমি গিটারিস্ট।"

হাতের ঘড়ি দেখল ইন্দ্র। দশটা বেজে গেছে।

"মা উঠি, স্টুডিয়োটা চট করে ঘুরে আসি। টা টা নিশা।"

রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। ইন্দ্র উঠে পড়ে ট্যাক্সিটায়।

হেমছায়া শক্ত করে ধরে আছেন ইন্দ্রকে। পরপর ঘটনাগুলো সাজাতে চেষ্টা করছেন। প্রতি মুহূর্ত এখন দামি। আর তো দেখতে পাবেন না ইন্দ্রকে। ভাবছেন নিজের মনে মনে। ইন্দ্র কি খুব কষ্ট পেয়েছিল মৃত্যুর আগে? খুব কি যন্ত্রণা ছিল ওর বুকে? নাকি চিরকালের বাউন্ডুলে মৃত্যুকে পরোয়া না করে হাসতে হাসতে চলে গেল। সত্যি কি ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিল মৃত্যু এত কাছে দাঁড়িয়ে। না হলে রবিঠাকুরের লাইনদুটো আবৃত্তি করবে কেন? সব-কিছু নিয়েই ইন্দ্রর ঠাট্টা, তামাশা। কেন তিনি ইন্দ্রকে ধরে রাখলেন না। ইন্দ্র আর নেই এই ভেবে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বুকভরা আর্তনাদ। হেমছায়ার কান্না দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সবাই কেঁদে উঠল। চোখের জলে, বরফের জলে ইন্দ্রর ঘরটা সিক্ত হয়ে গেছে।

অঝোরে কাঁদছে ইন্দ্রর ছোট মেয়ে তুলি।

"বাবা কেন কথা বলছে না ঠামা?"

হেমছায়া কী বলে সান্ত্বনা দেবেন তুলিকে? আদর করে তুলে নিলেন নাতনিকে। দশ বছরের মেয়ে তুলি। কী অপূর্ব পিয়ানো বাজায়। প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী। বাবার মতোই জন্তুজানোয়ারের ওপর আকর্ষণ। পাড়ার যত কুকুর বেড়াল ওর বন্ধু। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন হেমছায়া। ঘর ভর্তি লোক। সারা রাস্তা জুড়ে লোক। সারা শহরটা যেন ভেঙে পড়েছে ইন্দ্রকে দেখতে। খাসখবর আর দূরদর্শনের মাধ্যমে ইন্দ্রর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে যায় তাড়াতাড়ি। বার বার টেলিভিশনে বলছে—"একান্ন বছরের চলচ্চিত্রকার, রাষ্ট্রপতির জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী, বিদ্রোহী বাউল, অশ্বমেধের স্রষ্টা গায়ক, সংগীত-পরিচালক ইন্দ্রজিৎ

চট্টোপাধ্যায় হঠাৎই হার্টফেল করে মারা গেছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে।" ওর গান শোনানো হচ্ছে বার বার, ওর ছবি দেখানো হচ্ছে মাঝে মাঝে।

ইন্দ্রর পায়ের কাছে পাথরের প্রতিমা হয়ে আছে ইন্দ্রর বউ নিশা। কী বলে ওকে সান্ত্বনা দেবেন হেমছায়া? নিশাও তো কম চেষ্টা করেনি যাতে ইন্দ্র বাড়ি থেকে এই অবেলায় না বের হয়। নিশার পাশে বসে আছে ইন্দ্রর বড় ছেলে বাপি। টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে ওর চোখ দিয়ে। হেমছায়া ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবেন সামনে আরও কঠিন দিন আসছে। স্বামীহারা, পিতৃহারাদের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। নিজেকে অনেক শক্ত হতে হবে। সারাজীবন পড়ে রয়েছে তুলি ও বাপির। ওরা আর বাবা বলে ডাকবে না কাউকে। সংসারটা কেমন যেন ছিন্নভিন্ন, তছনছ হয়ে গেল। তিনঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। কেঁদে ওঠেন হেমছায়া—

"ইন্দ্র রে, আমাদের ফেলে যেতে তোর কোনও কষ্ট হল না?"

ঘরের এককোণে বিবেক মাথা নিচু করে কাঁদছে। বিবেক ইন্দ্রর ফোটোগ্রাফার ছিল। অসম্ভব ভাল ছবি তুলেছিল ইন্দ্রর "শঙ্খিনী" আর "মহাকালে"। বিবেক এখন চলে গেছে বম্বের স্টুডিয়োতে। ইন্দ্র কলকাতা ফিরেছে শুনে বিবেকই ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। ইন্দ্রই বলল ইন্দ্রপুরীর কথা। কত সময় কেটেছে দু' বন্ধুর এই স্টুডিয়ো ফ্লোরে। চা খেতে খেতে ইন্দ্র ওর নতুন ছবি রংবিন নিয়ে গল্প করছিল বিবেকের সঙ্গে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে। ইন্দ্রর সেই চিরাচরিত ঠাট্টা, ইয়ার্কি। বিবেকের হাতে দুটো আংটি দেখে ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলে— "বিবেক, এবার সত্যিই তুই বড়লোক হলি। 'মাছটা কত মাছটা কত— চোদ্দো আনা চোদ্দো আনা।' তোর হাত নাড়ার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি।" দু' বন্ধু আগের দিনের মতোই জোরে জোরে হাসতে থাকে। হঠাৎ আচমকা দম বন্ধ হয়ে যায় ইন্দ্রর। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বিবেক আর অশোক সঙ্গে সঙ্গেই কাছের হাসপাতালে নিয়ে যায় গাড়ি করে। ততক্ষণে ইন্দ্রর জীবনদীপ চিরকালের জন্য নিভে গেছে। সব-কিছু এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল দেখে বিবেক হতভম্ব, শোকে মূহ্যমান, নিজেকে অপরাধী ভাবছে। কী করে মাসিমাকে সান্ত্বনা দেবে? নিশাকে কী বলবে? বিবেকই শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ইন্দ্রকে দেখেছিল।

বিবেক আর অশোক হাসপাতাল থেকে নাকতলার বাড়িতে নিয়ে এল ইন্দ্রর শবদেহ। হেমছায়া চমকে উঠলেন পরপর দুটো গাড়ি থামতে দেখে। সবাই যেন ফিসফিস করে কী বলছে। আস্তে আস্তে স্টুডিয়োর লোকেরা ইন্দ্রকে ধরাধরি করে ঘরের মাঝখানে শুইয়ে দিল। নিশা ছুটে আসে। "কী হয়েছে ওর?" ওর কপালে হাত রাখে নিশা। হেমছায়া ইন্দ্রর পাশে এসে বসেন। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে। ইন্দ্র ভাল আছে তো? বিবেকের দিকে তাকিয়ে বলে—"জান বিবেক, ছেলেটা সারারাত ঘুমোয়নি। আমাদের সঙ্গে গল্প করেছে।" ইন্দ্রর হাতটা

তুললেন। শক্ত, অসার। আছড়ে পড়ে শুনতে চেষ্টা করলেন ইন্দ্রর বুকের ধুকপুকিটা। কোনও শব্দ নেই। থরথর করে কেঁপে উঠলেন। চিৎকার করে উঠলেন, "বিবেক, কী হয়েছে ইন্দ্রর, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

কান্নায় ভেঙে পড়ে বিবেক—"মাসিমা, ইন্দ্র আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।"

সেই থেকে শক্ত করে ইন্দ্রকে আঁকড়ে ধরে আছেন হেমছায়া। আর কোথাও যেতে দেবেন না। বলা নেই, কওয়া নেই, ইন্দ্র উধাও বাড়ি থেকে। কতবার হয়েছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ইন্দ্রকে নিয়ে হেমছায়ার আর চিন্তার শেষ নেই।

প্রচণ্ড জোরে হেমছায়া আর্তনাদ করে ওঠেন—

"ইন্দ্র রে, কেন আমাদের ফেলে গেলি।"

পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢোকে ইন্দ্রর পরের ভাই ঈশান। ঈশান ইঞ্জিনিয়ার। ইন্দ্রর ছায়ায় বড় হয়েছে। একসঙ্গে গান করেছে ইন্দ্রর অশ্বমেধ ব্যান্ডে। ইন্দ্র আসাম থেকে ফিরবে শুনে জামশেদপুর থেকে এইমাত্র ফিরেছে ঈশান গল্প করার জন্য। এসে দেখে মণিদাকে বরফের স্ল্যাবে শুইয়ে দিয়েছে। ঘরভর্তি লোক। আছড়ে পড়ে মণিদার বুকের ওপর। "একী হল মা, মণিদার কী হয়েছে? মণিদা কি নেই?" প্রচণ্ড চিৎকার করে ঈশান কাঁদতে থাকে।

ঈশানকে কাঁদতে দেখে হেমছায়ার মনে হল নিজেকে শক্ত হতে হবে। নিশার কথা ভেবে, তুলি ও বাপির কথা ভেবে। ওদের এখন দেখবে কে? যতদিন পারেন, হেমছায়া ওদের আগলে রাখবেন। ওঁর তিন ছেলে এখন আমেরিকায়। ঈশানও বহুবছর লিবিয়ায় ছিল এম এন দস্তুরের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। কলকাতায় ফিরেই ঈশান বদলি হয়ে যায় জামশেদপুরে। সপ্তাহে একবার ঘুরে যায় নাকতলার বাড়িতে মণিদার সঙ্গে গল্প করার জন্য, মাকে দেখার জন্য। ঈশানের বউ, ছেলেমেয়ে কাছেই থাকে। গঙ্গার ওপারে নেতাজি নগরে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য ওদের আর জামশেদপুরে নিয়ে যায়নি ঈশান। হেমছায়ার বড় মেয়ে কেয়াকে খবর দেওয়া হয়েছে ভবানীপুরে। ছোট মেয়ে খেয়া থাকে শিলিগুড়ি। হেমছায়া বাস্তবজগতে ফিরে এলেন। ওঁর তিন ছেলে— অনির্বাণ, আকাশ আর উৎসব এখন আমেরিকায়। প্রবাসী ছেলেদের খবর দেওয়া দরকার এই মুহূর্তে। বড় ছেলে অনি ছিল ইন্দ্রর আদর্শ। অনিকে নিয়ে ইন্দ্রর খুব গর্ব ছিল। কান্না জড়ানো গলায় বলে ওঠেন হেমছায়া—"ঈশান, দাদাকে একটা ফোন করে ইন্দ্রর কথা জানিয়ে দে। আর খেয়াকেও একটা ফোন করিস শিলিগুড়িতে।"

বড় মেয়ে কেয়া ও জামাই সন্দীপ ইন্দ্রর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে কেয়া বলে—"মা, দীপুকে আমি ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি

চেন্নাইতে ইন্দ্রর মৃত্যুর খবর। ও বলেছে মণিমামাকে আমি একটিবার দেখতে চাই। আমি না আসা পর্যন্ত ওর ডেডবডি শ্মশানে নিয়ে যেয়ো না।"

দীপুকে ছোটবেলা থেকে নিজের হাতে গীটার শিখিয়েছে ইন্দ্র। দীপু দিনের পর দিন মামারবাড়িতে সময় কাটিয়েছে। ইন্দ্র শুধু মণিমামাই নয়— ইন্দ্র ছিল ওর সুরের গুরু, দীক্ষাগুরু। মনপ্রাণ ঢেলে ইন্দ্র দীপুকে শিখিয়েছিল গীটার। ইন্দ্রর ঘরানায় দীপুই ছিল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ইন্দ্রর কাছে হাতেখড়ি হয়েছে অন্যান্য ভাইদের— বিশেষ করে ঈশান ও উৎসব ছিল ইন্দ্রের অনুগামী গানবাজনায়— ইন্দ্রের অশ্বমেধ ব্যান্ডে দুজনেই ছিল শিল্পী। কিন্তু দীপুর ব্যাপার আলাদা। সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে ইন্দ্রর কাছে দীপুর হাতেখড়ি। দীপু তার সার্থক সৃষ্টি। শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্দ্রর মেজাজ ছিল খুব কড়া, ওস্তাদ আলাউদ্দিনের মতো। একটু-আধটু ভুল হলে কারও নিস্তার ছিল না। সেই ফিল্মের লাইনই হোক— নাটকেই হোক, অথবা গানবাজনায় হোক। সুরের একটু ভুলের জন্য কম বকুনি খায়নি দীপু ইন্দ্রর কাছ থেকে। ছোট ভাগ্নে বলে কোনও খাতির ছিল না। ইন্দ্রর "অশ্বমেধ" ব্যান্ডে, ফিল্মে, খুব ছোট থেকে দীপু বাজিয়েছে। ইন্দ্র সেই সময় দীপুকে দেখত সহকর্মী হিসেবে। ছোট ভাগ্নে বলে কোনও খাতির ছিল না। দীপুদের ব্যান্ড "সাউথ উইন্ড" এখন কলকাতা শহরের সবচেয়ে বেশি পপুলার। নামী গ্রুপ।

ইন্দ্রর ছেলে বাপিরও গিটারের হাতেখড়ি বাবার কাছে। প্রথমে ড্রাম, পারকাশন, তার পর গিটার, তার পর গান। ষোলো বছরের বাপির এখন নিজেদের ব্যান্ড "সৃষ্টিছাড়া"। কলকাতা শহরে সৃষ্টিছাড়া যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। প্রায়ই ওরা টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করে। ইন্দ্রর ধারণা "সৃষ্টিছাড়া"র নবীন শিল্পীরা সবাই খুব ট্যালেন্টেড। ওরা পুরনো দিনের অশ্বমেধের গান গায়-- নিজেরা গান বানায়, গীটার আর পারকাশনে ওদের জুড়ি নেই। নতুন প্রজন্মের শিল্পী দেখে ইন্দ্র খুবই খুশি।

হেমছায়া ভিড়ের দিকে আবার তাকান। কত লোক জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছু আছে বাউল ও দরবেশ। ইন্দ্রর সঙ্গে ওদের যোগ ছিল আত্মিক। এদের সহজিয়া সুর ও মরমিয়া জীবনকথা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল ইন্দ্রকে। চার দেয়ালের মাঝে ইন্দ্র কোনওদিনই আটকে পড়েনি। উদার আকাশ, খোলা মাঠ, গাছগাছালি, পাখির গান, সমুদ্রের ঢেউ, পাহাড়ের চুড়ো, সবই ছিল ইন্দ্রের খুব প্রিয়। গ্রামে, গঞ্জে, মেলায় বাউল ফকিরদের সঙ্গে ইন্দ্র গলা মিলিয়ে গান গেয়েছে। কেন্দুলী জয়দেবের মেলায় রাত কাটিয়েছে কতবার। কতবার এইসব মেলায় গান গেয়েছে গুব্‌কি আর একতারা নিয়ে। গাঁজা খেয়েছে মাটির কল্কেতে। গান গেয়েছে লালন ফকির আর পাগলা ভবার গান। এইসব বাউলেরা এসেছে ইন্দ্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

কতলোক দেখতে এসেছে নামী-দামী থেকে সাধারণ, অতি সাধারণ। সবার সঙ্গেই ইন্দ্র মিশতে পারত মন খুলে। ভিড়ের মধ্যে আছে টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর তরুণ শিল্পীরা— পরিচালক, নায়ক-নায়িকা, শব্দযন্ত্রী, ক্যামেরাম্যান ইন্দ্রকে দেখতে এসেছে দুঃসংবাদ পেয়ে। এসেছে পুরনো দিনের উত্তাল রাজনীতির কিছু কমরেড। এসেছে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। এসেছে সাংবাদিক, টেলিভিশনের লোক। এসেছে অসংখ্য গুণগ্রাহী আর ভক্তের দল। কোনও চাওয়া-পাওয়া হিসেবের জন্য ওরা আজ ইন্দ্রকে দেখতে আসেনি। এসেছে ইন্দ্রকে শেষ দেখা দেখতে। বাংলার গানকে ইন্দ্র নিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে। এ এক অস্বাভাবিক কৃতিত্ব ইন্দ্রর। এখন পাড়ায় পাড়ায় নতুন প্রজন্মের ছেলেরা গান লেখে, সুর দেয়, গান গায়। গিটার বাজায়। এ-সব দেখে ইন্দ্র খুব খুশি। ভগীরথের মতো ইন্দ্র এনেছে নতুন গানগঙ্গার জোয়ার এই বাংলার মাটিতে। এইসব শিষ্যেরা, গুণমুগ্ধরা এসেছে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ইন্দ্রকে।

রাত আটটার মধ্যে দীপু ঝড়ের মতো ঢুকল। আছড়ে পড়ল ইন্দ্রের শরীরে। “মণিমামা, এটা কী হল? তুমি বিশ্বাসঘাতক, কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে? ভীষণ জোরে কাঁদছে দীপু। তাই দেখে সবার চোখে জল। ঈশান আর থাকতে পারছে না দীপুর কান্না দেখে।

ঈশান দেয়াল থেকে সাগরবাঁশিটা তুলে নিল। ঈশান অশ্বমেধ ব্যান্ডের শুরু থেকে ইন্দ্রর সঙ্গে দিল। ঈশানের সঙ্গে ছিল ওর বড় পিসির ছেলে রঙ্গন। রঙ্গনের ছিল বাংলাভাষার ওপর অদ্ভুত দখল। রঙ্গন বেশ-কিছু গান লিখেছিল অশ্বমেধের ব্যান্ডের জন্য। ঈশান ছিল ইন্দ্রর অনুগামী। ওর ভারী বেসের গলা ইন্দ্রর ভাল লাগত। কিন্তু ঈশান মাঝেমাঝে পাগলামি করত চিৎকার করে বা সুফিদের মতো নেচে নেচে। ইন্দ্র তখন থামিয়ে দিত ঈশানকে— “ঈশান, তোর মাত্রাজ্ঞান কম। কোথায় থামতে হবে তুই জানিস না। সবসময় একটা গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়।” ঈশান বাজাত বাঁশি। ঈশান বাজাত গীটার। ঈশান গাইত গান “অশ্বমেধে”। সাগরবাঁশিটা তুলে চোখ বন্ধ করে ঈশান বাজাল মণিদাকে শ্রদ্ধা জানাতে। সমস্ত ঘর চুপচাপ। চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হয় সমুদ্রের জল ভেঙে পড়েছে তীরের দিকে। ঈশানের দু’চোখ বেয়ে জলের ধারা।

ঈশানের পর দীপু গীটার নিয়ে বসল। মনপ্রাণ দিয়ে, ভালবাসা নিংড়ে দীপু বাজাল মণিমামার স্মৃতিতে। ফ্লেমিঙ্কোর সুরে সবাই যেন কোন মায়ালোকে পৌঁছে গেছে। সবাই চোখ বন্ধ করে হৃদয় দিয়ে শুনছে। ভেতরে বাঁধভাঙা দুঃখ। ধূপের ধোঁয়া, মোমবাতির আলো, দীপুর প্রাণের অর্ঘ্য। ফুলে ঢাকা ইন্দ্র। বরফের বিছানায় শোয়া ইন্দ্র, চোখের জল, অভিমান— সব মিলিয়ে যেন এক অবাস্তব ঘুমঘোর দেশে পৌঁছে গেছে সবাই।

অনেক পরে কে যেন গেয়ে উঠল অশ্বমেধের গান, "ফিরে আসব মা, কেঁদো না।" আস্তে আস্তে সবাই গলা মিলিয়ে গাইছে। গানে গানে সারা বাড়িটা গমগম করছে।

গানের শেষে হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "অনেক রাত হল। এবার কিন্তু ইন্দ্রকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।" আস্তে আস্তে সবাই উঠে পড়ল।

"দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।" সাদা লিমোজিনটা দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। এবার ইন্দ্রর যাবার পালা। হেমছায়া শেষবারের মতো আদর করল ইন্দ্রকে। ধরাধরি করে ইন্দ্রর মরদেহ রাখা হল লিমোজিনটায়। কাচের ভেতর থেকে সবাই দেখছে ইন্দ্রকে। কী শান্তিতেই ঘুমিয়ে আছে। ওর ঘুমের ভীষণ দরকার ছিল। লিমোজিনের সামনের সিটে বসে আছে তুলি ও নিশা। আস্তে আস্তে গাড়ি চলছে। পেছনে শত শত লোক চলছে পায়ে হেঁটে। শ্মশানের দিকে। ভিড়ের মধ্যে কে যেন ভারী গলায় আবৃত্তি করছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। প্রণবদা— প্রণব মজুমদার। অনির বন্ধু ও আর্টিস্ট। খুব ভালবাসত ইন্দ্রকে। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। প্রণব আবৃত্তি করছে উদাত্ত গলায়—

"যাব বলে
সেই কোন সকালে বেরিয়েছি
উঠতে উঠতে সন্ধে হল।
রাস্তায়
আর কেন আমায় দাঁড় করাও?

ফুলগুলি সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল জমতে জমতে পাথর

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।"

গড়িয়ার কাছে শ্মশান। বেশি দূরে নয়। ছ' মাস আগে ওদের পিসিমাকে ইন্দ্র নিয়ে গিয়েছিল এই শ্মশানে। পিসিমা ওদের আত্মীয় নন কিন্তু আত্মীয়ের চেয়ে বড় ছিল তাঁর হৃদয়। ছোটবেলা থেকে পিসিমা ছিলেন ওদের বাড়ির একজন। চল্লিশ বছরের বেশি পিসিমা ছিলেন হেমছায়ার কাছে। স্নেহ মমতা দিয়ে হেমছায়ার

সন্তানদের নিজের মতো করেই বড় করেছেন পিসিমা। হেমছায়া নিশ্চিন্ত ছিলেন সংসারের সব দায়-দায়িত্ব পিসিমার হাতে ছেড়ে দিয়ে। দোকান, বাজার, রেশন, রান্না— সব ব্যাপারেই পিসিমা ছিলেন সর্বেসর্বা। ঈশান আর খেয়ার ওপর পিসিমার একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। এ নিয়ে হেমছায়া হাসাহাসি করতেন। সুন্দর চেহারা ছিল পিসিমার— ফোটোজেনিক মুখ। টিকলো নাক, আঁটোসাঁটো শরীর ছিল পিসিমার। এই বালবিধবা হেমছায়ার সংসারে ঢুকেছিল দেশবিভাগের পরেই। শিয়ালদা স্টেশন থেকে হাজার হাজার বাস্তুহারাদের মাঝে খুঁজে পেয়েছিল অনি আর আনন্দশেখর। তার পর থেকে পিসিমা বাড়ির একজন লোক হয়ে গেল। শেষ বছর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে পিসিমা। অসুখ যখন ধরা পড়ল, সারা শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে গেছে। ইন্দ্র পিসিমাকে নিয়ে গিয়েছিল গড়িয়ার এই নতুন শ্মশানে। আজ ঈশানের ভার পড়েছে ইন্দ্রকে সেইখানে নিয়ে যাবার। দলে দলে লোক চলছে শ্মশানের দিকে। কেউ হেঁটে, কেউ গাড়িতে, কেউ ট্যাক্সিতে, কেউ অটোতে, "ইন্দ্রকে এত লোক ভালবাসত?" ঈশান তাকায় শোকমিছিলের দিকে। "মণিদা, চলে গেলি। তোকে শেষ দেখার জন্য কত লোক এসেছে তাকিয়ে দ্যাখ একবার।" জোরে জোরে চিৎকার করে ঈশান।

বেশ ছিমছাম পরিবেশ এই ছোট্ট শ্মশানের। এখানে ভিড় নেই। মৃতদেহ নিয়ে লাইন নেই। ইন্দ্রর মরদেহ রাখা হল ইলেকট্রিক চুল্লির কাছে। চারপাশে ইন্দ্রকে ঘিরে এক এক করে গান গাইছে। গানপাগল ছিল ইন্দ্র। এরা গাইছে ইন্দ্রর গান, অশ্বমেধের গান, পূজার গান, মীরার ভজন, উপনিষদের গান। মনের অর্ঘ্য, প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে গাইছে সবাই। গাইছে দেবজ্যোতি, দেব চৌধুরী, পরমা, স্বপ্নাভ-সায়ন্তনী, রূপম, শুভায়ন, রঞ্জনপ্রসাদ ও অনিন্দ্য—

'যে গেছে বনমাঝে চৈত্র বিকেলে
যে গেছে ছায়াপ্রাণ বনবীথিতলে
বন জানে অভিমানে গেছে সে
অবহেলে যে গেছে অশ্রুময়
বন অন্তরালে

আকাশে কেঁপেছে বাঁশিসুর
আঁচলে উড়েছে ময়ূর
চলে যাই বলেছিলে চলে যাই
মহুল তরুর বাহু ছুঁয়ে
যে গেছে অশ্রুময় বন অন্তরালে
সে বুঝি শুয়ে আছে চৈত্রের
হলুদ বিকেলে যেখানে

চূর্ণ ফুল ঝরে তার আঁচলে
যেখানে চূর্ণ ফুল ঝরে তার
কাফনে'

আস্তে আস্তে ইলেকট্রিক চুল্লির দরজাটা খুলে গেল। এবার সত্যিকারের ইন্দ্রর যাবার পালা। ওর স্মৃতি, ওর গান, ওর ফিল্ম, ওর সাহচর্য, ওর বন্ধুত্ব, ওর অনুপ্রেরণা, ওর মানবিকতা পড়ে রইল সবার মাঝে। কিন্তু সেই হাসি, সেই কথা, সেই গান হারিয়ে গেল চিরকালের জন্য।

গনগনে লাল আগুনের চিরশান্ত বিছানা টেনে নিল ইন্দ্রকে। ঈশান ধ্যানে বসে গভীর ঘোরে গাইছে উপনিষদের গান—

'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধী...'

ঈশানের মনে হল মণিদার শরীরটা আগুনে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শ্মশানের একজন লোক একটা মাটির পাত্রে ইন্দ্রর ছাই এনে দিল। ঈশান ভাবতে পারছে না এই তরতাজা মণিদা পুড়ে ছাই হয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আর কোনওদিন দেখবে না মণিদাকে। মনের মানুষটা চিরকালের জন্য চলে গেছে। ঈশানের আর পরামর্শ নেবার মতো কেউ রইল না। বিদায় মণিদা।

আস্তে আস্তে ঈশান উঠে দাঁড়ায়। বাপিকে জড়িয়ে ধরে—"চল, তোর বাবাকে দূরদেশে ভাসিয়ে আসি।"

শ্মশানের কাছেই এক কুণ্ড। লোকে বলে আদিগঙ্গার সঙ্গে এই কুণ্ডের নাকি যোগাযোগ আছে। পুকুরপানা সরিয়ে ঈশান মাটির পাত্র ভাসিয়ে দেয় জলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—

"পিসিমা, তোমার কাছে দিলাম মণিদাকে। ভাল করে দেখো। ওর যেন কষ্ট না হয়।"

৪

প্লেনের ভেতরটা অন্ধকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বোয়িং ইঞ্জিনের একটা চাপা, গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছে— ঘুম পাড়ানি গানের মতো। অনি শুয়ে শুয়ে ভাবছে ওর বাবার কথা— আনন্দশেখরের কথা। ইন্দ্রর সঙ্গে আনন্দশেখরের খুব মিল ছিল। দু'জনেই গানবাজনায় পারদর্শী— দু'জনেই লোকজন নিয়ে হইচই করতে ভালবাসত। অনির মন চলে যায় অবিভক্ত পূর্ববাংলার বরিশালে— শিকারপুর গ্রামে। খুব ছোটবেলায় একবার পুজোর সময় বেড়াতে গিয়েছিল অনি

ওদের পৈতৃক বাড়িতে। অনির তখন বছর দুয়েক বয়েস। আবছা আবছা মনে পড়ে। বিরাট দীঘির সামনে ডাকের সাজের মা দুর্গার ভাসান হচ্ছে। ঢাকের বাজনা বাজছে। অনি কারও কোলে চড়ে মা দুর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে সবাই প্রতিমা বিসর্জন দিল দীঘির কালো জলে। সবাই জল ছিটিয়ে দিচ্ছে— দীঘির জল। সেই থেকে বিসর্জনের বাজনা শুনলে অনির খুব কষ্ট হত।

আনন্দশেখর কলকাতায় মেসে থাকেন বড় ভাই যতিশেখরের সঙ্গে। পূর্ববাংলার সঙ্গে নাড়ির টান থাকলেও দু'ভাই কলকাতায় পড়াশুনো করতেন। তিরিশের দশক। পরাধীন ভারতবর্ষ। ছুটি পেলেই দু'ভাই চলে যান শিকারপুর গ্রামে। বাবা বিধুশেখর স্টিমার কোম্পানিতে কেরানির কাজ করেন। আয় সামান্যই। নদী নালা, খাল বিল পেরিয়ে যেতে হয় শিকারপুর গ্রামে। 'আইতে শাল যাইতে শাল যার নাম বরিশাল।' বরিশালে নদী নালা এত বেশি যে রেল সংযোগ নেই। যেতে আসতে অনেক সময় লাগে। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে যতিশেখর ও আনন্দশেখরের বিজ্ঞানের হাতে-খড়ি। এই ব্রজমোহন কলেজকে বলা হত 'অক্সফোর্ড অব বেঙ্গল'। তার পর দু'ভাই কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক— যতিশেখর অঙ্কের, আনন্দশেখর কেমিস্ট্রির ছাত্র।

বিধুশেখরের শিকারপুর গ্রামে কয়েক বিঘা জমির ওপর ঘর বাড়ি, ধানক্ষেত, পুকুর ভরা মাছ, ঘরের প্রতিষ্ঠিত মনসামন্দির। পুরনো দিনের বড় পাকা বাড়ি। কিন্তু প্রাণ নেই, টান নেই সেই বাড়িতে। অল্প বয়সে মাতৃহারা যতি ও আনন্দ। বিধুশেখর কাজের জন্য বাইরে বাইরে থাকেন। বাড়ি প্রায় ফাঁকাই থাকে। দীঘির পাশেই এক তুলসীমঞ্চ। সেখানে ওদের মাকে দাহ করা হয় বহু বছর আগে। আনন্দশেখরের আবছা আবছা মাকে মনে পড়ে। দোহারা চেহারা, লম্বা চুল, সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল। আনন্দশেখর এখনও জানেন না তাঁর মা কাদম্বরী আগুনে পুড়ে কেন আত্মঘাতী হলেন। মা'র ওপর প্রচণ্ড অভিমান আনন্দশেখরের। মা কোনওদিনই জানলেন না দুই ছেলের বিজ্ঞানে সাফল্যের কথা।

আনন্দশেখরের ছোটবেলার স্মৃতি সুখের নয়। মা'র মৃত্যুর পর বিধুশেখর বিবাগী হয়ে হিমালয়ে চলে যান। গ্রামের এক চিরকুমার পুরোহিত ভার নিয়েছেন এই মাতৃহারা শিশুদের বড় করার। ছোটবেলার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত যতিশেখর আর আনন্দশেখর। দূর সম্পর্কের এক মামিমা দু'বেলা রান্না করেন। পুরুত জ্যাঠামশাই ওদের চোখে চোখে রাখেন। বাবা কোথায় হারিয়ে গেছেন। কতদিন তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালাবার সময় চোখের জল ফেলেছেন আনন্দশেখর মা'র জন্য। গ্রামের সবাই ভালবাসত যতিশেখর ও আনন্দশেখরকে। জ্যাঠামশাই ওদের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আনন্দশেখর জ্যাঠামশাইয়ের ঋণ ভুলতে পারেননি। এই জ্যাঠামশাই জীবনের শেষদিকে কলকাতায় আনন্দশেখরের কাছে ছিলেন বহু বছর ধরে।

বিধুশেখর হিমালয়ের এক আশ্রমে গম্ভীরানন্দের শিষ্য হয়েছিলেন। ভুলে যেতে চান তাঁর পুরনো জীবনের ঘটনা, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু। মাঝে মনে পড়ে ছেলে দুটোর কথা। ওরা কত বড় হল কে জানে? সাত বছর পরে একদিন স্বামী গম্ভীরানন্দ বিধুশেখরকে ডেকে বললেন, "তোর এখন বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। নতুন করে বিয়ে করে সংসারী হ। ছেলেদুটোকে মানুষ কর। বৈরাগীর জীবন তোর নয়। তুই সংসারী, সংসারে সবার মধ্যে ফিরে যা।"

বিধুশেখর ফিরে এলেন শিকারপুর গ্রামে মনের শান্তি নিয়ে। হঠাৎ চিনতে পারেননি নিজের দুই সন্তানকে— মাঠে খালি গায়ে খেলা করছে। আনন্দ আর যতি কৈশোরে পা দিয়েছে। গ্রামের লোকেরাই জোর করে বিয়ে দিল বিধুশেখরের সঙ্গে অল্পবয়সি একটা মেয়ের— যতিশেখরের চেয়ে সামান্যই বড় তার নতুন মা মানদাসুন্দরী। লোকজন, আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে ওদের ফাঁকা বাড়িটা আবার গমগম করে উঠল। পরপর অনেক বোন আর ভাইয়ের জন্ম হল। বিধুশেখর জড়িয়ে পড়েছেন সংসারে। এখন বিরাট দায়িত্ব। স্টিমার কোম্পানিতে চাকরি করেন এত বড় সংসার চালাবার জন্য। যতিশেখর অঙ্কে তুখোর। ঈশান স্কলার। অঙ্কে বরাবরই একশোতে একশো পেয়েছেন। সবার আশা যতিশেখরকে নিয়ে। এম এস্‌সি পরীক্ষার ফাইনালের ঠিক আগে যতিশেখর প্রচণ্ড অসুখে পড়লেন। জীবন-মরণ সমস্যা। শয্যাশায়ী ছিলেন মাস দুয়েক। সে বছর আর পরীক্ষা দেওয়া হল না যতিশেখরের। একটা বছর নষ্ট। মেট্রোপলিটান লাইফ ইনসিওরেন্সের একটা চাকরি পেলেন যতিশেখর। য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখলেন না। জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই অফিসেই যতিশেখর কাটিয়েছেন সামান্য মাইনেতে। এ ছাড়া টুইশনি করতেন সংসার চালাবার জন্য। য়ুনিভার্সিটির একজন মেধাবী ছাত্র কোথায় হারিয়ে গেলেন— জীবনবীমার অফিসের মাঝে। বহু বছর পরে নামকরা গণিতজ্ঞ শান্তিসুধা ঘোষ অনিকে বলেছিলেন, "তোমার জ্যাঠামশাই আমাদের ক্লাসে ছিল সেরা ছাত্র। পরের বছর পরীক্ষা দিলে নির্ঘাত ফার্স্ট হত যতিশেখর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ ওর বাঁধা ছিল। যতি যে কেন সব ছেড়ে দিল কে জানে? ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে যে সারাজীবন ইনসিওরেন্স কোম্পানির ক্লার্ক হয়ে থাকবে ভাবতে পারিনি।"

পরের বছর আনন্দশেখর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। যতিশেখর খুবই খুশি ছোট ভাইয়ের সাফল্যে। আনন্দশেখর খুব হইচই ভালবাসেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। যতিশেখর এ ব্যাপারে একটু একাচোরা। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দাবাখেলা একটা নেশা। এ খেলা নীরবে হত না। হইচই চিৎকার, চেঁচামেচি লেগেই থাকত দাবাখেলার দান নিয়ে। মেসের বন্ধুরা গোল হয়ে দেখত দু'ভাইয়ের দাবাখেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পড়াশুনায় যেমন ভাল, গানবাজনায় তেমনই পারদর্শী ছিলেন আনন্দশেখর। দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েও

দু'ভাই ছিলেন স্বাবলম্বী— ছাত্র পড়িয়ে নিজেদের পড়ার খরচ জুগিয়েছেন দু'জনেই। বিধুশেখরের কাছ থেকে কোনওদিনই সাহায্য নেননি।

সংগীতের প্রতি আকর্ষণ ছিল দু' ভাইয়ের। ওদের মা কাদম্বরী নাকি দারুণ গান গাইতেন। ওরা হয়তো মা'র কাছ থেকেই গানের প্রতিভা পেয়ে থাকবে। যতিশেখর গান গাইতেন গলা খুলে। বাঁ হাতে তবলা বাজাতেন।

গলাটা ভাঙা ছিল আনন্দশেখরের। গান গাইতে পারতেন না। আনন্দশেখর বাজাতেন নানা ধরনের যন্ত্র— সেতার, বেহালা, অর্গান, এসরাজ। পরীক্ষার পর আড্ডা অব্যাহত রইল। গানবাজনা চলত গভীর রাত পর্যন্ত। নানারকমের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল। কিন্তু এর মধ্য থেকেও আনন্দশেখর খুঁজে নিয়েছেন আনন্দ। করণীয় কাজ বিনা অভিযোগে করেছেন কর্মফল না ভেবেই। পড়াশুনার পাট চুকল। এবার চাকরি খোঁজার পালা। ছোট ভাইবোনদের অনেক দায়িত্ব আন্দশেখরের ওপর। একটা জুতসই চাকরি দরকার।

এই গরিব মেধাবী ছেলের কাছে অপ্রত্যাশিত এক সুযোগ এল। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স থেকে আনন্দশেখর আমন্ত্রণ পেয়েছেন ডক্টরেট করার জন্য। এ এক বিরাট সম্মান। ওদের শিকারপুর গ্রাম থেকে কেউ কখনও বিদেশে যায়নি। যতিশেখর খুশি। ছোট ভাইবোনেরা গর্বিত আনন্দশেখরকে নিয়ে। বিলেতে পড়াশুনার সমস্ত খরচ দেবে লন্ডন য়ুনিভার্সিটি। যাতায়াতের সমস্যাও নেই। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপটা পাওয়া যাবে। স্বপ্ন দেখেন আনন্দশেখর। নিউটন, ডালটন, ফ্যারাডে আর ডারউইনের দেশে যাচ্ছেন আনন্দশেখর বিজ্ঞানের গবেষণায়। এতদিন বিজ্ঞানমন্দিরের বাইরেই ঘোরাঘুরি করেছেন। এবার সেই মন্দিরের ঢোকার সুযোগ পাবেন। স্বপ্ন দেখেন আনন্দশেখর। চারিদিকে সাদা বরফে ঢেকে আছে লন্ডন। দূরের গির্জা থেকে ভেসে আসছে অর্গান। রাতের পর রাত ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন আনন্দশেখর— নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায়। সাহেব-মেমদের দেশ। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন বাকিংহাম প্যালেস, পিকাডিলি সার্কাস, ব্রিটিশ মিউজিয়ম, টেমস নদী, রয়েল সোসাইটি। জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র এই সব দেশবরেণ্য বিজ্ঞানীর মতো আনন্দশেখরও কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন? সরস্বতীর মন্দিরে কি ঢুকতে পারবেন তিনি? স্বপ্ন দেখেন আনন্দশেখর।

বিলেতের নীল চিঠিটা ধরে মেসের বাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন আনন্দশেখর। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ কখনও বিলেতে যায়নি। কার কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ নেবেন? ঠিক করলেন ওঁর শিক্ষাগুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলবেন। বহু বছর এডিনবরায় ছিলেন আচার্য। বিলেতে যাবার জন্য কী কী করণীয় উনি বলতে পারবেন। প্রফুল্লচন্দ্রর কথা ভেবে

রওনা দিলেন আপার সার্কুলার রোডে সায়েন্স কলেজে।

সত্যিকারের আচার্য ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। যেন আর্যযুগের ঋষি। এত বড় বিজ্ঞানী কিন্তু জীবনযাত্রা ছিল খুবই সরল ও সাধারণ। ধর্মের দিক থেকে কেশবচন্দ্রের অনুগামী। কর্মের দিক থেকে গান্ধীর। সায়েন্স কলেজের দোতলায় দক্ষিণ দিকে একটা ঘরে থাকতেন প্রফুল্লচন্দ্র। নিজের হাতে কুকারে রান্না করতেন ভাত, মুসুরীর ডাল আর আলুসেদ্ধ। ইচ্ছে করেই ঘরে পাখা রাখেননি আচার্য, মিতব্যয়িতার জন্য। মাইনের বেশির ভাগ টাকাই দিয়ে দিতেন গরিবছাত্রদের, দুঃখীদের আর কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে যাতে করে আধুনিক ল্যাবরেটরি করা যায়— মেধাবী ছাত্ররা সুযোগ-সুবিধে পায় গবেষণার জন্য। কোনও রকম বিলাসকে প্রশ্রয় দিতেন না প্রফুল্লচন্দ্র। দুর্ভিক্ষে আর বন্যায় ছাত্রদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দুর্গতদের সেবার জন্য। বাঙালির অন্নসমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। অর্থনৈতিক সাফল্য না হলে বাঙালি দাঁড়াতে পারবে না, জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না সেটা তিনি বুঝতেন। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। কলকাতা এখন মাড়োয়ারি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি আর মাদ্রাজিদের হাতে— বাঙালিরা শহর থেকে ক্রমশই দূরে হটে গেছে। শহরের বাসিন্দা এখন অবাঙালিরা। হাওড়ার হাট থেকে কেনা চেক-চেক কাপড়ের দুটো সুতোর কোট বানিয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের পাশের দর্জিকে দিয়ে। একটা রেখেছেন নিজের জন্য, একটা ডিপার্টমেন্টের বেয়ারার। অনেক সময় দুজনকে আলাদা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কে প্রফেসার, কে বেয়ারা চেনা যায় না দূর থেকে।

বিজ্ঞান ছাড়াও সাহিত্য ও ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রফুল্লচন্দ্রর। তাঁর লেখা 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' এক অমূল্য সম্পদ। পরাধীন ভারতবর্ষে তিনি উৎসাহ দিতেন ছাত্রদের স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করার জন্য। নিজের হাতে তৈরি করেছেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। সারা ভারতে অগ্রণী এই বেঙ্গল কেমিক্যাল। তাঁর আহ্বানে অনেক কৃতী ছাত্রই যোগ দিয়েছেন এই বিজ্ঞানের কর্মশালায়— অমূল্যচরণ বোস, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, সতীশচন্দ্র সিনহা। পরিচালনার ভার দিয়েছেন বিজ্ঞানী ও সুসাহিত্যিক রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামকে।

আনন্দশেখর ইম্পিরিয়াল কলেজের চিঠিটা আচার্যকে দেখায়। খুশি হয়ে পিঠে একটা কিল দিয়ে বলেন, "সাবাস আনন্দ, একটা ভাল জায়গায় কাজ শেখার সুযোগ পেলি। তবে কথা দিয়ে যা, ফিরে এসে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগদান করবি। নিজের হাতে দেশ গড়ার কাজে লেগে যা।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস্‌সি। ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রিতে বিশ্বজোড়া নাম। বিজ্ঞান সম্মেলনে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। কিন্তু মনে প্রাণে প্রচণ্ড স্বদেশী। গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকের পুরোধা। চিঠিটা

আর-একবার পড়ে বললেন, "আনন্দ, বেশি সময় নেই। বিলেতে যাবার গোছগাছ শুরু করে দে। পাসপোর্টের জন্য স্থানীয় লোকের দুটো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট লাগবে। তোর বরিশালের কোনও বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে চেনাজানা আছে? খুব ভাল হয় তুই যদি বরিশাল টাউনের অশ্বিনীকুমার দত্ত আর রাজেন ব্যানার্জির কাছ থেকে দুটো চিঠি নিতে পারিস। দুজনেই আমার খুব বন্ধুস্থানীয়। আমি ওদের দুটো চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। ওরাই তোকে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবে।"

আনন্দশেখর বরিশাল শহরে এলেন সার্টিফিকেটের জন্য। দেশপ্রেমী অশ্বিনীকুমার দত্তর সারা বাংলা জুড়ে নাম। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। প্রচুর দেশকর্মী তাঁর বাড়িতে সবসময় ভিড় করে আছেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রফুল্লচন্দ্রের চিঠি পড়লেন অশ্বিনীকুমার। আনন্দশেখরের দিকে তাকিয়ে বলেন, "আচার্য যখন তোমার সম্বন্ধে এত ভাল লিখেছে, তুমি আমাদের দেশের গর্ব।" সুন্দর করে একটা চিঠি দিলেন অশ্বিনীকুমার। এবার আনন্দশেখর চললেন রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। দ্বিতীয় ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটটা তাঁর কাছ থেকে নিতে বলেছেন আচার্য।

বিরাট সাদা থামওয়ালা চকমিলানো বাড়িতে থাকেন রাজেন্দ্র। বরিশাল শহরের সবচেয়ে বড় আইনজীবী। এ ছাড়া কুড়ি বছর ধরে বরিশাল শহরের চেয়ারম্যান। তাঁরই নেতৃত্বে শহরের মাঝে পাকা রাস্তা, নতুন স্কুল, জল, ইলেকট্রিসিটি— সব হয়েছে। আনন্দশেখরের শিকারপুর গ্রামে বড় শহরের কোনও সুযোগ-সুবিধে নেই।

রাজেন্দ্রর বাড়ির দু'পাশে ঝাউগাছ, সবুজ লন, কেয়ারি করা ফুলের বাগান। বহু লোকের আনাগোনা এই বাড়িতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এসেছিলেন রাজেন্দ্রর কাছে, অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে। রাশভারী লোক রাজেন্দ্র। কিন্তু গুণীর সমাদর করতেন। গোপনে বহু মেধাবী ছাত্রকে বই কেনার টাকা, কলেজের মাইনে জুগিয়েছেন রাজেন্দ্র বছরের পর বছর। একটু সংকোচের সঙ্গেই আনন্দশেখর দেখা করলেন রাজেন্দ্র সঙ্গে আচার্যর চিঠি নিয়ে।

রাজেন্দ্রর ভাল লাগল এই সপ্রতিভ মেধাবী আত্মবিশ্বাসী যুবককে দেখে। ভেতরের ঘরে নিয়ে বসালেন। নানা ধরনের খাবার এল শ্বেতপাথরের টেবিলে। আলাপ করিয়ে দিলেন বাড়ির সবার সঙ্গে। "রাত্রিবেলা আমাদের এখানে তোমার নেমন্তন্ন রইল আনন্দশেখর। এর মধ্যে আমি চিঠিটা তৈরি করে রাখব" বললেন রাজেন্দ্র। বড় ছেলে দ্বিজেন বরিশাল শহরের চোখের ডাক্তার। আনন্দশেখরের বয়সি হবে। এর মধ্যে দারুণ পসার। দ্বিজেনের সঙ্গে প্রথম আলাপেই আনন্দশেখরের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

সন্ধেবেলা আনন্দশেখর রাজেন্দ্রর বাড়িতে উপস্থিত। বাড়ি ভর্তি লোক। রাজেন্দ্রর তিন মেয়ে— প্রত্যেকেই রূপসী ও গুণান্বিতা। বড় মেয়ে বনলতা

কাছেই থাকেন। বিয়ে হয়েছে স্কুলের হেডমাস্টার ধীরেন্দ্রর সঙ্গে। প্রতিদিন একবার করে ঘুরে যান বাবা-মার কাছে। মেজো মেয়ে স্বর্ণলতা থাকেন উড়িষ্যার শোনপুরে— জামাই অমর শোনপুরের রাজার দেওয়ান। ছোট মেয়ে হেমছায়া এই স্কুলের উঁচুক্লাসে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। আনন্দশেখরের আলাপ হল হেমছায়ার সঙ্গে। এত রূপ আগে দেখেননি আনন্দশেখর। এ ছাড়া খুব ভাল গান গায় হেমছায়া। আনন্দশেখর বাড়ির এসরাজ বাজিয়ে সঙ্গ দেয় হেমছায়াব গানের সঙ্গে।

বনলতা বুঝতে পারেন আনন্দশেখরের দুর্বলতা হেমছায়ার ওপর। ঘনঘন তলব পড়ে আনন্দশেখরের রাজেন্দ্রর বাড়িতে। বনলতা সুযোগ করে দেন, যাতে দু'জনে দু'জনকে জানতে পারে। বিলেতে যাতে ঠান্ডা না লাগে, বনলতা হেমছায়াকে দিয়ে বোনাচ্ছেন সোয়েটার আর মাফলার আনন্দশেখরের জন্য। একটা চিঠি আনার নাম করে দু'মাস কেটে গেল আনন্দশেখরের। রাতটা শুতে যান গ্রাম সম্পর্কের এক কাকার বাড়ি।

আনন্দশেখর প্রতি বিকেলে চলে আসেন রাজেন্দ্রর বাড়ি। হেমছায়ার গান, বনলতার ব্যঞ্জন, রাজেন্দ্রর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা— হুই হুই করে সময় কাটছে আনন্দশেখরের। এবার কলকাতায় ফেরার পালা। অনেক কাজ বাকি। বনলতা বাবাকে ডেকে বললেন, "বাবা, আনন্দশেখরের মতো ভাল ছেলে হাতছাড়া করা উচিত হবে না। মনে হচ্ছে, আনন্দ হেমছায়াকে সত্যিই ভালবাসে। দু'জনে খুব ভাল জুটি হবে। বিলেত যাবার আগেই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করো।" বনলতার কথায় সায় দিলেন রাজেন্দ্র। "বুঝলি, আমিও তাই ভাবছিলাম। তোর মাকেও এই কথা বলেছি। হেমছায়ার বিয়ে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত। তোর মারও খুব পছন্দ আনন্দশেখরকে। এই নিয়ে আমি একটু দ্বিজেন আর নরেনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।"

রাজেন্দ্রর দুই ছেলে দ্বিজেন আর নরেনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। ফর্সা টকটকে রং দ্বিজেনের। চোখের ডাক্তার। এর মধ্যেই খুব নামডাক হয়েছে। বিয়ে হয়েছে খুব বড়লোকের ঘরে। দ্বিজেনের স্ত্রী মনোরমাকে পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো দেখতে। লম্বা চেহারা, বড় বড় চোখ, টানটান চেহারা। একটু অহংকারী। সবাই ভয় করে চলে মনোরমাকে। ছোটছেলে নরেন চিরকালই খেলাধুলা ও শরীর চর্চা নিয়ে ব্যস্ত। কলেজের পড়ায় মন নেই দেখে রাজেন্দ্রই খুলে দিয়েছেন চশমার দোকান। সেখানে নরেনের খুবই বাণিজ্যিক সাফল্য। দ্বিজেনের কাছে চোখ দেখিয়ে নরেনের দোকানে চশমা করিয়ে নেয় শহরের লোকেরা। নরেনের বিয়ে হয়েছে বালিগঞ্জের এক ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। রাজেন্দ্র নিজেই পছন্দ করেছেন ছোট পুত্রবধূকে। স্নেহ করেন এই মাতৃহারা কিশোরী ছায়াকে। এই নিয়ে মনোরমার একটু অসন্তোষ। ছায়া কথা

বলে ফুলঝুরির মতো— হইচই করতে ভালবাসে। নাচ গানে পটু। মনোরমা গম্ভীর, কলকাতার কলেজে পড়া মেয়ে। কালো, লম্বা সুগঠিত চেহারা নরেনের। মনোহর আইচের মতো। শরীরচর্চায় খুব মেতে আছেন নরেন। বিরাট বুকের ছাতি, কোঁকড়া চুল— ব্যায়াম সমিতির সেক্রেটারি। বডি বিল্ডিং কম্পিটিশনে প্রচুর প্রাইজ পেয়েছে নরেন। পেরেকের পাটাতনে শুয়ে দু' মন ওজন তোলে বলিষ্ঠ হাতে। পুজোয় উৎসবের প্যান্ডেলে আর অনুষ্ঠানে নানা রকমের শরীরের কসরৎ দেখায় নরেন।

রাজেন্দ্র দুই ছেলের সঙ্গে কথা বললেন, আনন্দশেখরের সঙ্গে হেমছায়ার বিয়ের ব্যাপারে। এ-ব্যাপারে দুই ভাই রাজি। দ্বিজেন এর মধ্যেই আনন্দশেখরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। গরিবের ঘরে ছোটবোনের বিয়ে হবে বলে কারও আপত্তি নেই। দুজনেই জানে আনন্দশেখরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিলেত থেকে ফিরলে ভাল চাকরি পাবে বিলিতি কোম্পানিতে। ইচ্ছে হলে কোনও য়ুনিভার্সিটিতেও পড়াতে পারবে আনন্দশেখর।

এর মধ্যে আনন্দশেখর কলকাতায় ফিরে গেলেন হেমছায়ার কথা ভাবতে ভাবতে। রাজেন্দ্র লোক পাঠালেন শিকারপুরে। আমন্ত্রণ জানালেন বিধুশেখরকে ওঁর বাড়িতে। বিধুশেখর ভাবতে পারেননি এত বড়লোকের বাড়িতে আনন্দশেখরের বিয়ে হবে। বছর দুয়েক আগে যতিশেখরকে বিয়ে দিয়েছেন গ্রামের এক ছোট্ট মেয়ে নমিতার সঙ্গে। যতিশেখর বউকে নিয়ে কলকাতায় থাকেন নতুন ভাড়া বাড়িতে। হেমছায়াকে দেখে বিধুশেখর খুব খুশি। সত্যিই হেমছায়া কল্যাণী ও অপরূপা। হেমছায়ার গান শুনে বিধুশেখর মুগ্ধ; মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ভাবী বউকে। শুভ দিনক্ষণ দেখে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেল আনন্দশেখরের সঙ্গে হেমছায়ার।

যত্নে আদরে লালিত হেমছায়া এলেন শিকারপুরের সাদামাটা গ্রামের বাড়িতে। কাছেই কীর্তনখোলা নদী। বর্ষায় জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। সামনে বিরাট দীঘি। সকাল সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়ে-বউরা জল আনতে যায় পুকুরঘাটে। কাপড় কাচা, স্নান করা, গল্পগুজব, পরনিন্দা, পরচর্চা সবই হয় ঘাটের চারপাশে। আস্তে আস্তে হেমছায়া মানিয়ে নিলেন এই গ্রাম্য পরিবেশ। কাজের জন্য বিধুশেখর থাকেন খুলনায়। ছুটির সময় বাড়িতে আসেন। বিধুশেখরের দ্বিতীয় পক্ষের বউ মানদাসুন্দরীর চার মেয়ে, দুই ছেলে। সবাই হেমছায়ার ছোট। হেমছায়া সবাইকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর রূপ, তাঁর ব্যবহার, নিত্যনতুন রান্না, গান— সব দিয়ে জয় করে নিলেন সবাইকে।

আনন্দশেখর কলকাতায় বসে বিলেতে যাবার প্রস্তুতি করছেন। ছুটি পেলেই শিকারপুরে আসেন হেমছায়ার সান্নিধ্যের জন্য। "আমাকে ফেলে কলকাতায় থাকতে কষ্ট লাগে না?" অনুযোগ করে হেমছায়া। "বিলেত থেকে ফিরে নতুন

করে সংসার পাতব কলকাতায়” আশ্বস্ত করেন আনন্দশেখর।

আনন্দশেখর চলে গেলে হেমছায়া মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেন গ্রাম বাংলার পরিবেশ— গোলাভরা ধান, মাছরাঙা, সাদা বক, কাশফুল জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। ভোরবেলা শিউলিফুলে বাড়ির উঠোনটা ঢেকে যায়। হেমছায়া ফুল তোলেন, মালা গাঁথেন গৃহদেবতার জন্য। দুই ননদ লীনা আর বীণা ছায়ার মতো থাকে বউদির সঙ্গে। সন্ধেবেলা ওদের গান শেখান। সবারই খুব মিষ্টি গলা। এখানে বিজলি বাতি নেই। রাত তাড়াতাড়ি হয়। অন্ধকারে জোনাকির ভিড়। হেমছায়া ভাবেন আনন্দশেখরের কথা। বিলেতে চলে গেলে কতদিন দেখতে পাবেন না আনন্দশেখরকে— এই কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন হেমছায়া।

কলকাতার মেসে বসে বিলেত যাবার জোগাড়যন্তর করছেন আনন্দশেখর। সতীর্থরা কেউ চাকরি করছে, কেউ বিদেশে যাবার তোড়জোড় করছে। কেউ শুরু করেছে গবেষণা ‘সায়েন্স’ কলেজে। কলেজ চত্বরে অনেক সময় কাটে আনন্দশেখরের। পুরনো অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়। আড্ডা চলে আগের মতোই। পুজো হয়ে গেছে। জানুয়ারির প্রথম দিকে ইমপিরিয়াল কলেজে যোগদান করার কথা। অপেক্ষা করে আছেন “ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ”-এর জন্য। এম এস্‌সি-তে প্রথম হওয়ার জন্য এই স্কলারশিপ তাঁর প্রাপ্য। তবুও যতদিন হাতে চিঠি না আসে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। আনন্দশেখর বসে থাকেন কবে এই চিঠি পাবেন য়ুনিভার্সিটি থেকে। প্রতি রাতেই মেসে ফিরে খোঁজ করেন কোনও চিঠি এসেছে কি না? মাঝে মাঝেই নীল খামে হেমছায়ার চিঠি— বাড়ির খবর। শেষের দিকে অভিমান, অনুযোগ— “কলকাতায় বসে করছ কী? শিকারপুরে কবে আসছ? ভাল লাগে না একা একা থাকতে।”

সায়েন্স কলেজে পুরনো অধ্যাপক যোগেশ বর্ধনের সঙ্গে ট্রাভেলিং ফেলো নিয়ে কথা হচ্ছিল আনন্দশেখরের। ডক্টর বর্ধন বললেন, “আনন্দ, য়ুনিভার্সিটির কোন্ ফাইলে তোমার চিঠি আটকে আছে কে জানে? সবচেয়ে ভাল হয় একদিন তুমি যদি ভাইস চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করো। ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো প্রতিবছর উনিই ঠিক করেন। জানুয়ারির বেশি দেরি নেই। এ মাসের মধ্যে কোনও খবর না পেলে এ বছর তোমার যাওয়া নাও হতে পারে লন্ডনে। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যত তাড়াতাড়ি পার শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করো।”

সপ্তাহখানেকের মধ্যে ডাক এল শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে। আনন্দশেখর বললেন, লন্ডন য়ুনিভার্সিটির আমন্ত্রণের কথা, “স্যার, ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ না পেলে আমার পক্ষে লন্ডন যাওয়া সম্ভবপর নয়। আমি এ বছর এম এস্‌সি-তে ফার্স্ট হয়েছি। আশা করছি ফেলোশিপটা পাব।”

জলদগম্ভীর কণ্ঠে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে বললেন,

"আনন্দশেখরের ফাইলটা নিয়ে এসো তো? এ বছর ও ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ-এর জন্য আবেদন করেছে।"

একটু পরে সেক্রেটারি আনন্দশেখরের ফাইলটা নিয়ে হাজির। অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন সব চিঠিপত্র। মুখটা গম্ভীর। থমথমে ভাব। আনন্দশেখর মনে মনে ভাবছেন কোনও খারাপ খবর নয় তো? শ্যামাপ্রসাদ জানালেন দুঃসংবাদ: "এ বছর ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ দেওয়া হচ্ছে দাশরথি রায়কে। সরি আনন্দ। কমিটি যা ঠিক করেছে আমি তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য।" "কিন্তু স্যার, দাশরথি আমাদের ক্লাসে বোধহয় সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছে। কোনওমতে পাস করেছে।" মৃদু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে আনন্দ।

শ্যামাপ্রসাদ কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন, "দেখো আনন্দশেখর, পরীক্ষায় প্রথম হওয়াটা বড় কিছু নয়। স্কলারশিপ কমিটি এবার মনোনীত করেছে দাশরথিকে। নিশ্চয়ই ওর মধ্যে কিছু গুণ আছে, লিডারশিপ আছে। ওর বাবা নাটোরের জমিদার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য কয়েক লাখ টাকা দিয়েছেন। এঁরা আমাদের সত্যিকারের সুহৃদ। এঁদের চটানো যায় না। তুমি বরঞ্চ সামনের বছর চেষ্টা কোরো এই ফেলোশিপটার জন্য। গুডলাক ইয়ং ম্যান।"

সব স্বপ্ন ভেঙে গেল আনন্দশেখরের এক মুহূর্তে। বিশ্বাস করতে পারছেন না শিক্ষাজগতের এই প্রহসনকে। আনন্দশেখর কাকেই বা চেনেন কলকাতা শহরে। দাশরথি রায়ের মতো উঁচু মহলে ওর যাতায়াত নেই। সারাজীবন টুইশনি করে কলেজের খরচা চালিয়েছেন।

বাবা স্টিমার কোম্পানির সামান্য কেরানি। রাজেন্দ্র শুনলে হয়তো নিজেই বিলেতে পাঠাতে চাইবেন ছোটজামাইকে। আনন্দশেখর কারও অনুগ্রাহী হতে চান না। ভাগ্যকে মেনে নেবেন তিনি। কলকাতায় কি মানুষ থাকে না? এখানেই একটা ভাল চাকরি ঠিক করে হেমছায়াকে নিয়ে আসবেন। নতুন করে সংসার করবেন কলকাতা শহরে।

শিকারপুরে ফিরলেন আনন্দশেখর। হঠাৎ আনন্দশেখরকে দেখে হেমছায়া আশ্চর্য হয়ে গেলেন। "সব খবর ভাল তো?" আনন্দশেখর চুপ করে আছেন। একটু পরে বললেন, "জান হেম, আমার বোধহয় বিলেত যাওয়া হচ্ছে না। ট্রাভেলিং ফেলোশিপটা ওরা দিয়েছে নাটোরের দাশরথি রায়কে। পয়সা দিয়ে ওরা সম্মান, কৃতিত্ব সব কিনে নিয়েছে।"

হেমছায়া দুঃখ পেলেন। আবার খুশিও কিছুটা। "দরকার নেই বিলেত যাবার। ওখানে সুন্দর সুন্দর মেমসাহেব দেখলে আমাকে ভুলে যাবে। ভগবান যা করে ভালর জন্যই করে। তুমি বরঞ্চ আমায় কলকাতায় নিয়ে চলো। আমি এই গ্রামে হাঁপিয়ে উঠেছি। চলো, কলকাতায় আমরা নতুন করে সংসার পাতি।"

অনেকটা আপনমনে বলে উঠলেন আনন্দশেখর— "দেখি, একটা চাকরি

জোগাড় করতে পারি কি না? তার পর একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করব। তার পর তোমায় নিয়ে যাব কলকাতায়।"

আনন্দশেখর দেখা করলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে। সব হতাশার খবর বললেন, কী করে ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো দাশরথি রায়কে দেওয়া হয়েছে।

"এটা খুবই অন্যায় করেছে শ্যামাপ্রসাদ। তবে চুপ করে বসে থাকিস না। কলকাতায় এখন বিজ্ঞানের জোয়ার এসেছে। ভেবে দেখ সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা— এরা সব দেশে বসেই যুগান্তকারী কাজ করছে। তুই পারবি না কেন? আদা জল খেয়ে এখানে ডক্টরেট করে নে।

"আমার বয়স হয়েছে। আমি আর পারি না গাইড করতে। তুই যোগেশ বর্ধনের কাছে যা। যোগেশ খুব পণ্ডিত লোক। ওর কাছে অনেক কাজ শিখতে পারবি।" এই বলে আচার্য থামলেন।

আনন্দশেখর ডক্টর বর্ধনের সঙ্গে দেখা করেন। ডক্টর বর্ধন খুবই স্নেহ করেন আনন্দকে। "দ্যাখ আনন্দ, তোর মতো ছেলে যে গবেষণা করবে সেটা আর আশ্চর্য কী? খুব তাড়াতাড়িই তোর ডক্টরেট হয়ে যাবে। তবে জানিস তো স্কলারশিপের টাকা খুবই সামান্য। তুই তো আবার সম্প্রতি বিয়ে করেছিস। এই টাকায় কি সংসার চালাতে পারবি?"

"কী করব স্যার। দেশে জমিজমা আছে। বউ ওখানেই থাকবে, আমি মেসে থাকব। কষ্ট তো করতেই হবে। বিলেতে গেলেও তো বছর দুয়েক বউয়ের অদর্শনে থাকতে হত?"

"তা হলে কাল থেকেই কাজ শুরু করে দে। আমার এক দারুণ প্রজেক্ট আছে। আমার ধারণা তুই এটার সমাধান করতে পারবি। আশীর্বাদ করি, তুই অনেক বড় হ।"

আনন্দ দেড় বছর দিনরাত খেটে গবেষণা করছে। মাঝেসাঝে শিকারপুরে যায়। মাঝে এক পুজোর সময় হেমছায়াকে কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে গেছে। স্টারে থিয়েটার দেখিয়েছে। নিয়ে গিয়েছে ওর ল্যাবরেটরিতে।

"আমাকে আর-এক বছর সময় দাও হেমছায়া। মনে হয় এর মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমি তখন একটা লেকচারারের পদ পেতে পারি কোনও কলেজে। তখন তোমায় পাকাপাকি নিয়ে আসব।"

সেদিন ল্যাবরেটরির সামনে প্রচণ্ড ভিড়। পুলিশ ঘিরে রেখেছে। ভিড় ঠেলে দরজার কাছে যেতেই এক সতীর্থ বলল, "আনন্দ, খবরটা শুনেছিস?"

"কী খবর?" উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে আনন্দশেখর।

"ডক্টর বর্ধন সুইসাইড করেছেন। একটা চিরকুটে লিখে গেছেন— আমার মৃত্যুর জন্য কেউই দায়ী নয়।"

বিশ্বাস করতে পারছে না আনন্দশেখর। ডক্টর বর্ধন নিজের সন্তানের মতো

আনন্দকে ভালবাসতেন। সপ্তাহখানেক আগেও অনেক কথা হচ্ছিল ওর গবেষণা নিয়ে। ডক্টর বর্ধন খুশি—"আনন্দ, মনে হচ্ছে তুমি এই কঠিন অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডটা সিনথেসিস্ করে ফেলেছ। কনগ্রাচুলেশন মাই বয়। তুমি যদি ইথাইল র‍্যাডিক্যালটা ঢোকাতে পার এই কমপ্লেক্স মলিকিউলে, তা হলেই হয়ে যাবে।"

আনন্দশেখরের আর কিছু ভাল লাগছে না। জীবনটা নিয়ে আর সাপলুডো খেলতে ইচ্ছে করছে না। শিকারপুরে ফিরে গেলেন। হেমছায়াকে বললেন ডক্টর বর্ধনের মৃত্যুর কথা।

"তোমার কাজ আটকে যাবে না তো?" হেমছায়ার প্রশ্ন।

"কিছুই জানি না। উনি ছাড়া এই লাইনে কেউ কাজ করতেন না। মনে হচ্ছে ওঁর মৃত্যুর পর স্কলারশিপটা হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুপারভাইজার না থাকলে আমার ডক্টরেটটা হয়তো আর কোনওদিন শেষ হবে না।"

আনন্দশেখর কলকাতায় ফিরে চিঠি পেলেন কলকাতা য়ুনিভার্সিটি থেকে। তার সারমর্ম— "ডক্টর বর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুতে আনন্দশেখরের গবেষণা ইতি।" আনন্দশেখরের আর ডক্টরেট পাওয়া হল না।

না, আর স্বপ্ন নয়। এবার একটা চাকরি দরকার। ভাল চাকরি। যাতে হেমছায়া কলকাতায় থাকতে পারে। নতুন করে সংসার করতে পারে এই শহরে। এ জীবনে বিজ্ঞানী হওয়া হল না আনন্দশেখরের; ইচ্ছে ছিল নিজের বড় গবেষণাগার থাকবে কোনও য়ুনিভার্সিটিতে। প্রচুর ছাত্র থাকবে। তার চেয়ে কোনও কোম্পানিতে কাজ করবে। নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করবে যাতে সমাজের উপকার হয়। চাকরি খোঁজা শুরু করলেন আনন্দশেখর। ছোট বড় সব কোম্পানিতে।

৫

ভোর হয়ে গেছে। এয়ার হোস্টেস এসে জানলার পর্দাগুলো তুলে দিল যাতে প্লেনের ভেতর আলো আসে— যাত্রীদের ঘুম ভেঙে যায়। ব্রেকফাস্ট তৈরি। অরেঞ্জ জুস দিয়ে গেল সবাইকে। অনি উঠে হাতমুখ ধুয়ে এল। এখানে বাথরুমে ভিড় নেই নীচতলার মতো। খুবই পরিষ্কার ছিমছাম।

ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে এয়ার হোস্টেস। যেতে যেতে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখছে। তিরিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে বোয়িং ৭৭৭ যাচ্ছে— ঘণ্টায় ছশো মাইল গতিতে। ভেতর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কোনও দুলুনি নেই কোনও ঝাঁকুনি নেই। বাইরে শুধু মেঘের রাজ্য। সাদা সাদা মেঘ— যতদূর তাকানো যায়— দিগন্ত জুড়ে। কোনও নিশানা নেই। অনির মনে পড়ে অ্যান্টার্কটিকার কথা। ঠিক এমনি দেখতে অ্যান্টার্কটিকা। চারিদিকে শুধু সাদা বরফ আর বরফ। সে বছর ওর

ক্যাম্প করেছিল অ্যালান পাহাড়ে। সাদা বরফের মাঝে কমলা রঙের তিনটে তাঁবু। মাঝে কুকটেন্ট। ঠিক এমনিই দেখাত। একদিন কাজে বেরিয়েছে সবাই। ক্যাম্প থেকে কাছেই। মাইলখানেকের মধ্যে। পাহাড়ে উঠে দেখতে পাচ্ছে ছোট ছোট কমলা রঙের তাঁবু। হঠাৎ ঝড় উঠল। ব্লিজার্ড। তুষার ঝড়। চারিদিক সাদা বরফে কোথায় মিলিয়ে গেল ওদের তাঁবু। একশো মাইল জোরে হাওয়া বইছে। অনি সেবার এক্সপিডিশন লীডার। সবাইকে ও তাঁবুর ভেতর ফিরে যেতে নির্দেশ দিচ্ছে। ব্যাকপ্যাক নিয়ে পাহাড় থেকে নেবে সবাই হাঁটা দিয়েছে— ক্যাম্পের দিকে। কী প্রচণ্ড হাওয়ার জোড়। ওদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সেই তুষার ঝড়ে ওরা একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করছে। তাঁবুগুলো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কোনও নিশানা নেই। সবাই কাছাকাছি একসঙ্গে হাঁটছে। দলছুট হলেই বিপদ। ঘণ্টা দুয়েক ঘোরাঘুরির পর একজন চিৎকার করে উঠল: "ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছি।" বেচারা তাঁবুর দড়িতে হোঁচট খেয়ে বুঝতে পারে। চারিদিক বরফে সাদা হয়ে গেছে। সমস্ত তাঁবুই তুষারে ঢাকা। কুক টেন্টে ঢুকে গরম গরম কোকো খেয়ে সবাই নিশ্চিন্ত। জানলা দিয়ে মেঘের রাজ্য দেখতে হঠাৎ মনে পড়ল অ্যান্টার্কটিকার কথা।

মনটা কী আশ্চর্য জিনিস। কোথায় ও ভাববে ওর বাবার প্রথম যৌবনের কথা। কোথায় অ্যান্টার্কটিকা। কী সহজেই মনের ভাবনাগুলো ঘোরাফেরা করে। অনি আবার সাজাতে থাকে মনে মনে বাবার যৌবনের জীবন সংগ্রাম। তার বাবা ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের এক আদর্শ বিজ্ঞানী। প্রথম যৌবনে বিলেতে যাবার সুযোগ অল্পের জন্য হারালেন। তার পর আই সি আই-এর লোভনীয় চাকরি গ্রহণ করলেন না গুরু প্রফুল্লচন্দ্রের কথা, শিরোধার্য ক'রে। এই আত্মত্যাগের কি কোনও দাম আছে? অনি ভাবছে ওর বাবার কথা— সারাজীবনের সংগ্রামের কথা। ভাগ্যের পরিহাসে অনিদের ছোটবেলা দারিদ্র্যের মাঝে কেটেছে। সাপলুডো খেলার মতো আনন্দশেখরের জীবন সিঁড়ি দিয়ে একটু ওঠার পরই সাপের মুখে ঘুঁটি। নিজের সুযোগ-সুবিধে, স্বার্থের কথা কোনওদিন জীবনে বড় করে দেখেনি আনন্দশেখর। অর্থকরী দিকে শূন্যের কোঠায় থাকতে হয়েছে। অনি ভাবছে বাবার কথা...

আনন্দশেখর আজ ভীষণ খুশি। নতুন বউ-এর জন্য জামদানি শাড়ি কিনেছেন। ছোট ছোট ভাইবোনদের কথা ভেবে ভীমনাগের তালশাঁস সন্দেশ, হিংয়ের কচুরি, আর শোনপাপড়ি। শিকারপুরে এসব খাবার পাওয়া যায় না। নৌকো বেয়ে চলেছেন গ্রামের বাড়িতে। মনে মনে ভাবছেন কী করে ভাল খবরটা দেবেন হেমছায়াকে। বিলিতি কোম্পানি আই সি আই-এ একটা দারুণ চাকরি পেয়েছেন আনন্দশেখর। পলিমার কেমিস্ট। প্রচুর মাইনে। সিনথেটিক ফাইবার, প্লাস্টিক ইত্যাদি করার দায়িত্ব ওঁর। কিছুদিনের মধ্যেই অফিসের বাংলো গাড়ি ইত্যাদি

সুযোগ-সুবিধে। বছরে একবার লন্ডনে মিটিং কোম্পানির তরফ থেকে। লন্ডনেই আই সি আই-এর হেড অফিস। এই বুঝি জীবনের মোড় ঘুরল। লক্ষ্মী হয়তো এতদিনে প্রসন্না হয়েছেন। আর কখনও আর্থিক অনটনে থাকতে হবে না। নতুন বউকে পুকুরঘাটে কাপড় কাচতে হবে না। কাঠের আগুনে রান্না করতে হবে না দু'বেলা। নিজেকে ট্রাম বাসে চড়তে হবে না। মেসের রান্না খেতে হবে না। একটা সুখের স্বপ্ন দেখছেন আনন্দশেখর নৌকোর ছই-এ বসে বসে।

গ্রামের বাড়িতে আনন্দশেখরকে দেখে সবাই আশ্চর্য। জামদানি শাড়ি পেয়ে হেমছায়া খুশি। সত্যিই তো বিয়ের পরে সবাইকে নিয়ে ফুর্তি করবেন সে সুযোগ হয়নি। টানাটানির সংসার। নানা ধরনের শৌখিন খাবার দেখে ভাইবোনেরা খুশি। কচুরি আর মিষ্টি খেতে খেতে ছোট ভাইবোনেরা ছোটাছুটি করছে।

জিজ্ঞেস করছে, "ছোড়দা, কী ব্যাপার? নিশ্চয়ই কোনও ভাল খবর আছে? বিলেত যাওয়া তা হলে নিশ্চয়ই হচ্ছে?"

আনন্দশেখর বলেন, "দ্যাখ, এই মুহূর্তেই বিলেত যাচ্ছি না, তবে বিলেত যাওয়া হবে। আমি একটা বিলিতি কোম্পানি আই সি আই-তে দারুণ চাকরি পেয়েছি। এবার বোধহয় আমাদের এতদিনের দুঃখ ঘুচল। এবার তোদের বউদিকে কলকাতায় নিয়ে যাব ঠিক করেছি।"

সুখবর শুনে ছোট ছোট ভাইবোনেরা কলকল করে উঠল: "ছোড়দা, আমরা কখনও কলকাতা দেখিনি। এবার আমাদের সবাইকে কলকাতা দেখাতে হবে। ওখানে আমরা সিনেমা, থিয়েটার, জাদুঘর আর চিড়িয়াখানায় যাব। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর হাওড়া ব্রিজ দেখব। ট্রামে বাসে চড়ব। রেস্টুরেন্টে খাব চপ কাটলেট আর চিনে খাবার। কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দেব। নানাধরনের মোটরগাড়ি দেখব। ইলেকট্রিকের আলোতে রঘুডাকাতের গল্পের বই পড়ব। কী মজাই না হবে।"

"একটু গুছিয়ে নিই। আমার গাড়িতেই তোদের কলকাতা শহর ঘুরিয়ে দেখাব"— আশ্বস্ত করেন আনন্দশেখর।

আই সি আই-এর চাকরিপ্রাপ্তির খবর পৌঁছল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে। ছাত্র পাঠিয়ে ডেকে পাঠালেন আনন্দশেখরকে সায়েন্স কলেজে। প্রফুল্লচন্দ্র যদিও বহুদিন বিলেতে কাটিয়েছেন তাঁর জাতীয়তাবোধ তীব্র। দুঃখ পেয়েছেন তাঁর প্রিয় ছাত্র আনন্দর বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ করার জন্য।

"আনন্দ, জীবনে টাকাটাই সবচেয়ে বড় নয়। আদর্শ, দেশপ্রেম, চরিত্র— এইসব মানুষের ধর্ম। তোর মতো ভাল ছাত্ররা যদি দেশগড়ার কাজে যোগ না দেয়— তবে পরাধীন ভারতবর্ষের কী হবে? আমাদের সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বিদেশি জিনিস বর্জন করতে হবে?"

"স্যার, আপনি আমার বাড়ির অবস্থা জানেন না। আমার মা, বাবা, ভাইবোন,

বউ— সবাই আমার মুখ চেয়ে আছে। বিয়ের পরে বউকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে পারিনি। কলেজ জীবনটা টুইশনি করে চালিয়েছি। মেসের রান্না খেয়েছি। বিলেতে যাবার সুযোগটা নষ্ট হল। দেড় বছর নষ্ট হল গবেষণায়। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। এই চাকরিটা আমার খুবই দরকার। এটা আমি ছাড়তে চাই না।"

"শোন আনন্দ, দারিদ্র্যকে ভয় পাবি না। ওর মধ্যে একটা শক্তি আছে। দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্য থেকেও প্রাচীনকালে নাগার্জুন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কী উন্নতি করেছিল। আমার কথাই ভাব। এই বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন আরম্ভ করি— কুড়চি গাছের ছাল ছেঁচে ছেঁচে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশে কতরকম গাছগাছড়া আছে—সর্পগন্ধা, বিশল্যকরণী, সন্ধ্যাতারা, আমলকী, নিম— এই সব দিয়ে সস্তায় দেশবাসীদের জন্য ওষুধ করছি, যাতে দেশবাসীরা বিদেশি ওষুধ বর্জন করে। এই দেশগড়ার পুণ্যযজ্ঞে তোকে আমার চাই। ছেড়ে দে বিলিতি চাকরি, টাকার মোহ। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে...'।"

আচার্যের কথায় অনুপ্রাণিত হলেন আনন্দশেখর। আই সি আই-এর লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিলেন এক কথায়। এর পরিবর্তে অতি সামান্য মাইনেতে যোগদান করলেন প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশী কোম্পানি 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'। গঙ্গার পাড়ে পানিহাটিতে ফ্যাক্টরি। আনন্দশেখরকে ভার নিতে হবে সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্টের। দেশগড়ার জন্য অপরিহার্য এই সালফিউরিক অ্যাসিড।

যতিশেখরের ভাল লাগেনি আনন্দশেখরের এই আদর্শ, এই জাতীয়তাবোধ। ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন—

"আনন্দ, তুই একটা বোকার মতো কাজ করলি। এমন চাকরি কি কেউ ছেড়ে দেয়? বুঝতে পারছিস না, পি সি রায় তোকে এক্সপ্লয়েট করছে তোর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে? কই তোর অন্যান্য বন্ধুরা শান্তিরঞ্জন, সুধাংশু, বরদা, বিদ্যুৎকমল কেউ তো বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগদান করেনি। এরা সবাই নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে ব্যস্ত। তুই শুধু আচার্যের খপ্পরে পড়লি! আমি অঙ্ক করে বেশিদূর কিছু করতে পারতাম না। বড়জোর মাস্টারি। কিন্তু চাকরির বাজারে কেমিস্টের কী ডিম্যান্ড। সারাজীবন এই বোকামির জন্য কষ্ট পাবি।"

হেমছায়া চাকরি ছাড়ার কথা শুনে স্তম্ভিত। বুঝলেন দারিদ্র্যই এর পর থেকে নিত্যসঙ্গী হবে। তবু ছোট করলেন না আনন্দশেখরের আদর্শকে। বহুযুগ পরে আনন্দশেখর বুঝতে পেরেছিলেন যতিশেখর ঠিক কথাই বলেছিলেন। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আনন্দশেখর হেমছায়াকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন নতুন সংসার শুরু করতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। এই ডামাডোলের মধ্যে মনের মতো বাড়ি পেলেন হেমছায়া পানিহাটিতে। গঙ্গার পাশেই এক জমিদারের বাগানবাড়ি— লাল দোতলা বাড়ি। ভাড়া মাত্র পনেরো টাকা। বাড়ির সঙ্গে আছে কারুকার্যকরা

পালঙ্ক, শ্বেতপাথরের টেবিল, বার্মা টিকের ফার্নিচার— সবই এই পনেরো টাকা ভাড়ার মধ্যে। বাড়ির সামনেই বাঁধানো ঘাট। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। সকালবেলা এক চেনা মাঝি মাছ দিয়ে যায়— টাটকা মাছ— রুই, কাতলা, চিংড়ি। বর্ষার সময় ইলিশ। প্রচুর গাছপালা চারিদিকে। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি, জানলায় রঙিন কাচ। সামনেই ফুলের বাগান, তাতে সাজানো রয়েছে লোহার গোলটেবিল ও চারটে চেয়ার। একটা নিচু গাছের ডালে দোলনা ঝোলানো। তার পাশেই বকুল গাছ উঁচু হয়ে উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভোরবেলা অসংখ্য ফুল পড়ে থাকে। হেমছায়ার ভাল লাগে ফুল তুলতে, মালা গাঁথতে। এখানে গঙ্গা বেশ চওড়া। ওপারটা অস্পষ্ট, আবছা হয়ে যায়। গোধূলিতে যখন সূর্য ডোবে পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে যায়। মনে হয় কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন হেমছায়া— কী করে লাল থালার সূর্যটা মিলিয়ে যায় দিগন্তের নীচে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামে। একটা-দুটো তারা ফোটে আকাশে। ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায়। দূরে পালতোলা নৌকো ভেসে যায়— সন্ধ্যার অন্ধকারে। ছায়ার মতো নৌকোগুলো লাগে। দূর থেকে ভেসে আসে মাঝিমাল্লার গান। কেমন যেন দুঃখ মেশানো সেই উদাসী গানে। হেমছায়া জানে না এরা কোথায় যাচ্ছে— কী নিয়ে বেসাতি করে। গুনগুন করে গান করেন হেমছায়া। এত বড় বাড়ি সব চুপচাপ। শিকারপুরে তবু কথা বলার লোক ছিল। এখানে হেমছায়া বড়ই একা।

আনন্দশেখর বাড়ি ফেরেন দেরি করে। প্রতিদিনই রাত আটটা বেজে যায়। বেরিয়ে যান ভোরবেলা সাতটার মধ্যেই। প্রচণ্ড কাজের চাপ আনন্দশেখরের। অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র। নিজের হাতে আনন্দশেখর গড়ে তুলছেন সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট। দু'রকম প্রক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে অ্যাসিড। খুব সাবধানে বিরাট বিরাট চিনামাটি আর কাচের বোতলে অ্যাসিড ভরা হচ্ছে। দেশ গড়ার কাজে সালফিউরিক অ্যাসিডের চাহিদা প্রচুর। আনন্দশেখর এক ছুটির দিনে হেমছায়াকে অ্যাসিড ফ্যাক্টরি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিরাট ফ্যাক্টরি। বারবার সাবধান করে দিচ্ছিলেন হেমছায়াকে "ভীষণ করোসিভ এই সালফিউরিক অ্যাসিড। একটু হাত লাগলেই পুড়ে ফোস্কা পড়ে যাবে। এক্ফোঁটা শাড়িতে পড়লে গর্ত হবে যাবে।" চোখ নাক জ্বলছিল অ্যাসিডের কড়া গন্ধে। বিরাট চিমনি দিয়ে দূষিত ধোঁয়া বের হচ্ছিল। হেমছায়া সাবধানে দেখেন আনন্দশেখরের কর্মযজ্ঞ। মনে মনে আশঙ্কা করেন, আনন্দশেখরের কোনও ক্ষতি হবে না তো এই বিষাক্ত পরিবেশে।

কাজ আর কাজ। আনন্দশেখর কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। ছুটির দিনে দলবেঁধে পুরনো বন্ধুরা আসেন পানিহাটির বাগানবাড়িতে। সঙ্গে তাঁদের বউ আর কচি বাচ্চা। হঠাৎ যেন গমগম করে ওঠে বাড়িটা। এর মধ্যে নিয়মিত

আসতেন সুধাংশু চৌধুরী, রুণু ব্যানার্জি, আর পুরনো মেসের কিছু বন্ধু। দিলরুবা বাজাতেন সুধাংশু। ভীষণ মিষ্টি হাত। গান গাইতেন গলা খুলে। গাইতেন হেমছায়া, সঙ্গে বেহালায় আনন্দশেখর। গাইতেন বন্ধুদের বউরা। সারারাত্রি হইচই, গানবাজনা খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব। এইসব ছুটির দিনে হেমছায়া পুরনো আনন্দশেখরকে খুঁজে পেতেন। প্রচণ্ড উৎসাহে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন আনন্দশেখর। সপ্তাহ শুরু হলে আবার সেই কাজের মধ্যে নিমগ্ন। আনন্দশেখর তখন দূরের মানুষ।

১৯৪১-এর জুনে কেয়ার জন্ম হল। হেমছায়া এখন ব্যস্ত মেয়েকে নিয়ে। কী করে সময় কেটে যায় বুঝতে পারেন না। আনন্দশেখর আগের মতো দেরি করে বাড়ি ফেরেন। বেশ ক্লান্ত দেখায় আনন্দশেখরকে। মেয়ে তখন গভীর ঘুমে। শিকারপুরের বাড়ি থেকে ছোট ভাই বোন সব ঘুরে গেছে কলকাতায়। আনন্দশেখর ওদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। বিধুশেখর অস্থির হয়ে উঠেছেন বড় মেয়ে লীনার বিয়ের জন্য। লীনা থেকে গেল পানিহাটিতে বউদির কাছে। সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে লীনার জন্য।

শ্যামাপদ ওর ছোটভাইকে নিয়ে লীনাকে দেখতে এসেছিল। সুন্দর চেহারা শ্যামাপদর। লীনার গান শুনে মুগ্ধ। পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর শ্যামাপদ। শৌখিন লোক। নিজেও ভাল গান গায়। হেমছায়ার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা হয়ে গেল লীনাকে দেখতে এসে। যাবার সময় বলে, "বউদি, লীনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করুন। আমি হয়তো শিগগিরই কোথাও বদলি হয়ে যাব কলকাতা থেকে দূরে মেদিনীপুরে।"

সেদিন সকাল থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। বাইশে শ্রাবণ। হাতিবাগানের নলিনী সরকার স্ট্রিটে একটা বাড়ি ভাড়া করে লীনার বিয়ে হচ্ছে। প্রচুর লোকজন. আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। এই আনন্দের মধ্যে কে খবর দিল রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। রেডিয়োতে শোনানো হচ্ছে তাঁর গান, শোকমিছিলের বর্ণনা। নিমতলা ঘাটে শেষকৃত্য। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অনেক বাঙালির কাছে ব্যক্তিগত শোক মনে হয়েছিল। যতিশেখরের বাড়ি কাছেই। কবির একটা বড় বাঁধানো ছবি ছিল' সেই ছবিটা নিয়ে এল বিয়ে বাড়িতে। ছবির সামনে সাজিয়ে দিলেন ফুলের গুচ্ছ। বিয়ের রাতে হেমছায়া, লীনা আর বীণা অনেক রবীন্দ্রসংগীত গাইল শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে।

চারিদিকে যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে জাপানি বোমা পড়ল কলকাতায় ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে। দলে দলে লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে গ্রামের দিকে, পশ্চিমী শহরে। চারিদিকে থমথমে ভাব। রাস্তাঘাটে লোকজন কম। দোকান বাজার টিমটিম করছে। আনন্দশেখর যতদিন পারলেন পানিহাটিতে থাকলেন বাগানবাড়িতে। ফ্যাক্টরি বন্ধ করা যাবে না। লোকজনের

যাতায়াত বন্ধ। বন্ধুরা সব চলে গেছে কলকাতা ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায়। কেমন যেন এক ভৌতিক বাড়ি হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মিলিটারির জিপ চলে যায় সাইরেন বাজিয়ে। ইলেকট্রিক আলো জ্বালানো নিষেধ। সমস্ত জানলা দরজা কাগজ দিয়ে সেঁটে রাখা হয়েছে যাতে রাতের লণ্ঠনের আলো বাইরে না যায়। বোমার শব্দে কাচ যেন ভেঙে না যায়। রেডিয়োতে সব সময় সতর্কবাণী। বোমার শব্দে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। সবাইকে সবসময় কানে তুলো দিয়ে রাখতে বলেছে। থেকে থেকে সাগরপারের যুদ্ধের বর্ণনা— হিটলারের পূর্ব ইউরোপ দখল— জাপানের দখল সিঙ্গাপুর। মনে পড়ছে কবির ভবিষ্যৎবাণী—"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী।" যুদ্ধের কালোছায়া নেমে এসেছে। কলকাতা ও তার চারপাশ এখন বিপজ্জনক। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। আর বোধহয় এখানে থাকা ঠিক হবে না। আনন্দশেখর হেমছায়া ও কেয়াকে নিয়ে উঠলেন বরিশালে শ্বশুর বাড়িতে। কেয়া যাতে সবার মাঝে বড় হয়। বেশ কিছুদিন থেকে একা একাই ফিরে এলেন আনন্দশেখর— পানিহাটিতে।

যতিশেখর ফিরে এসেছেন শিকারপুরের বাড়িতে। সবাইকে নিয়ে গল্প করেন নেতাজীর বীরত্ব, নেতাজীর দেশপ্রেম নিয়ে। যতিশেখর যোগদান করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লকে। সুভাষের ওপরে গান্ধীর উদাসীনতা ও জওহরলালের ওপর পক্ষপাতিত্বে বাঙালি ক্ষুব্ধ, দুঃখিত। যতিশেখর আজাদ-হিন্দ ফৌজের গল্প করেন ভাইবোনদের। "এবার সত্যিকারের দেশ স্বাধীন হবে। কোহিমা দিয়ে সুভাষের নেতৃত্বে বিজয় কেতন উড়িয়ে আসছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। "চলো দিল্লি পুকারকে।"

চল্লিশের দশক অশান্ত হয়ে উঠছে। এল ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লব। গান্ধী ডাক দিয়েছেন "ভারত ছাড়" আন্দোলনে। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।" দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে সবাই। আনন্দশেখর ব্যস্ত অ্যাসিড প্ল্যান্টে। দিনরাত খেটে চলেছেন সেখানে। রাতে ঘুমতে পারেন না আনন্দশেখর, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট। অ্যাসিড প্ল্যান্টে কাজ করার সময় ফুসফুসটা চিরকালের জন্য জখম হয়ে গেছে সালফার ডাই অক্সাইডের ধোঁয়ায়। ওর এক সহকর্মী কাজ করতে গিয়ে একটু অসাবধানতার জন্য মারা গেছেন অ্যাসিডের চৌবাচ্চায় পড়ে। সারা শরীর গলে গিয়েছিল অ্যাসিডে। হেমছায়া খবরটা শুনে বলেন, "দোহাই তোমার, এই সর্বনাশা চাকরি ছেড়ে দাও।"

প্রফুল্লচন্দ্র একদিন ডেকে পাঠালেন আনন্দশেখরকে। শুনেছেন আনন্দশেখরের অসুস্থতা। বুঝতে পারলেন বেশিদিন ওখানে আনন্দশেখরের কাজ করা ঠিক হবে না। বিদেশে এইসব বিষাক্ত মারাত্মক পরিবেশে কাজ করার জন্য নানা ধরনের সতর্কতার ব্যবস্থা আছে— নানাধরনের মাস্ক, প্রোটেকটিভ রেসপিরেটর। স্বদেশী কোম্পানিতে সে সব সম্ভব নয়। তার জন্য অনেক খরচ। এখানে জীবনের দাম অল্প। আচার্য খুব খুশি আনন্দশেখর অ্যাসিড প্ল্যান্টটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ

স্নেহের সঙ্গে বললেন, "তোর আর পানিহাটিতে কাজ করা উচিত নয়। এবার তুই বেলেঘাটা অফিসে লেগে যা। পেট্রোকেমিক্যালস থেকে তৈরি কর ফিনাইল, ন্যাপথালিন, ব্লিচিং পাউডার। দেশ গড়ার কাজে লাগবে।"

এ-সব কাজও শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক— ক্যানসার হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা এইসব পেট্রোকেমিক্যালস থেকে। তবু গুরুর কথা শিরোধার্য করে নিলেন আনন্দশেখর। পানিহাটির বাড়ি ছেড়ে উল্টোডাঙায় একটা বাড়ি ভাড়া করলেন। যতিশেখরের বাড়িও কাছে। আশেপাশে অনেক আত্মীয়স্বজন। হেমছায়া ও কেয়াকে নিয়ে এলেন বরিশাল থেকে। দোতলা বাড়ি— কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে। দোকান বাজার সবই কাছাকাছি। ছোটোর মধ্যে মন্দ বাড়ি নয়। নতুন করে সংসার পাতেন হেমছায়া। পানিহাটির মতো নির্বাসন এই বাড়িতে নেই। লোকজন, আত্মীয়স্বজনের যাতায়াতে বাড়িটা আবার গমগম করে উঠল।

ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও চলছে। এর মধ্যে ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশের মন্বন্তর শুরু হল। চারিদিকে হাহাকার। ইংরেজের তৈরি এই দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধের জন্য সব খাবার মজুত করে রেখেছে সৈন্যদের জন্য। রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লোকের মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে। সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে গেছে। চারিদিকে কঙ্কালসার দেহ, হাতে অ্যালুমিনিয়মের বাটি। "একটু ফ্যান দাও মা, কতদিন খাইনি।" —বাড়ির দরজায় দরজায় দিনরাত আর্তনাদ। পনেরো লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা গেল বাংলার এই মন্বন্তরে। এর মধ্যে জন্ম হল অনির্বাণের ২৬ জুন। হেমছায়া কেয়া আর অনির্বাণকে নিয়ে একা একা বাড়িতে থাকেন। আনন্দশেখর ঠিক করেছিলেন ছেলেদের নাম স্বরবর্ণ দিয়ে দেবেন। মেয়েদের নাম ব্যঞ্জনবর্ণে।

হেমছায়া দুপুরবেলা কেয়া আর অনিকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে থাকেন। ভয় লাগে থমথমে পরিবেশ। জানলার খড়খড়ি দিয়ে প্রেতের মতো কঙ্কালসার মানুষ দেখেন বাড়ির চারপাশে। উঁকিঝুঁকি মারে সেইসব অভুক্ত, অনাহারীর দল। মাঝে মাঝে কাজের মেয়েটাকে দিয়ে বেশি ভাত রান্না করেন অভুক্ত বাচ্চাদের জন্য। অনি ও কেয়াকে দেখে অপুষ্ট বাচ্চাদের জন্য কষ্ট পান হেমছায়া। একদিন হেমছায়া আনন্দশেখরকে বলেন, "চোখের সামনে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু দেখতে পারছি না। আমার ভয় করছে এখানে থাকতে। আমাকে বরিশালে নিয়ে চলো। ওখানে তবু কলকাতার মতো এমন দুর্দশা নয়। সবার মাঝে থাকতে পারব। কেয়া আর অনি ওখানে বড় হোক। চাকরির জন্য কলকাতায় তোমাকে তো থাকতেই হবে। কেয়া আর অনিকে আমি দেশের বাড়িতে বড় করি। ছুটি পেলেই চলে আসবে বরিশালে।" বরিশাল আর কলকাতা করতে করতে আরও দুবছর কেটে গেল আনন্দশেখরের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। মিত্রপক্ষের হয়ে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন

ত্বরান্বিত হচ্ছে। এর মধ্যে জিন্না দাবি তুলেছেন মুসলমানদের জন্য নতুন দেশ "পাকিস্তান"— মানে পবিত্রভূমি। ভারত দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে। গান্ধী ক্ষুব্ধ, দুঃখিত। যার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করলেন, সব-কিছুই এখন মিথ্যে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বাধীনতার নামে তাঁর দেহ কেউ দু'ভাগ করে দিয়েছে। মনে প্রাণে ক্লান্ত গান্ধী, সব দিক থেকেই হেরে গেছেন। জিন্না আর জওহরলাল দেশ ভাগাভাগিতে ব্যস্ত। গান্ধী এর মধ্যে নেই। কেমন যেন একা হয়ে গেছেন।

জিন্নার মৌলবাদী ডাকে সারা দিলেন— সুরাবর্দি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে ও ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটের বিরোধিতা করে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা। সংঘর্ষের সূত্রপাত এখান থেকেই। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় আগুন জ্বলে ওঠে। শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পাড়ায় পাড়ায় ধর্মের নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলছে। মৃত মানুষের লাশে স্তূপাকার হয়ে আছে রাস্তা। রাতে গঙ্গার জলে তাদের ভাসিয়ে দেয়া হয়। কলকাতা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল নোয়াখালিতে, পূর্ববাংলার বিভিন্ন জায়গায়। হাজার হাজার লোক মারা পড়ল। সাধারণ লোক মা, বাবা, ভাই বোন, শিশুসন্তান কিছুই বাছবিচার নেই। হিন্দু মুসলমান বহু শতাব্দী ধরে একসঙ্গে বাস করেছে। ধর্মের নামে এরাই এখন প্রধান শত্রু হয়ে গেল। উদ্দেশ্য একটাই। দেশভাগ হয়ে যাক। মুসলমানরা তৈরি করতে পারবে পাকিস্তান। হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তি গান্ধী আর দেখতে পারছেন না। নোয়াখালিতে ছুটে এলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন মানু আর আভার কাঁধে ভর করে। বয়স হয়েছে গান্ধীর। আপনমনে রবীন্দ্রনাথের গান করেন।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।'

সত্যিই বড় একলা হয়ে গেছেন গান্ধী। নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন গান্ধী। দেখলেন মানুষের পাশবিক চেহারা। ধর্মের নামে মানুষ এখন বীভৎস হয়ে গেছে। কাকে দোষ দেবেন? যুক্তি তর্ক কিছু দিয়েই আশ্বাস দিতে পারছেন না। একমাত্র অস্ত্র নিজের জীবন। আমরণ উপোষ শুরু করলেন গান্ধীজী। এতদিন পরে দেশের লোকের টনক নড়ল। থেমে গেল এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। শেষ চেষ্টা করছেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেছে এর মধ্যেই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরকালের জন্য বিরাট ফাটল তৈরি হয়ে গেল। গান্ধীর সাধ্য কী সেই ফাটল জোড়া দেবার। হিন্দুরা পূর্ব বাংলায় আতঙ্কিত। হিন্দু নিধনে উন্মত্ত এই মুসলমানেরা। হাতে তরোয়াল, ছুরি, লেজা, সড়কি, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। স্রোতের মতো লোক নিজেদের এতদিনের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় চলে আসে। শিয়ালদা স্টেশনে জায়গা নিয়ে

কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এত বড় শহরে আশ্রয় খোঁজে। রাতারাতি হাজার হাজার লোক হয়ে গেল উদ্বাস্তু। প্রাক্ স্বাধীনতার প্রথম ঝরা ফসল এই শরণার্থীর দল।

সুধাংশু এর মধ্যে একটা ভাল ফ্ল্যাটের খবর নিয়ে এলেন। ওঁদের পাশের ফ্ল্যাটটা খালি হয়েছে। ভাড়া খুবই কম। কুড়ি টাকার মতন। শ্যামবাজারের পরেশনাথ মন্দিরের গায়েই "শ্রীনাথ ভবন"। বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটে। বিরাট চারতলা বাড়ি। একতলায় সামনের দিকে ফ্ল্যাটে থাকেন সুধাংশু। সামনে জানলা দিয়ে দেখা যায় রাস্তা— দুটো মন্দির। পেছনের ফ্ল্যাটটা ফাঁকা। এই ফ্ল্যাটে চলে এলেন আনন্দশেখর। দু'বন্ধু পাশাপাশি এখন। ছেলেমেয়েদের বড় করার পরিকল্পনা করেন হেমছায়া সুধাংশুর স্ত্রীর সঙ্গে। স্নেহর দুই মেয়ে। বয়সে ওরা কেয়া আর অনির চেয়ে ছোট। সত্যি সুন্দর বাড়িটা। ট্রাম বাস বাজার সবই কাছাকাছি। দুটো ঘর, বারান্দা রান্না ঘর। বাথরুম। এ ছাড়া চারতলায় বিরাট ছাদ।

সন্ধেবেলায় সবাই ছাদে গিয়ে গল্প করে। পরেশনাথ মন্দিরের ভেতরটা দেখা যায় ছাদ থেকে। দেশ বিদেশ থেকে কত লোক আসে এই মন্দির দেখতে। সব সময় হইচই— মেলার মতন। একটা জিপ সকালবেলা সুধাংশুকে অফিসে নিয়ে যায়। ছুটির দিন মাঝে মাঝে সুধাংশু গাড়ি করে দুই পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যান চিড়িয়াখানা, গঙ্গার পাড়, বটানিক্যাল গার্ডেন, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়।

১৯৪৬-এর কলকাতায় রায়টের দিন জন্ম হল আকাশের, হেমছায়ার তৃতীয় সন্তান। ১৬ আগস্ট। চারিদিক থমথমে ভাব। রাত্রিবেলা থেকে থেকে চিৎকার হচ্ছে "আল্লা হো আকবর।" সামনেই লালাবাগানের মুসলমানপট্টিতে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হেমছায়া দরজা জানালা বন্ধ করে রাখেন। রাস্তায় রাস্তায় বীভৎসভাবে পড়ে আছে হিন্দু-মুসলমানের রক্তাক্ত দেহ। চিল শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যতিশেখর তাঁর সংসার নিয়ে উঠলেন আনন্দশেখরের বাড়িতে। ওঁদের পাড়াটা এখন নিরাপদ নয়। একটা ঘর ছেড়ে দিলেন যতিশেখরের জন্য।

পূর্ববাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে হাজার হাজার সংখ্যালঘু হিন্দু কলকাতায় এসে ভিড় করেছে। শিয়ালদা স্টেশনে থই থই করছে লোক। বেশ-কিছু চেনাজানা আত্মীয়স্বজন ভিড় করেছে আনন্দশেখরের ফ্ল্যাটে। শিয়ালদা কাছে বলেই হেঁটে হেঁটে অনেকেই চলে আসে আনন্দশেখরের কাছে। মানুষের এই দুর্দশা চোখে দেখা যায় না। এত বছরের বাড়িঘর, জমিজমা, সম্পদ সৌহার্দ্য সব বিসর্জন দিয়ে রিক্ত হাতে আনন্দশেখরের ফ্ল্যাটে ওঠে। ওপরে বড় ছাদ থাকাতে অনেকেই রাতে সেখানে কাটায়। দিনেরবেলা পরেশনাথ মন্দিরে ঘোরাঘুরি করে। জানে এটা সাময়িক আশ্রয়। সারাদিন নমিতা আর হেমছায়া রান্নাঘরে ব্যস্ত। এতজন আশ্রিতের জন্য রান্না করতে হয়। কেউ কেউ সঙ্গে নিয়ে এল সংক্রামক রোগ— কলেরা। শরণার্থীদের মধ্যে দু'জন বাচ্চা মরে গেল কলেরায়। মারা গেল

যতিশেখরের মেজো ছেলে দেবু। নমিতা শোকাহত। কর্পোরেশনের লোক ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সারা বাড়িটা পরিষ্কার করে গেল। "একই বাড়িতে তিন-তিনটে ছেলে কলেরায় মারা গেছে— আপনারা আর পূর্ব বাংলা থেকে আসা কাউকে ঘরে রাখবেন না। হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। আপনারা জল ফুটিয়ে খাবেন।" হেমছায়া শঙ্কিত। নিজেদের বাচ্চাদের আগলে রাখেন। কলকাতা জনাকীর্ণ হয়ে গেল। শিয়ালদা স্টেশনে অগণিত লোক আশ্রয় নিল যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই। এই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের নতুন নাম হল "উদ্বাস্তু"। কলকাতা ভরে গেল উদ্বাস্তুতে।

এই রায়টের মধ্যে এলেন হেমছায়ার দূর সম্পর্কের ভাই নলিনীরঞ্জন। মিলিটারি ক্যাপ্টেন— বার্মা থেকে। রেঙ্গুন ইভাকুয়িদের সঙ্গে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে বউ ও তিন-তিনটে ফুটফুটে ছেলে। নলিনীর জলপাইরঙা সবুজ মিলিটারি ড্রেস। হোলস্টারে পিস্তল— মাথায় টুপি, পকেট ভর্তি টাকা। জিপ চালিয়ে বাজার করে নিয়ে আসেন। ছোটদের জন্য চকোলেট। রাতে রোমহর্ষক গল্প। কী করে বার্মার সীমান্ত থেকে আরাকানের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন। কখনও হেঁটে, কখনও নৌকোয়, এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় গেছেন। নলিনী থাকাতে রায়টের মধ্যেও সবাই একটু নিশ্চিন্ত। মিলিটারি প্রোটেকশন। মনের শান্তি।

কিছুদিনের মধ্যে মুসলমান পাড়ায় লালাবাগানে জলের দরে একটা বিরাট বাড়ি কিনে ফেললেন নলিনী। সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন গৃহপ্রবেশের দিন। নলিনী জানেন কী করে হইচই করতে হয়। সারারাত ধরে গান-বাজনা হবে নতুন বাড়িতে। জিপে করে নিয়ে গেলেন বাড়ির বউ ও বাচ্চাদের। আনন্দশেখর, যতিশেখর ও সুধাংশু নতুন বাড়িতে এলেন হেঁটে, সন্ধের ঠিক আগেই।

বিরাট বাড়ি। কোনও নবাবের মঞ্জিল ছিল বোধহয়। অসংখ্য ঘর। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলছে। দরাজ মন নলিনীর। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে। ইচ্ছে হলে আনন্দশেখর ও যতিশেখর এই বাড়িতে থাকতে পারেন যতদিন না কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক হয়। বাবুর্চি দিয়ে রান্না করিয়েছেন নলিনী— বিরিয়ানি, চপ, কাটলেট, মাছ, মাংস— নানাধরনের মিষ্টি। বিরাট ফরাস পাতা প্রতি ঘরে। বাচ্চারা খেয়ে-দেয়ে ফরাসে শুয়ে পড়ল। বড়রা তার পর খেতে গেল। হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচি, হাসি। এই ভয়ংকর রায়টের মধ্যে মনের আনন্দে চার পরিবার কথা বলতে পেরে খুব খুশি।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে রাত এগারোটা বাজল। এর পর এল মিষ্টি পান, দামি সিগারেট। এবার সারারাত ধরে গানবাজনা হবে। তার প্রস্তুতি চলছে। সুধাংশু দিলরুবায় সুর বাঁধছেন, আনন্দশেখর বেহালার তারগুলো মিলিয়ে নিলেন। যতিশেখর বাঁধলেন তবলাটা। হেমছায়া গান শুরু করবেন। সবাই গোল

হয়ে বসেছে। হঠাৎ নমিতা বলে ওঠেন—“এখন যদি কেউ আল্লা-হো-আকবর বলে ওঠে!”

সত্যিই তাই। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট মিছিলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্রমশই আওয়াজটা জোরে হচ্ছে। অনেক লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, “আল্লা-হো-আকবর।” নলিনী মিলিটারির লোক। তড়াক করে পিস্তলটা নিয়ে ছাদে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে যতিশেখর, আনন্দশেখর ও সুধাংশু উঠলেন। হেমছায়া জানলা দিয়ে দেখেন অনেক লোক ভিড় করে আছে। ভয়ে ভয়ে জানলাগুলো বন্ধ করে দেন। ছাদের ওপর থেকে নলিনী দেখলেন ওঁর নতুন বাড়ি ঘিরে ধরেছে মুসলমানেরা— হাতে বিরাট মশাল, লাঠি, তরোয়াল। মনে হচ্ছে সারা বাড়িটা আগুন জ্বালিয়ে দেবে। আকাশের দিকে কয়েকবার গুলি করলেন নলিনী। ভয় দেখাচ্ছেন মুসলমানদের। সবাইকে নিয়ে নেবে এলেন। মেয়েরা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। বাচ্চারা কেউ কেউ ঘুম থেকে উঠে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

নলিনী মিলিটারি কায়দায় বলে ওঠেন—“ভয়ের কিছু নেই। এই মুহূর্তে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি সব আটঘাট জানি এ বাড়ির। সুধাংশু, তোমার দিলরুবাটা নিতে পার, যতিশেখর তোমার তবলা, আনন্দ তোমার বেহালা। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। বউরা যে যার বাচ্চাকে কোলে করে চুপিচুপি আমাকে ফলো করো। কোনও কথা নয়। পাশেই একটা টেক্সটাইল মিল। তার নেপালি দারোয়ানের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। কোনওরকম চিৎকার, চেঁচামেচি নয়। আমরা পেছনের সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামব। সামনের দরজায় ওরা ছোরা বন্দুক নিয়ে আছে। মনে হচ্ছে বাড়িটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। মুসলমান পাড়ায় হিন্দুর বাড়ি রাখতে দেবে না।”

লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সবাই নামল সাবধানে বাড়ির পেছনের উঠোনে। সামনে বিরাট দেয়াল। তার ওপরে তারকাটা দিয়ে ঘেরা। টপকানো সম্ভব নয়। নলিনী অবলীলাক্রমে দেয়াল ডিঙিয়ে ওপারে চলে গেলেন। “আমি এক্ষুনি ফিরছি একটা মই নিয়ে। সবাই একদম চুপচাপ।” বাইরের দরজায় ক্রমশই জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে। ওরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। সবাই ভয়ে আতঙ্কিত। এই বুঝি মুসলমানেরা এসে পড়ল লাঠিসোটা বল্লম নিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নলিনী ফিরে এলেন। সঙ্গে নেপালি দারোয়ান। দুটো বড় বড় মই দেয়ালের দু’পাশে রাখা হল। নলিনী দেয়াল টপকে এপারে চলে এলেন। এক এক করে মেয়েরা বউরা প্রথম সিঁড়ি দিয়ে উঠল, তার পর বাচ্চাদের নিয়ে নলিনী, সুধাংশু, আনন্দ ও যতিশেখর। উলটোদিকের নেপালি দারোয়ান যত্নে সবাইকে নামিয়ে নিচ্ছে। আস্তে আস্তে সবাই দেয়ালটা পার হয়ে গেল। মইদুটো সরিয়ে নেওয়া হল।

মিলের বিরাট হলঘরে কম্বল পাতা হল। সবাই ক্লান্ত, শ্রান্ত। ভয়ে সিঁটিয়ে

গেছে। নলিনী বললেন--- "রাত শেষ হতে বেশি দেরি নেই— তোমরা সব ঘুমিয়ে পড়ো। সকাল হলে দেখা যাবে কী করা যায়।" আস্তে আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরের দিকে চিৎকার চেঁচামেচিতে সবার ঘুম ভাঙল। সবাই হলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। নলিনীর নতুন বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। নলিনী হাসতে হাসতে বলে—"থ্যাঙ্ক গড, আমরা সবাই বেঁচে গেছি। পাঁচিল টপকে না বেরতে পারলে জতুগৃহর মতো সবাই পুড়ে মরতাম।" বেলা পড়লে নলিনী সবাইকে নিয়ে জিপে করে বারবার যাতায়াত করে আনন্দশেখরের বাড়িতে ফিরলেন। রাস্তা থমথম করছে। কোনও লোক নেই। সবাই বাড়ি ফিরে এসে নিশ্চিন্ত। কিছুদিনের মধ্যেই নলিনী বদলি হয়ে গেলেন কলকাতার বাইরে।

অনি এ গল্প অনেকবার ওর মা'র মুখে শুনেছে। আবছা আবছা রায়টের ঘটনা মনে পড়ে। মনে পড়ে এর কিছুদিনের মধ্যেই বিধুশেখর শিকারপুরের পাট চুকিয়ে সবাইকে নিয়ে আনন্দশেখরের কাছে এসে উঠলেন। বাড়ি ভরতি লোক। বড় মেয়ে লীনার বিয়ে হয়ে গেছে। আরও তিন মেয়ের কথা ভাবেন বিধুশেখর— বীণা, ইনা আর নীনার কথা। মেয়ে-বউদের নিয়ে পূর্ব বাংলায় থাকা এখন নিরাপদ নয়। এ ছাড়া দুই ছেলে অজয় আর বিজয়ের কথা ভাবতে হবে। ওদের স্কুলে ভর্তি করা দরকার। ঘরে ঠাসাঠাসি লোক। নমিতা আর হেমছায়ার বেশির ভাগ সময় কাটে রান্নাঘরে। এতবড় সংসার চালাবার দায়িত্ব এদের। আকাশ মাকে কাছে পায় না বলে কান্নাকাটি করে। কেয়া কোলে করে ছোট ভাইকে গান শুনিয়ে শান্ত করে। গান শুনলে চুপ করে থাকে আকাশ।

এর মধ্যে কে খবর দিল রাস্তার মোড়েই একটা ছোট্ট দোকান খালি। যে-কেউ দখল করতে পারে এই দোকান। মুসলমান মালিক ভয়ে দোকান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। শুনেই বিধুশেখর বলেন— "আমি এই দোকানটা দখল করে চালাব।"

আনন্দশেখর হাসতে হাসতে বলেন— "বাবা, তুমি কখনও ব্যাবসা করোনি, রাস্তার ওপরে মন্দিরের সামনে দোকান চালানো খুবই কষ্টকর। কতরকম খদ্দের আসবে। ব্যাবসা আমাদের রক্তে নেই। দোকান জবরদখল করা ভুলে যাও। তুমি বরঞ্চ বাচ্চাদের পড়াশুনা করাও।"

বিধুশেখর উত্তেজিত হয়ে বলেন—"মুসলমানেরা আমার শিকারপুরের সমস্ত জায়গা, জমি, বাড়ি দখল করে নিয়েছে। আজ আমি নিঃস্ব। আমার মাথা গোঁজবার কোনও জায়গা নেই। আমি এর বদলা চাই। এই দোকান আমার চাই। লাভ-লোকসানের জন্য নয়। মনের শান্তির জন্য।" এই বলে বিধুশেখর নিজের ট্রাঙ্কটা খুলে একটা বড় তালাচাবি বের করে বেরিয়ে যান। একটু পরে ফিরে হাসতে হাসতে বলেন—"দোকানে তালা লাগিয়ে এলাম। এই দোকানের মালিক এখন বিধুশেখর।"

আনন্দশেখর বাবাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন—"বাবা, তুমি ডাব কাটতে পার?"

"নিশ্চয়ই পারি। আমার জন্য একটা ভাল ধারালো দা নিয়ে আয়— দেখিয়ে দেব কী করে ডাব কাটতে হয়।" রাত্রিবেলা আনন্দশেখর একটা ধারালো ছোরা নিয়ে এলেন। বাড়ির সবার কী উত্তেজনা। অনি ছোরাটা নিয়ে ভাবল এবার আর কোনও মুসলমান মারতে পারবে না। নলিনীমামার বাড়ির লকলকে আগুন ও ভুলতে পারেনি। আনন্দশেখর বিজ্ঞানী, একটা ডাব নিয়ে এসেছেন পরীক্ষা নেবার জন্য। বিধুশেখরকে ডাকলেন—"বাবা, ডাবটা কাটো তো!"

এ যেন এক বিরাট পরীক্ষা। বাচ্চারা দাদুকে ঘিরে। বউরা, মেয়েরা মুখ টিপে হাসছে। বিধুশেখর বাঁ হাতে ডাবটা নিলেন কায়দা করে। এবার ধারালো ছোরাটা দিয়ে কাটতে চেষ্টা করছেন। দু'-দু'বার ডাবটা হাত থেকে পড়ে গেল। বাচ্চারা উৎসাহ দিচ্ছে—"দাদু, তুমি নিশ্চয়ই পারবে, কেটে যাও।"

"আমি কি ভুল করে ডাবের উলটো দিকটা কাটছি"— নিজের মনেই বলে ওঠেন বিধুশেখর। ডাবটা ঘুরিয়ে এবার উলটোদিক থেকে কাটা শুরু করলেন। সবাই মুচকি মুচকি হাসছে। আনন্দশেখর ঘড়ির দিকে। "বাবা, কুড়ি মিনিট হয়ে গেল, ডাব থেকে এখনও জল বার হয়নি।"

"বুঝলি আনন্দ, ডাবটা বোধহয় নারকোল হয়ে গেছে। আমার দোকানে থাকবে কচি ডাব। পেনসিল কাটা ছুড়ি দিয়েই কেটে ফেলতে পারব। কথায় বলে না, 'প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট', একমাস পরে দেখবি পনেরো সেকেন্ডের বেশি একটা ডাব কাটতে আমার লাগবে না।"

ভোর না হতেই দোকান খুললেন বিধুশেখর। ছোট্ট খুপড়ির মধ্যে উঠলেন কষ্ট করে। সারি সারি সোডার বোতল। গুনলেন ক'টা আছে। একটা কাগজে হিসেব করছেন দোকানে কী কী আছে। পানগুলো শুকিয়ে আছে। বাজার থেকে নতুন পান কিনতে হবে। পরপর সাজানো বৈয়মে আছে বিস্কুট, লজেন্স, হজমিগুলি, চানাচুর। বিরাট একটা পেতলের পাটাতন। বাঁ হাতে পরপর সাজানো আছে সিগারেটের প্যাকেট— ক্যাপস্টান, কাঁচি, উইলস্। পাশেই বেশ-কিছু দেশলাই। একটা দেশলাই খুলে লম্বা ঝোলানো দড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিলেন, যাতে খদ্দেরের সুবিধে হয় সিগারেট ধরাতে। দেয়ালে একটা কোনও-এক মসজিদের ছবি— হয়তো মক্কা বা মদিনার। ছবিটা নামিয়ে রাখলেন। ওখানে একটা মা লক্ষ্মীর ছবি টানাবেন ঠিক করলেন।

বিধুশেখরকে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়ে আছে ভলান্টিয়ারের দল— গোটা চারেক নাতি-নাতনি। যতিশেখরের দুই সন্তান— মালা আর শিবু। আনন্দশেখরের দু'জন— কেয়া আর অনি। এদের বয়েস তিন থেকে আটের মধ্যে। মালা সবচেয়ে বড়, অনি সবার ছোট। এরা দোকানের সামনে স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে।

খদ্দের এলেই যাতে দাদুকে জানাতে পারে। ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেছে। ভলান্টিয়াররা আশাহত। পরেশনাথ মন্দিরের সামনে এত ভাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও দোকানে কিছু বিক্রি হচ্ছে না দেখে। এর মধ্যে একটা লোক ঢেকুর তুলতে তুলতে দোকানে এল। সবাই খুব উত্তেজিত।

"একটা সোডা দেখি"—লোকটা বলে।

বিধুশেখর একটা সোডার বোতল এগিয়ে দিলেন। ভলান্টিয়াররা উত্তেজিত। আর কিছু বিক্রি হয় কি না দেখতে।

"দূর মশাই, বোতল খোলার চাবিটা দেবেন তো?" লোকটা রাগের সঙ্গেই বলে ওঠে।

বিধুশেখর কিছুতেই বোতল খোলার চাবিটা পাচ্ছেন না। লোকটা কায়দা করে পেতলের পাটাতনে বোতলের ছিপিটা চাপ দিতেই খুলে এল। বোতলটা মুখের কাছে ধরে ঢকঢক করে শেষ করল সোডার বোতল। একটা আনি দিয়ে চলে গেল লোকটা।

হইচই করে ভলান্টিয়ারের দল বাড়িতে ঢুকল। "দাদুর দোকানে প্রথম বিক্রি হয়েছে" উত্তেজনায় সবাই পুরো ঘটনাটা বলল হেমছায়া আর নমিতাকে। হেমছায়া বাচ্চাদের সবাইকে এক আনা করে পয়সা দিলেন। বললেন—"তোমরা দাদুর দোকান থেকে লজেন্স কিনে খাও। আর দাদুকে বাড়ি ফিরতে বলো। তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। দুপুরে স্নান করে খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিক। বিকেলে আবার দোকান খুলবে দাদু।"

বিধুশেখর চার-চারটে ক্ষুদে খদ্দের পেয়ে খুশি। ওইটুকু ছোট দোকানে পা মুড়ে এত সময় বসে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। "সেই ভাল, বাড়ি যাওয়া যাক।" দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরেন বিধুশেখর নাতি-নাতনির সঙ্গে।

সারা সন্ধ্যায় কিছুই বিক্রি হচ্ছে না দোকানে। নাতিরা তার বন্ধুদের ধরেছে দাদুর দোকান থেকে কিছু কেনার জন্য। বিক্রি হল কিছু লজেন্স, বিস্কুট, হজমিগুলি। সারাদিনে এক টাকার মতো বিক্রি হয়েছে। রাত হয়ে গেছে। আনন্দশেখর অফিস থেকে ফেরার পথে দোকান খোলা দেখে তাড়া লাগায় দোকান বন্ধ করার জন্য। দোকান বন্ধ করে সবাই বাড়ি ফিরল।

বিধুশেখর দোকানের জিনিসের দাম জানেন না। বুঝতে পারছেন না লাভ কি লোকসান হচ্ছে। খেতে খেতে বললেন, "আগামীকাল আমি দোকান বন্ধ করে রিসার্চ করব আমার দোকানের জিনিসগুলোর কী দাম। দোকানে দোকানে ঘুরব। দেখব কী করে ওরা লাভ করে। গোয়েঙ্কার কথাই ভেবে দেখ। সুদূর রাজস্থান থেকে কলকাতায় এসে গামছা ফেরি করতেন। জীবনের শেষে কোটিপতি হয়েছিলেন। আমার এই ছোট দোকানই হয়তো ভবিষ্যতে বিরাট ফ্যাক্টরি হয়ে দাঁড়াবে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। বাঙালিরা চিরকালই ব্যাবসাকে ভয় পায়। সবাই চাকুরিজীবী। এই ধারাকে ভাঙতে হবে।"

পরের দিন সারাদিন ধরে বিধুশেখর দোকানে দোকানে ঘুরে গবেষণা করলেন। আলাপ করলেন কিছু দোকানদারদের সঙ্গে। মনে করে সোডার বোতল খোলার একটা চাবি কিনলেন। আর একগুচ্ছ পান। ঘরের থেকে নিয়ে রাখলেন মা লক্ষ্মীর একটা ছবি আর কিছু ধূপকাঠি। এত কাজের জন্য দোকানটা সারাদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হল। মদিনার মসজিদের ছবি সরিয়ে মা লক্ষ্মীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি রাখলেন।

তৃতীয় দিন মহা উৎসাহে দোকান খুললেন বিধুশেখর, সকালবেলা। মা লক্ষ্মীর ছবির সামনে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলেন। বিক্রি হল কিছু সোডা, কিছু সিগারেট। অনেকটা রপ্ত হয়ে গেছেন বিধুশেখর। বিড়লা আর গোয়েঙ্কার কথা ভাবছেন। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম। সন্ধেবেলা আবার দোকান খুললেন। ভলান্টিয়ারের দল সেজেগুজে দোকানের সামনে। আরও কিছু বিক্রি হল— কিছু পান, কিছু লজেন্স, কিছু বিস্কুট। শিবুর অঙ্কের মাথা পরিষ্কার। পুরো হিসেবটা রাখছে। বিধুশেখর দেখে নিলেন দড়িতে আগুন জ্বলছে। একটা বরফের চাঁইয়ের ওপর সাজিয়ে রেখেছেন পান। চারপাশে মশলা। বেশ-কিছু মিষ্টি পান কিনে নিয়ে গেল একজন লোক।

খুব খুশি আজ বিধুশেখর। পকেট ঘড়িটা তুলে দেখলেন প্রায় আটটা বেজে গেছে। এবার দোকান বন্ধ করার পালা। উঠব উঠব করছেন। এমন সময় একটা গোঁফওয়ালা তাগড়াই লোক দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

"একটা ডাব দেখি"—গম্ভীর গলা।

বিধুশেখর ডাব কাটতে চেষ্টা করছেন মিনিট খানেক ধরে।

হঠাৎ লোকটা বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে, "কোনওদিন ডাব কাটেননি তা বোঝা যাচ্ছে। ছোরাটা আমার হাতে দিন।"

কী শিল্পীর মতো অনায়াসে ডাবটা কেটে দিল লোকটা! "সিগারেটের প্যাকেটের কাছে একটা গ্লাস আছে, দিন তো?" বিধুশেখর কাচের গ্লাসটা এগিয়ে দেন। লোকটা গ্লাসে ঢেলে ডাবের জলটা খেল। হঠাৎ ভলান্টিয়ারদের দিকে তাকিয়ে বলে, "কী দেখছ হাঁ করে। বাড়ি যাও।" কী গম্ভীর গলা। ওরা ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ লোকটা বিধুশেখরের একটা হাত চেপে ধরে। "ছোরাটা তো বেশ-- আমার চাই। মানুষ মারার কাজে লাগবে।" লোকটা কর্কশ স্বরে বলে, "দেখুন, দোকানটা আমার। এক্ষুনি যদি দোকান থেকে নেমে না পড়েন, এই ছোরা দিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।"

বিধুশেখর ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন। আস্তে আস্তে দোকান থেকে নেমে পড়েন। ভলান্টিয়ারের দল ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে খবর দেয়। "একটা গুন্ডা দাদুকে মেরে ফেলল।" এর মধ্যে বিধুশেখরের প্রবেশ। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ।

হেমছায়া একটু লেবুর জল করে আনলেন শ্বশুরের জন্য। নমিতা ফ্যানটা জোরে খুলে দিলেন। শরবতটা অনেকক্ষণ ধরে খাবার পর বিধুশেখর বললেন, "আমরা হচ্ছি পড়াশুনার লোক, ব্যাবসাটা আমাদের জন্য নয়।"

রাতে যতিশেখর আর আনন্দশেখর বাবার রোমহর্ষক ডাকাতির গল্প শুনে হাসতে থাকেন। "যা হোক রক্তপাত হয়নি এই রক্ষে", আনন্দশেখর বলেন। যতিশেখর বলেন, "বাবা, তোমার লাভের চেয়ে লোকসান হয়েছে এই দোকানে। অত সুন্দর ভাল তালা, অত সুন্দর ছোরা, মা লক্ষ্মীর ছবি--- সব গেল। এ ছাড়া তুমি পান, বরফ ও চাবির জন্য কিছু টাকা খরচ করেছ।"

বিধুশেখর বলেন, "একটা ভাল অভিজ্ঞতা হল। পরে নাতি-নাতনিদের গল্প করা যাবে।" এর পর থেকে ভলান্টিয়ারের দল রাস্তা দিয়ে গেলে আড়চোখে দোকানের সেই মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকত। খুব দুঃখ পেত, খদ্দেরের ভিড় দেখে সেই দোকানে।

বিধুশেখর এখন সারাদিনই বাড়িতে থাকেন। নাতি-নাতনিদের বাঘ মারার গল্প করেন। গল্প করেন ভূত-পেতনি, দৈত্য-দানবের। হঠাৎ একদিন স্টিমার কোম্পানির মালিক খানসাহেব নিজেই হাজির হলেন আনন্দশেখরের বাড়িতে। সিরাজুল খান। লম্বা-চওড়া, নীল স্যুট পড়া, খুব সুন্দর দেখতে। লোকে বলে খানসাহেব। হাত জোর করে খানসাহেব বললেন, "বিধুবাবু, আপনাকে আমার দরকার। আপনাকে খুলনায় নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। আপনি আমার বাবার মতো। আপনাদের জন্য এক ভাল বাড়ি ভাড়া করে রেখেছি। আপনি চলুন।"

যতিশেখর বললেন, "দেখুন পূর্ব বাংলায় লাখ লাখ হিন্দু মারা গেছে মুসলমানের হাতে। আমাদের শিকারপুরের জমি-জমা বাড়িঘর ছেড়ে সবাই একবস্ত্রে চলে এসেছি। আবার যে খুলনায় গণ্ডগোল লাগবে না, তার কি কোনও ঠিক আছে? তবু আমাদের মধ্যে বাবা-মা আছেন, ভাই-বোন আছেন, অনেকটা নিশ্চিন্ত। আপনিই বলুন, আর কি পূর্ব বাংলায় ফিরে যাওয়া উচিত হবে।"

খানসাহেব গম্ভীর গলায় বলেন, "যতিবাবু, আমরা কত যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি আপনজনের মতো বাস করেছি। ইংরেজরা আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে— এ এক সর্বনাশা চক্রান্ত। ওরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে চিরকালের জন্য বিভেদ লাগিয়ে দিল। যা হবার হয়ে গেছে। আমরা যদি চেষ্টা না করি, পাশাপাশি দুটো দেশ চিরকালের মতো শত্রু হয়ে থাকবে। ধর্মের নামে দেশ ভাগাভাগির চেয়ে আর বড় ক্ষতি কী হতে পারে?"

খানসাহেব বিধুশেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিধুবাবু, আপনি তো জীবনের বেশির ভাগ সময় আমার অফিসে কাজ করেছেন। কোনওদিন কি বুঝতে পেরেছেন ধর্মের ফারাক, ন্যায়ের ফারাক?"

বিধুশেখর অনেক ভেবে বললেন, "দ্যাখ যতি, আমার এত বড় সংসার নিয়ে

তোদের এখানে পড়ে আছি, কিছু করার নেই। খানসাহেব যখন খুলনায় নিতে এসেছেন— সেখানেই ফিরে যাই। ওখানে আমার কত পরিচিত লোক আছে। কলকাতা শহর বিদেশ বিদেশ লাগে। তোরা যদি বীণা, ইনা আর অজয়কে এখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে পারিস, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোর মা, নীনা আর বিজয়কে নিয়ে খুলনায় চলে যাই। আমি পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে চাই। চাকরির মধ্যে থাকব, সময় কাটবে। পুজোর সময় বেড়াতে আসব কলকাতায়।"

"তাই ভাল বাবা", যতিশেখর বলেন। খানসাহেব তাঁর পকেট থেকে একটা সোনার পার্কার পেন দিলেন যতিশেখরকে। বললেন, "বিকেলে এসে আমি ওঁদের নিয়ে ফিরব খুলনায়। বিধুবাবু, আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন।"

বিধুশেখর ফিরে গেলেন খুলনায়। সঙ্গে নিয়ে গেলেন বউ, ছোটমেয়ে নীনা আর ছোট ছেলে বিজয়কে। বীণা, ইনা আর অজয় থেকে গেল কলকাতায় দাদাদের বাড়িতে পড়াশুনার জন্য। বীণা, ইনা থাকাতে হেমছায়ার সুবিধে হল। বাচ্চাদের, ননদদের কাছে রেখে এদিক-ওদিক বের হতে পারেন। বেশ-কিছু বন্ধু হয়েছে হেমছায়ার। পাশের বাড়িতেই সুধাংশুর বউ স্নেহ। ওর দুই মেয়ে রত্না আর দীপার সঙ্গে কেয়া আর অনি খেলা করে। বাড়ির চিলেকোঠায় থাকেন শান্তিসুধা সেন। স্কুলের শিক্ষিকা, কংগ্রেস কর্মী। আশেপাশের মেয়ে-বউদের নিয়ে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকার দল গড়ে তুলেছেন। হেমছায়াকে দলে টেনে নিলেন শান্তিসুধা। আনন্দশেখর নিজে কখনও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেননি। কিন্তু হেমছায়াকে বাধা দিলেন না। বড় জা নমিতারও আপত্তি নেই এ ব্যাপারে। "যা হেম, তুই একটু চালাকচতুর আছিস, লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারিস। আমি সংসারের দিকটা চালিয়ে দেব।"

এই প্রথম মুক্তির স্বাদ পেলেন হেমছায়া। বিকেলবেলা সেজেগুজে সবাই কংগ্রেস অফিসে যায়। সেখানে সুকৃতি সেন গান শেখান স্বেচ্ছাসেবিকাদের— স্বদেশী গান, স্বাধীনতার গান।

"জাগে নব ভারতের জনতা
এক জাতি এক প্রাণ একতা।"

হেমছায়া যোগদান করেছেন এই গানের দলে। প্রভাতফেরি গাইছেন লাইন বেঁধে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে। একদিন শান্তিসুধা তাঁর স্বেচ্ছাসেবিকার দল নিয়ে সোদপুরে গেলেন সতীশ দাশগুপ্তের আশ্রমে, গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। ওঁরা যখন ট্রেনে করে পৌঁছলেন বিকেল হয়ে গেছে। গান্ধীজী চরকা কাটছিলেন। একটু পরেই সন্ধ্যার ভজন শুরু হবে। সবাই প্রণাম করে গোল হয়ে বসলেন মাটিতে, গান্ধীর সামনে। হেমছায়া জাতির জনককে দেখছেন খালি গায়ে— হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, সৌম্য, শান্ত চেহারা, কেমন যেন এক বিষাদ চোখে।

গান্ধীর খুব প্রিয় ভজন ছিল: "বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে যে, পীর পরায়লি না আনে রে। বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে যে..."

আশ্রমের একজন ভদ্রমহিলা ভজন গান শুরু করলেন। গান্ধী চোখ বুজে শুনছেন। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছেন। গান শেষ হল। গান্ধী শান্তিসুধাকে জিজ্ঞেস করলেন ভাঙা ভাঙা বাংলায়, "তোমার স্বেচ্ছাসেবিকাদের মধ্যে কেউ গুরুদেবের পূজার গান জানে?"

শান্তিসুধা বলে ওঠেন—"বাপুজি, হেমছায়া খুব ভাল গাইতে পারে রবীন্দ্রসংগীত।" গান্ধীজী বললেন, "জানো, আমি যখন আমরণ উপোষ করছি বিড়লা হাউসে, রবীন্দ্রনাথ নিজে ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে। নিজে এই গানটা শুনিয়েছিলেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায়।' এই গানটা শোনার পর কবির অনুরোধে আমি উপবাস ভঙ্গ করি। এই গানটা তুমি কি জান?"

হেমছায়ার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দেয় শান্তিসুধা। চোখ বন্ধ করে মনপ্রাণ দিয়ে গান গাইলেন হেমছায়া। শেষ হলে গান্ধীজী বলেন, "খুব ভাল হয়েছে। কী অপূর্ব গানটার আবেদন। যা হোক, তোমরা বেশি রাত কোরো না। অনেক দূর যেতে হবে তোমাদের। আবার একদিন সময় করে এসে গান শুনিয়ে যেয়ো।"

গান্ধীর প্রশংসা শুনে শান্তিসুধার দল খুব খুশি। হইচই করতে করতে ট্রেনে করে সবাই বাড়ি ফিরলেন। তখন রাত ন'টা হবে। শান্তিসুধা বেশ রংচং করে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের গল্প করেন যতিশেখর ও আনন্দশেখরের কাছে। নমিতা শুনে খুব খুশি। গান্ধীর সঙ্গে কিছুক্ষণের সান্নিধ্য গভীরভাবে হেমছায়ার মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি হেমছায়ার।

এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হল। ১৯৪৭ সালের চোদ্দোই আগস্টের রাতে সবাই রেডিয়োর সামনে গোল হয়ে বসে। নতুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ভাষণ দেবেন রাত বারোটায়। কী আনন্দ, কী উত্তেজনা— ভারত স্বাধীন হয়েছে। সবাই এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। এই স্বাধীনতার জন্য কত লোক জেল খেটেছে, ফাঁসি গেছে। কত কষ্ট, নির্যাতন সয়েছে দিনের পর দিন। কত পরিবার হারিয়েছে প্রিয়জন। সবাই কানখাড়া করে নতুন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার চেষ্টা করছে। আবেগের সঙ্গে জওহরলাল ভাষণ দিলেন দিল্লির লালকেল্লার সামনে—"বহু বছর আগে ভাগ্যদেবতার সঙ্গে যে মিলনের সংকল্প আমরা নিয়েছিলাম, সে সংকল্প পূর্ণ করার সময় হয়েছে। রাত বারোটায় সারা পৃথিবী যখন গভীর ঘুমে, ভারত জেগে উঠেছে নিয়তির সঙ্গে অভিসারে— নতুন জীবন ও স্বাধীনতা নিয়ে।" বক্তৃতা শুনে সবাই হাততালি দিচ্ছে, হইচই করছে। সবাই এখন স্বাধীনদেশের নাগরিক। শুরু হচ্ছে নতুন যুগ।

ভোর না হতেই সাদা জামাকাপড় পরে সব বাচ্চারা তৈরি। মালা. কেয়া, শিবু

ও অনি হাতে ধরে রেখেছে ছোট ছোট তেরঙ্গা পতাকা। রাস্তার মোড়ে একটা বিরাট বাঁশ পোঁতা হয়েছে, যার ডগা থেকে একটা দড়ি নামানো। নীচে পতাকা গোটানো। বাচ্চাদের ওপর ভার পড়েছে গান গাইবার। তিনটে পাশাপাশি বড় ছবি রাখা— গান্ধীজী, নেতাজী আর জওহরলালের।

মন প্রাণ দিয়ে ছোটরা গাইছে "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"। রাস্তার দু'পাশে নীল লাল কাগজের শেকল দিয়ে সাজানো হয়েছে। গাড়ি চলাচল বন্ধ। বিরাট উৎসব হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। বড়দের গ্রুপ লাইন করে প্রথমে ব্যান্ড বাজাল। গমগম শব্দে সবাই উদ্‌বুদ্ধ। প্রচণ্ড হাততালি। একজন নেতাস্থানীয় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "বন্দেমাতরম্।" সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশো লোকের কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠল, "বন্দেমাতরম্।" তিনবার এই ধ্বনিটা উচ্চারণ করার পর স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ভূপতি মজুমদার পতাকা উত্তোলন করলেন। সে কী উত্তেজনা। "দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন ভারতে ইংরেজের আর কোনও ক্ষমতা নেই। ওদের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছি। এবার আমরা সবাই রাজা আমাদের রাজত্বে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সমতা আসবে, শিক্ষার সুযোগ মিলবে সবার; কৃষি, শিল্পে, বাণিজ্যে, নতুন পথ দেখাবে ভারত। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাইকে ভাষণ দিলেন ভূপতি মজুমদার।

বিকেল হতেই যতিশেখরের তাড়া। সবাইকে নিয়ে দেশবন্ধু পার্কে যাবেন। হাঁটা পথ। নমিতা ও হেমছায়া ভাল শাড়ি পরল। অজয়, বীণা, ইনা, মালা, কেয়া, শিবু, অনি— সবাই হাতে জাতীয় পতাকা ধরে। ছেলেরা সাদা জামা সাদা প্যান্ট, মেয়েরা সাদা স্কার্ট। সবাই পড়েছে সাদা কেড্‌সের জুতো। নতুন ভারতের নওজোয়ান। বিরাট করে স্বাধীনতা উৎসব হবে পার্কে। রান্নাবান্না আগেই সেরে রেখেছেন নমিতা ও হেমছায়া। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হবে।

এর মধ্যেই হাজার হাজার লোক এসে ভিড় করেছে দেশবন্ধু পার্কে। যতিশেখরের বুকে একটা বিরাট ব্যাজ। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে খুব চেনাজানা যতিশেখরের। আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন অনেকের সঙ্গে আনন্দশেখরকে। ভিড়ের মধ্যে সবাইকে নিয়ে প্রথম সারিতে সংরক্ষিত চেয়ারে বসে পড়লেন যতিশেখর। শিবু ও অনি উত্তেজিত। সামনেই বিরাট স্টেজ। আজাদ-হিন্দ ফৌজের অনেক বড় বড় নেতা এসেছেন আজকের স্বাধীনতা দিবস উৎসবে। শাহনওয়াজ খান, ধীলন, সাইগল। যতিশেখর স্টেজের ভেতর গিয়ে কথা বললেন এইসব বড় বড় নেতাদের সঙ্গে। সবার অটোগ্রাফ নিলেন একটা নোট বইয়ে। স্টেজ থেকে ফিরে যতিশেখর নিজের জায়গায় বসলেন—"এক্ষুনি অনুষ্ঠান শুরু হবে।"

অনুষ্ঠান শুরু হল জাতীয় সংগীত দিয়ে—

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।"

সবাই দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাইছে। জাতীয় সংগীতের পর সবাই চেয়ারে বসে

পড়ল। তার পর একজন ভদ্রমহিলা খুব সুন্দর করে গাইলেন "বন্দেমাতরম্ সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্ শস্যশ্যামলাং...।"

গানের শেষে শুরু হল ভাষণ। আজাদ-হিন্দ ফৌজের নেতারা হিন্দিতে ভাষণ দিলেন একের পর এক। প্রচণ্ড উদ্দীপ্ত সেই ভাষণ।

অনি অপেক্ষা করে আছে নেতাজীর জন্য। "জ্যাঠামণি, নেতাজি আসছে না কেন?" অনি জিজ্ঞেস করে যতিশেখরকে। "পরে বলব, ফেরার সময়" যতিশেখর বলেন। "এবার শোনো, বক্তৃতা দেবেন সরোজিনী নাইডু— বাংলার বুলবুল।" সরোজিনী এলেন, সুন্দর করে মধুর স্বরে ব্যাখ্যা করলেন স্বাধীনতার মানে কী?

গান ও বক্তৃতা শেষ হলে সবাই খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এবার বাজির উৎসব। দারুণ আগ্রহে বাচ্চারা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যতিশেখর বললেন, "এবার আতশবাজি ছাড়বে।" নীল, লাল, সবুজ, সোনালি, রুপালি— কত রঙের ফুলকিতে রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। সবশেষে সেই বিরাট আতশবাজি। যার জন্য সবাই আগ্রহ করে আছে। ফুলকি আকাশে ছড়িয়ে কী সুন্দর আলোর ছবি তৈরি করল—"নেতাজী ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। সবার কী হাততালি। "জয় হিন্দ" চিৎকারে দেশবন্ধু পার্ক মুখরিত হয়ে উঠল।

অনেক রাতে সবাই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরল। আনন্দশেখর সবাইকে আইসক্রিম কিনে দিয়েছেন। সবাই খেতে খেতে হাঁটছে। অনি আবার জিজ্ঞেস করে যতিশেখরকে, "জ্যাঠামণি, স্বাধীনতার দিনে নেতাজী কেন নেই?" যতিশেখর চুপ। চোখে জল। "আমি স্টেজের ভেতর শাহনওয়াজের সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনি বললেন নেতাজী এক প্লেন দুর্ঘটনায় হবিবুর রহমানের সঙ্গে মারা গেছেন। তাঁর চিতাভস্ম টোকিওর এক বুদ্ধ মন্দিরে রাখা আছে। ভারতের সবচেয়ে বড় নেতা স্বাধীনতার জন্য যিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন, ভারতের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলেন না। এর চেয়ে বড় দুঃখ কি হয়।" সবাই চুপচাপ। যতিশেখরের চোখ মুছলেন, অনির কান্না পেল নেতাজীর মৃত্যুসংবাদে। যতিশেখর বলেন, "নেতাজী ছিলেন সত্যিকারের নেতা। নেহরু কি সামলাতে পারবে এই দ্বিখণ্ডিত ভারত?"

এই উত্তেজনা, এই আনন্দ, এই ঐতিহাসিক উৎসবে জাতির জনক গান্ধী নীরব। তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি দ্বিখণ্ডিত ভারত। বেলেঘাটার এক পুরনো বাড়িতে শুয়ে আছেন। তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এই স্বাধীন ভারতে। নিজের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কোথাও কি ভুল ছিল? এই সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের জন্য তাঁর পুরনো গীতা খুলে পড়ছেন সান্ত্বনা পাবার জন্য। পৈশাচিক হত্যালীলার খবর আসছে পাঞ্জাব থেকে। লাখ লাখ হিন্দু আর শিখ প্রাণের ভয়ে পাকিস্তান থেকে রওনা দিল স্বাধীন ভারতের দিকে। কেউ

হেঁটে, কেউ ট্রেনে, কেউ বাসে, কেউ বা গোরুর গাড়িতে। লাখ লাখ মুসলমান ভারত ছেড়ে রওনা দিল পাকিস্তানের দিকে। লাখ লাখ হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে আগেই এসে পৌঁছেছে পশ্চিমবাংলায় স্বাধীনতার আগে। পৃথিবীর ইতিহাসে জন্মভূমি ছেড়ে এত বড় জনসংখ্যার স্থান পরিবর্তন কখনও হয়নি। কী পৈশাচিক আনন্দে আর ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে খুন করল। ধর্মের নামে হিন্দু ও শিখ চিরকালের শত্রু হয়ে গেল মুসলমানদের কাছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা আর পাঞ্জাবেই বেশি ক্ষতি হয়েছে। এই দুই প্রদেশের লোকেরা সয়েছে নির্যাতন, ভরেছে জেল, দীক্ষা নিয়েছে অগ্নিমন্ত্রে। ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে। এদের দ্বিখণ্ডিত করে জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান। পাঞ্জাবের হত্যালীলার খবর পেয়েছেন গান্ধী। গান্ধীর চোখে জল। এই স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি তো দেখেননি। এই রক্তমাখা স্বাধীনতা তিনি চাননি।

তিনি সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনায় সবাইকে আমন্ত্রণ করেছেন। হিন্দু মুসলমান সবাই এসেছেন, মালা নিয়ে, শঙ্খ নিয়ে। তিরিশ হাজার লোক হবে। গান্ধী বললেন, "পাঞ্জাবের হত্যালীলা যে কলকাতায় হয়নি তার জন্য কলকাতার লোককে ধন্যবাদ।"

গান্ধী ফিরে গেলেন দিল্লিতে। চোখের সামনে আর দেখতে পারছেন না হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। এর নাম কি স্বাধীনতা? সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তাঁর রাজনীতি। তাঁর আদর্শ। শেষ চেষ্টা করবেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার, "সবকো সন্মতি দে ভগবান।" পাকিস্তানকে যেন বঞ্চিত না করে ভারত তার সম্পদ থেকে, আমরণ উপবাস শুরু করলেন বিড়লা হাউসে। ১৩ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সাল। শরীর জীর্ণ, শীর্ণ হয়ে গেছে। সঙ্গে আছে মীরাবেন, দুই নাতনি আভা আর মানু। সুশীলা নায়ার ঘন ঘন নাড়ি দেখছেন। এই শরীরে আর কিছুই সইবে না। খবর পেয়ে জওহরলাল আর বল্লভভাই প্যাটেল ছুটে আসেন। এ কী আবদার বাপুজির। দেশের ট্রেজারি থেকে কোটি কোটি টাকা পাকিস্তানকে দিতে হবে? গান্ধী অনড়, অটল সংকল্পে। শেষে জওহরলাল ও প্যাটেল রাজি হলেন পাকিস্তানকে টাকা দিতে। উপবাস ভাঙলেন গান্ধী।

তিরিশে জানুয়ারি সন্ধেবেলা বিড়লা হাউসের এক প্রার্থনা সভায় গান্ধী যাচ্ছিলেন। বাইরে অনেক দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে। সেই দর্শনার্থীদের সামনের সারিতে ছিল এক কট্টর হিন্দু, নাথুরাম গড্‌সে। গান্ধীর মুসলমানপ্রীতি ভাল লাগেনি নাথুরামের। নাথুরাম পায়ে ধরে প্রণাম করলেন গান্ধীকে। তার পর ছোট্ট পিস্তলটা তুলে বিনা দ্বিধায় গুলি করলেন গান্ধীকে। এ যেন এক গ্রীক ট্রাজেডির শেষ অঙ্ক। "হে রাম" বলে লুটিয়ে পড়লেন জাতির জনক, শান্তির প্রতীক, অহিংসা আন্দোলনের পুরোহিতের। মৃত্যু হল এক হিন্দুর পিস্তলের গুলিতে। অনির মনে আছে গান্ধীর মৃত্যুদিনের কথা। ওদের বাড়ির রাস্তা দিয়ে বিরাট মিছিল। গান গাইছে রামধুন, "সবকো সন্মতি দে ভগবান।"

৬

একটু আগে লাঞ্চ খাওয়া শেষ হল। প্লেনের ভেতর দুপুর কি বিকেল ঠিক বোঝা যায় না। অনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে একটা বেজে গেছে। সামনের টিভি মনিটরে দেখাচ্ছে প্লেন কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে, ব্যাঙ্কক কত দূর, স্থানীয় সময় কত, ইত্যাদি। এক নাগাড়ে বসে পা ধরে গেছে। একটু হাঁটাচলা দরকার। প্যান্ট্রির পেছনে বেশ-কিছু ফাঁকা জায়গা আছে। দু'পাশে এমার্জেন্সি দরজা। ওপরে জানলা। অনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখছে। এত ওপর দিয়ে যাচ্ছে বলে সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে না। অনি ভাবছে ওর ছোটবেলার কথা। পরেশনাথ মন্দিরের কাছে শ্রীনাথ ভবন, ৩১-এ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট। ঠিকানাটা এখনও মনে আছে ভেবে আশ্চর্য লাগছে। একান্নবর্তী পরিবার। বাড়িতে প্রচুর লোকজন। সবার মাঝে বড় হচ্ছে অনি।

ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন যতিশেখর আর আনন্দশেখর। মালা ভর্তি হল ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে। কেয়া আর শিবু পার্ক ইন্সটিটুশনে, দেশবন্ধু পার্কের লাগোয়া স্কুল। অনি এখনও ছোট। স্কুলে যায় না। এ ছাড়া ভাই-বোনেরা আছে। বীণা ম্যাট্রিক পাস করে গান গাইছে। অদ্ভুত সুরেলা গলা বীণার। ঠুংরি আর ভজন গেয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর প্রাইজ পেয়েছে। রেডিয়োতে মাঝে মাঝে গায় বীণা। ইনা পড়ে বীণাপাণি পর্দা গার্লস স্কুলে। অজয় পড়ে পার্ক ইন্সটিটুশনে, উঁচু ক্লাসে। বীণা, ইনা আর অজয় যে দাদাদের বাড়ি থেকে পড়াশুনা করছে, তার জন্য তারা কৃতজ্ঞ। যতটা পারে, সংসারের কাজে তারা সাহায্য করে।

দুপুরবেলা অনি একা। সারাদিন বাড়িতে ঘুরঘুর করে। শিশি, বোতলে জল ভর্তি করে আপনমনে নানাধরনের রং তৈরি করে। চুন, খয়ের, পেনের কালি, হলুদ এমনকী স্বর্ণসিন্দূর মিশিয়ে নানা ধরনের রং তৈরি করে ছোট ছোট ওষুধের বোতলে রাখে। সূর্যের দিকে ধরলে চিকচিক করে স্বর্ণসিন্দূরের জন্য। এর জন্য সে মাঝে মাঝে বকুনি খায় জেঠিমার কাছে। দুপুরবেলা চুপটি করে সে মার কাছে কবিতা শোনে— রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র কবিতা। হেমছায়া স্নান করে অনিকে নিয়ে কবিতা শোনায়। সে সময় অনির মাকে খুব ভাল লাগে। খোলা চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপ, পাটভাঙা শাড়ি পরা, হাতে চুড়ির রিনিঝিনি। কতবার মা'র কাছে "বীর পুরুষ" কবিতা শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। তবুও প্রতিদিন ওই কবিতাটা শোনা চাই। কবিতা শুনতে শুনতে কল্পনার রাজ্যে চলে যায় অনি। সামনের জানলা দিয়ে একটা বড় জলের ট্যাঙ্ক দেখা যায়। তার পেছনে একটা বাতাবি লেবুর গাছ। তার পেছনে একটা মাঠ। অনি কল্পনা করে, এটা বোধহয় জোড়াদীঘির মাঠ। যেখানে ডাকাতদের হাত থেকে মাকে এক সন্ধ্যায় রক্ষা করেছিল। ভাবতে ভাবতে রাংতায় মোড়া কাঠের তলোয়ার নিয়ে খাট থেকে লাফ

দেয়—"হা রে রে রে রেরে।" ডাকাতদের মেরে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কবিতা শুনতে বসে।

অনি অপেক্ষা করে থাকে শিবু কখন স্কুল থেকে আসবে। তখন দু'জনে খেলা করবে। শিবু অনির চেয়ে বছর দেড়েকের বড়। ভীষণ স্মার্ট, কথায় ফুলঝুরি। দুনিয়ার সব খবর ও জানে। বিলেত জার্মানির গল্প বলে। শিবু অনিকে নিয়ে যায় বিকেলবেলা পরেশনাথ মন্দিরে। ওখানে দু' ভাই কত রকমের খেলা করে। আশেপাশের বাড়ির ছেলেরাও আসে সেই সময়। পাশাপাশি তিনটে জৈন মন্দির। কত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা আছে মন্দিরে, কেউ জানে না। ওরা ঘুরে আবিষ্কার করে, লুকিয়ে থাকে। সাদা মন্দিরটাই ওদের সবচেয়ে ভাল লাগে। সেখানে বাঁধানো পুকুরে বড় বড় রঙিন মাছের ভিড়। কত দেশ-বিদেশের টুরিস্ট মন্দির দেখতে আসে। দল বেঁধে মাছগুলো দেখে। অনি ও শিবু ছোট ছোট পাঁউরুটির গুলি ছুড়ে দেয়। দল বেঁধে মাছগুলো রুটির গুলি খেতে আসে। শিবু নাকি প্রত্যেকটা মাছ আলাদা করে চিনতে পারে। হরেকরকম নাম দিয়েছে মাছগুলোর।

মাছ দেখার পর ওরা চটি খুলে বড় মন্দিরের ওপরে আসে। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, দেয়ালগুলোয় রঙিন কাচের কারুকার্য। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখে বিরাট একটা কাচের বাক্স। দর্শনার্থীরা সব টাকা দিয়ে যায়। সামনে মহাবীরের মূর্তি। এরা বলে পার্শ্বনাথ। ওরা মন্দিরের চারপাশ ঘোরে। মন্দিরের ভেতরে একটা অন্ধকার জায়গায় একটা প্রদীপ জ্বলছে। ওখানে সবাইকে যেতে দেয় না। কিন্তু পূজারিদের সঙ্গে শিবু আর অনির খুব বন্ধুত্ব। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেই প্রদীপটা দেখতে যায় প্রতিদিন। প্রদীপটা নাকি হাজার বছর ধরে জ্বলছে। কোনওদিন নেভেনি। শিবু বলে, "জানিস, অনি, এই প্রদীপটা নিভে গেলে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরিতে সারা পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে।" অনি প্রদীপটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওপরে একটা পেতলের বাটি ঝোলানো, নীচে ফুটো। সেখান দিয়ে একটু একটু করে তেল পড়ছে প্রদীপে। অনি খুব আস্তে আস্তে নিশ্বাস নেয় প্রদীপটার কাছে, যাতে নিভে না যায়।

এর পর ওরা ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের কারুকার্য দেখে, মন্দিরের পেছনের বারান্দায় কেউ আসে না। শিবুর পকেটে সবসময় একটা ফোল্ডিং ছুরি থাকে। অনির দিকে তাকিয়ে বলে, "অনি, রঙিন কাচ চাই?" অনি মাথা নাড়ে। শিবু ছুড়ি দিয়ে দেয়ালের গা থেকে রঙিন কাচ খুলে অনিকে দেয়। নীল, লাল, হলুদ, সবুজ। অনেক কাচের টুকরো জমেছে অনির সংগ্রহে। এ ছাড়া আছে মার্বেল, খালি সিগারেটের প্যাকেট, ডাকটিকিট, কয়েকটা বিদেশি মুদ্রা, আরও কত কী? খাটের নীচে একটা জুতোর বাক্সে অনি সব গুছিয়ে রাখে ওর সংগ্রহ।

শিবুর ছেলেবেলার কাণ্ডকারখানার কথা ভেবে অনির হাসি পায়। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। বিকেলবেলা লোকজনের ভিড় লেগে থাকত অনিদের

বাড়িতে। ওদের গল্প হাসি দূর থেকে শুনত শিবু আর অনি। সেইসময় লোকেদের মাঝে এলেই জেঠিমা বলত, "বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই, তোরা মন্দিরে গিয়ে খেলা কর। আমরা একটু গল্প করি।" চা, শিঙারা খেতে খেতে গল্প করত সবাই। শিবু ও অনি মুখ গোমড়া করে বেরিয়ে যায়। মন্দিরের চারিপাশে কত কী লোভনীয় জিনিস বিক্রি করে ফেরিওয়ালা। পয়সার অভাবে শিবু ও অনি কিনতে পারে না। কেউ বিক্রি করছে আইসক্রিম, কেউ বাদাম, কেউ ট্যাপারি, কেউ বিলিতি আমড়া, কেউ ফুচকা, কেউ আলুকাবলি। এ ছাড়া আছে গ্যাস বেলুন, লাট্টু, বাঁশি, রঙিম চশমা, পুলিশ, বেহালা, ডুগডুগি আরও কত কী! ওদের দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে। কেনার আর সুযোগ হয় না। শিবুই সমস্যাটা সমাধান করল একদিন। ওদের বাড়িতে যে-সব আত্মীয়স্বজন বিকেলবেলা বেড়াতে আসত, আর হাসতে হাসতে চা শিঙারা খেত, তাদের শিবুর ভাল লাগত না। তারা সব দরজার বাইরে জুতো খুলে ঘরে ঢুকত। শিবু একদিন একজোড়া জুতো এক ফেরিওয়ালাকে দিল। ফেরিওয়ালা বড় বড় দু' ঠোঙা বাদাম আর ঝাল নুন দিল। শিবু বলে, "টাকা ছাড়ো, নইলে জুতো পাবে না।" ফেরিওয়ালা দু'জনকে দু'টাকা দিল। ওরা মনের আনন্দে অনেক কিছু কিনল। এ তো বেশ মজার খেলা। এর পর থেকে শিবু প্রায়ই অতিথিদের একজোড়া জুতো উপহার দিত বিভিন্ন ফেরিওয়ালাদের। পরিবর্তে দু' ভাই পেত লোভনীয় খাবার, খেলনা আর হাতখরচা। এদিকে পর পর ওদের বাড়িতে বেশ-কিছু জুতো চুরি যাওয়াতে লোকজনের যাতায়াত কমে গেল।

হঠাৎ ছেলেধরার উপদ্রব শুরু হল সেই সময়। ওরা নাকি কচি কচি বাচ্চাদের চুরি করে হাঁড়ির মধ্যে ভরে রাখে, তার পর হাত-পা বেঁকে গেলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসিয়ে দেয় ভিক্ষে করার জন্য। সন্ধেবেলা ওদের তুলে নিয়ে যায়। ওদের ভিক্ষের পয়সায় ছেলেধরার ব্যাবসা। অনির খুব ভয় ছেলেধরার। বাড়ি থেকে সাবধান করে দিয়েছে কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে কথা না বলতে। এর মধ্যে কেয়া একদিন স্কুল থেকে ফিরেছে কাঁদতে কাঁদতে। এক ছেলেধরা ওর সোনার কানের দুল দুটো খুলে নিয়েছে। চারিদিকে ছেলেধরার আতঙ্ক। পাড়ার নাকি একটা ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ এসে খোঁজখবর নিল। শিবু না থাকলে অনি একা একা বাইরে বের হয় না।

একদিন বিকেলবেলা পরেশনাথ মন্দিরে শিবু আর অনি খেলছিল ওদের এক গুপ্ত জায়গায়। হঠাৎ একটা লোক কাছে এসে বলে— "তোমাদের নাম কী? গ্যাস বেলুন চাও? একা একা খেলা করছ কেন? চলো, তোমাদের বড় বড় দুটো বেলুন কিনে দেব।" লোকটা আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি করে হেসে হেসে কথা বলে, যেন কত দিনের চেনা। ওরা মন্দিরের বাইরের গেটে চলে এসেছে লোকটার সঙ্গে। সেখানে কত রকমের ফেরিওয়ালার ভিড়। লোকটা সত্যিই বড় বড় দুটো

গ্যাস বেলুন কিনে দিল। সুতোটা আঙুলে জড়িয়ে দু' ভাই হাঁটছে বেলুন নিয়ে।

শিবু হঠাৎ বলে, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। সামনেই একটা মিষ্টির দোকান। ওখানকার কচুরি আর রসগোল্লা পৃথিবী বিখ্যাত।" "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই" লোকটা বলে। শিবুই দোকানে ঢোকে সবাইকে নিয়ে। টুলটায় তিনজন পাশাপাশি বসে। শিবু বলে, "মোহনদা, চারটে করে গরম কচুরি সবাইকে দাও তো?"

কচুরি খাবার পর লোকটা জিজ্ঞেস করে, "আর কিছু খাবে? লজ্জা কেন?" শিবু অর্ডার দেয়, "দুটো করে রসগোল্লা, আর দুটো করে ক্ষীরকদম্ব।" শিবুর বলার ধরন থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করে, "তুমি খুব স্মার্ট তো? তোমার ভাই কিন্তু চুপচাপ। বেশি কথা বলে না।"

ওরা পেট ভরে খেয়ে, হাতে বেলুন নিয়ে হাঁটে। লোকটা বলে, "চলোই-না, মন্দিরের ভেতরে আমরা হাঁটি। অনেক খাওয়া হল। একটু হজম হয়ে যাবে।" ওরা মন্দিরের দিকে হাঁটতে শুরু করে। একটু পরে লোকটা বলে, "দেখলে, তোমাদের নাম জিজ্ঞেস করিনি। কী নাম তোমার?" শিবুর দিকে তাকিয়ে বলে।

শিবু বলে, "আমার নাম রাম, এ আমার পরের ভাই, ওর নাম লক্ষ্মণ।" "বা! বেশ সুন্দর নাম তো? তোমাদের বাড়িতে কে কে থাকে? বাবা কোন অফিসে কাজ করে?" গল্প করতে করতে ওরা মন্দিরের শেষ দিকে চলে এসেছে। এখানে লোকজনের ভিড় নেই। গেট পার হলেই বড় রাস্তা। লোকটা বলে, "ট্যাক্সি করে দূরে কোথাও ঘুরতে যাবে গড়ের মাঠে?" শিবু বলে, "মন্দ হয় না।" হঠাৎ দু'জন লোক উলটোদিক থেকে আসছিল, ওদেরই পাড়ার। শিবু হঠাৎ চিৎকার করে বলে, "রমেনদা, ছেলেধরা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।" শিবুর চিৎকার শুনে লোকটা চোঁ চাঁ দৌড়। রমেনদা ওর পেছনে পেছনে ছুটল। কিন্তু ধরতে পারল না।

রমেনদা শিবু আর অনিকে দেখে বলে, "তোমরা এই ফাঁকা জায়গাটায় এসেছ কেন? জান না চারিদিকে ছেলেধরার উপদ্রব।" শিবু হাসতে হাসতে বলে, "আমি তো প্রথম থেকেই ওর মিষ্টি কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম ছেলেধরা। এরজন্য ওর কাছ থেকে যত পারি, আদায় করছিলাম।" অনির দিকে তাকিয়ে বলে, "অচেনা লোককে কখনও নিজের নাম বলবি না। এইজন্য আমি বানিয়ে রাম-লক্ষ্মণের নাম বলেছিলাম। দেখলি, কী করে ছেলেধরাকে ঠকালাম।"

অনি ছুটতে ছুটতে বেলুন হাতে বাড়িতে ঢোকে। ছেলেধরার সব গল্প করে। রমেনদাও এসে হাজির। জেঠিমা শিবুকে খুব বকাবকি করল, "এর পর থেকে কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবি না। এরা সব কচি কচি ছেলে ধরে লক্ষ্ণৌ, দিল্লি পাচার করে দেয়। কোনওদিন আর বাড়িতে ফিরতে পারবি না। ওরা খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ট্যাক্সি করে ওদের আস্তানায় নিয়ে যায়।" অনি শুনে তো ভয়ে কাঁটা। শিবু বলে, "মা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে। বিশ্বাস করিস না অনি।"

বীণাপিসির হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। অনির কষ্ট হল বীণাপিসিকে আর

দেখতে পাবে না। বহুদূর ধানবাদে চলে যাবে, রেলওয়েতে কাজ করে হবু পিসেমশাই। বীণা খুব গল্প করে পাশের বাড়ির আশার সঙ্গে। বিয়ের কথা বলে। বেনারসি শাড়ি দেখায়, নতুন স্বপ্নে মশগুল। বাড়িতে লোকজনের যাতায়াত বাড়ল। খুলনা থেকে বিধুশেখর সবাইকে নিয়ে এলেন। শ্রীনাথ ভবনের ছাদে বিরাট করে ম্যারাপ বাঁধা হল। সেখানেই রান্নাবান্না হচ্ছে। খাওয়াদাওয়া ওখানেই হবে। বদ্রীদাসের মোড়েই থাকেন নলিনাক্ষ দাশগুপ্ত। দুটো মন্দিরের মাঝখানে— গৌরীবাড়ি লেনে। দোতলা ভাড়া বাড়ি। ওঁর তিন ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বড় ছেলে রবীন্দ্র অক্সফোর্ডের ডক্টরেট, মেজ ছেলে কমলাক্ষ ফিজিক্সের অধ্যাপক। ছোট ছেলে বিমলাক্ষ আই সি আই-এর সেক্রেটারি। মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে সুচিত্রা সেন আসেন বেড়াতে। কমলাক্ষর শালা-বউ। শিবু ও অনি কতদিন জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছে সুচিত্রা সেনকে দেখার জন্য। সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। এই কমলাক্ষই মুন্নির বাবা— পরে লাবকে অনিদের আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছিলেন ডক্টর দাশগুপ্ত ও সোনাদি।

নলিনাক্ষ ওঁর বৈঠকখানা ঘরটা ছেড়ে দিলেন বরযাত্রীদের বসার জন্য। লাল গালিচা, তাকিয়া আর রজনীগন্ধা দিয়ে সুন্দর করে ঘরটা সাজিয়েছে। অনি আর শিবু বরযাত্রীদের পাশে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছে। ইনা আর মালা বরকে সাজাবার জন্য মালা আর চন্দন নিয়ে এসেছে। বর চিৎকার করে বলে ওঠে, "এইসব মেয়েদের জিনিস আমার মুখে লাগাবে না।" ইনা আর মালা ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেছে।

বরের নাম হেমন্ত। বেশ ছোটখাটো। সুঠাম চেহারা, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফর্সা রং। ওর ছোট ভাই বসন্ত আরও বেঁটে, আরও স্বাস্থ্যবান। বেশ জমিয়ে গল্প করছে শিবু আর অনির সঙ্গে। বসন্ত হাতের গুলি দেখায়। উঁচুনিচু পেশি ব্যায়ামবীরের মতো। ধাঁ করে একটা ফোল্ডিং চেয়ারের ওপর সার্কাসের মতো হাতে ভর দিয়ে পা তুলে দিয়েছে। ওর নাকি গায়ে অনেক জোর। প্রতিদিন সকালে একটা কালো গোরুর এক বালতি দুধ খায়। শিবু কানে কানে অনিকে বলে, "গুল দিচ্ছে, বিশ্বাস করিস না।"

একটু পরে বরযাত্রীদের নিয়ে সবাই শ্রীনাথ ভবনের ছাদে উঠল। বিয়ের প্রস্তুতি হচ্ছে। লাল বেনারসিতে কী সুন্দরই দেখাচ্ছে বীণাপিসিকে। সামনে যজ্ঞের আগুন। অনি আর শিবু হাঁ করে দেখছে বিয়ের অনুষ্ঠান। হেমন্ত পুরুতের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়, "আপনার চেয়ে আমি ভাল মন্ত্র জানি।" এই বলে গড়গড় করে সংস্কৃতে শ্লোক আউড়ে যাচ্ছে। হেমন্তকে দেখে সবাই একটু থতমত খেয়ে গেছে। নতুন জামাই বদরাগী নয় তো? বিয়ে হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে রাত বারোটা। অনি ও শিবু একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাতে চিৎকার, চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় অনির। এর মধ্যে শিবুও

উঠে পড়েছে। দেখে বীণাপিসি কাঁদছে। হেমন্ত চিৎকার করে বলেছে—"বউ এত রোগা কেন? নিশ্চয়ই টিবি হয়েছে। এই মুহূর্তেই আমরা চলে যাচ্ছি। জেনেশুনে আপনারা একটা অসুস্থ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন কেন?" তবে কি বিয়ে ভেঙে গেল?

হেমছায়া হেমন্তের কাছে এসে বসে। "শোনো নতুন জামাই। বীণার মতো মেয়ে হয় না। দেখতে যেমন সুন্দর, গান গায়ও অপূর্ব। বীণা কি তোমাদের মতো ব্যায়াম করবে নাকি? তুমি যাকে রোগা বলছ, আজকাল একেই বলে স্লিম। এই স্লিম চেহারাই আজকাল কলকাতার মেয়ের স্টাইল। নূরজাহানের ওজন কত ছিল জান? মাত্র চল্লিশ সের। সারা ভারতের সম্রাজ্ঞী। তুমি ভাগ্যবান, বীণার মতো মেয়ে পেয়েছ।"

জামাইকে মাঝখানে বসিয়ে হেমছায়া গান জুড়ে দেন। নানা ধরনের ঠাট্টা ইয়ারকি। নিজের হাতে হেমন্তকে খাইয়ে দিলেন সন্দেশ। কমিক করছেন হেমছায়া। সবাই হাসছে। হেমন্তও হাসতে শুরু করল। হেমছায়া বীণাকে গান গাইবার কথা বলল। চোখের জল মুছে বীণা গাইল অপূর্ব গান। হেমন্ত মুগ্ধ। "আমায় ক্ষমা করে দ্যান বউদি। আমি বিয়ে করার আগে পিসির কাছে শুনেছিলাম মেয়ে নাকি রুগ্ণ। এখন বুঝতে পারছি পিসি এই বিয়েটা ভাঙচি দিতে চেষ্টা করছিল।" বীণাপিসি এখন হাসছে। অনি নিশ্চিন্ত হল নতুন পিসেমশাই বীণাপিসিকে ছেড়ে চলে যাবে না। বাসরে সারারাত ধরে গানবাজনা।

পরের দিন পিসেমশাই অনি আর শিবুকে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন। খুব মজার মজার গল্প করছিলেন। ওদের নিয়ে রেস্টুরেন্টে চপ, কাটলেট খাওয়ালেন। দু' ভাইকে দুটো ইস্টবেঙ্গলের জার্সি কিনে দিলেন। বউভাতের পর নতুন পিসেমশাই বীণাপিসিকে নিয়ে ধানবাদে চলে গেলেন। বিধুশেখরও চলে গেলেন খুলনায়, ছেলেমেয়ে বউকে নিয়ে। বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল।

যে রাজেন্দ্রর বরিশালে অত প্রতিপত্তি ছিল, সম্মান ছিল, দেশবিভাগের পর সেই রাজেন্দ্র অন্য মানুষ। বড় ছেলে দ্বিজেন এখন কলকাতায় প্র্যাকটিস করে। নিমতলা স্ট্রিটে একটা বড় বাড়িতে থাকে। দ্বিজেনের কাছেই থাকেন রাজেন্দ্র। স্ত্রী মারা গেছেন বছর কয়েক হল। দ্বিজেনের বাড়ি আনন্দশেখরের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। নতুন করে জীবন শুরু করতে হচ্ছে দ্বিজেনের। বরিশালে কত নামডাক পসার ছিল দ্বিজেনের। কলকাতায় এখনও তেমন চেনাশোনা হয়নি। বরিশালের লোক চোখ দেখাতে এলে দ্বিজেন তাদের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারেন না। ছোট বোন হেমছায়াকে মাঝে মাঝে দেখে যান দ্বিজেন। অনির জন্য সবসময় চকোলেট। দুপুরবেলা বাসে-ট্রামে ভিড় কম, রাজেন্দ্র মাঝে মাঝে হেমছায়ার কাছে আসেন। অনিকে কাছে টেনে গল্প করেন বরিশালের।

শান্তিসুধাই একদিন হেমছায়াকে বোঝাল—"হেম, অনিকে একটা ভাল স্কুলে

ভর্তি করে দে। তোর বড় ছেলে। আমার সঙ্গে হোলিচাইল্ড স্কুলের মাদার সুপিরিয়রের চেনাজানা আছে। কালকেই অনিকে নিয়ে স্কুলে যাব।" যেমন ভাবা তেমনি কাজ শান্তিসুধার। পরের দিন হেমছায়া শান্তিসুধার সঙ্গে হোলিচাইল্ড স্কুলে গেল অনিকে ভর্তি করতে। ক্যাথলিক স্কুল, মানিকতলার কাছে, একটু খরচা পড়বে। স্কুলের ইউনিফর্ম আছে। ভোরবেলা স্কুলের বাস নিয়ে যাবে, বিকেলবেলা পৌঁছে দেবে। লাল রঙের স্কুল বাড়ি। সামনে মোরাম বাঁধানো খেলার জায়গা। সেখানে সারি সারি পাম গাছ। টানা বারান্দা। সাদা স্কার্ট গাউন পরে সিস্টাররা মাঝে মাঝে বারান্দা দিয়ে হাঁটছেন। গলায় কালো মালায় ক্রস ঝুলছে। ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে স্কুল। দেয়ালে যিশু ও মেরীর ছবি। পরিষ্কার, ছিমছাম। সবাই ইংরেজিতে কথা বলছে। কিছুই বুঝতে পারছে না অনি। তবুও খুব ভাল লাগছে পরিবেশ। শিবুর মতো ও এখন স্কুলে পড়বে, কী মজা।

এর মধ্যে বিধুশেখর সবাইকে নিয়ে খুলনা থেকে ফিরলেন প্রায় পাকাপাকিভাবেই। দলে দলে হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে এপারে চলে আসছে। খুলনায় অবশ্য সেরকম সাম্প্রদায়িকতা দেখেননি বিধুশেখর। তবে ছেলে-মেয়েদের কথা ভেবে কলকাতায় ফেরার কথা ভাবছেন। বাড়ি ভর্তি লোক। এর মধ্যে ইন্দ্রজিতের জন্ম হল। এত ঠাসাঠাসি করে এক বাড়িতে থাকা যায় না। আনন্দশেখর ভাবছেন নিজেই উঠে যাবেন কোনও শহরতলিতে বাসা ভাড়া করে। তা হলে বাবা-মা ভাই-বোন এই বাড়িতে থাকতে পারবে।

খবরটা দিলেন জ্ঞান গুপ্ত। আনন্দশেখরের সহকর্মী। মাত্র দশ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি করলে নাকি বাস্তুহারারা জবরদখল কলোনিতে থাকতে পারবে। বেলঘরিয়ায় নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিন কাঠা করে জমি দিচ্ছে। পূর্ব বাংলা থেকে যারা বিতাড়িত, তাদের জন্য এই সুযোগ। দু' বন্ধু ঠিক করলেন কলকাতার পাততাড়ি গুটিয়ে নতুন জায়গায় জীবন শুরু করবেন, বেলঘরিয়ার প্রফুল্ল নগর কলোনিতে। দু'জনে নতুন জায়গা দেখে খুব খুশি। পাশাপাশি দুটো প্লট পেয়েছে। রাত্রিবেলা আনন্দশেখর হেমছায়াকে শোবার সময় বললেন, "জানো হেম, সত্যি খোলামেলা জায়গা। শিকারপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। খুব ভাল লাগবে তোমার এই নতুন কলোনি— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে নামকরণ করেছি। জ্ঞানবাবু এই কলোনির সেক্রেটারি, আমি প্রেসিডেন্ট।" হেমছায়া হাসতে হাসতে বলেন, "প্রফুল্লচন্দ্রের ছায়া আজও তোমায় ছাড়ল না। এখানে আশেপাশে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, সব ছেড়ে আবার নির্বাসনে যেতে হবে। তবে ওখানে গিয়ে তুমি যদি ভাল থাক, আমাকে মানিয়ে নিতেই হবে। আশেপাশে কোনও স্কুল নেই। ছেলেমেয়েরা তো বড় হচ্ছে। ওদের কী হবে?"

আনন্দশেখর বলেন, "আমরাই নতুন স্কুল করব কলোনিতে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা নতুন আদর্শে বড় হবে। নতুন করে গড়ার একটা আনন্দ আছে হেম।"

সব শুনে বিধুশেখর বললেন, "আনন্দ, আমি তো বাড়িতেই বসে আছি। তুই অফিস কাছারি নিয়ে থাকিস। আমি তোর বাড়ি তৈরির ব্যাপারে ভার নিলাম। তুই নিশ্চিন্তে থাক।"

বিধুশেখর সকালবেলা বেরিয়ে যান বেলঘরিয়ায়, রাতের দিকে ফেরেন। ফিরে এসে গল্প করেন বাড়ি কতটা তৈরি হল। বিধুশেখরই তদারকি করছেন নতুন বাড়ির। অনির দুঃখ হচ্ছে এই চেনাজানা সব ছেড়ে নতুন জায়গায় যেতে। মাসিক শুকতারার প্রচ্ছদে একটা রঙিন ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অনি। সুন্দর বাংলো বাড়ি, সামনে সুইমিং পুল। ওর বয়সি অনেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে সাঁতার কাটছে পুলে। ওদের সঙ্গে একটা কুকুরও জলে। অনিরও ইচ্ছে গ্রীষ্মের সারা দুপুর ওইরকম একটা পুলে সবাই মিলে সাঁতার কাটে। অনি শুকতারার ছবিটা বিধুশেখরকে দেখায়, "দাদু, আমাদের বেলঘরিয়ার বাড়ি এরকম হবে তো? আমাদের বাড়ির সামনে এরকম একটা যেন সুইমিং পুল থাকে।"

বিধুশেখর ছবি দেখে বলেন, "এর চেয়েও ভাল হবে তোদের বাড়ি। ওখানে একটা নয়। পরপর অনেকগুলো সুইমিং পুল। দিনরাত সাঁতার কাটতে পারবি। ঠিক এইরকম লাল টালির বাড়ি। বাংলো বাড়ি। প্রচুর খোলামেলা জায়গা। বিরাট মাঠ। বাড়ির সামনে পাহাড়ের মতো উঁচু রেললাইন চলে গেছে। রাতে ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বি। পাখির ডাকে তোদের ঘুম ভাঙবে।"

অনি ভাবে কত কথা। নতুন স্কুল কেমন হবে কে জানে? খারাপ লাগছে শিবুর সঙ্গে বিকেলবেলা আর পরেশনাথ মন্দিরে খেলা করতে পারবে না। রঙিন মাছগুলোকে দেবে না আর পাঁউরুটির গুলি। মন্দিরের সব গুপ্ত জায়গাগুলো অন্য ছেলেরা সব জেনে যাবে। ওখানে কি এরকম মন্দির আছে? সকালবেলা ভিস্তিওয়ালা ওখানে কি রাস্তা ধুইয়ে যায়? ওখানকার স্কুলের বাস কি বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে? ওখানে কি ফেরিওয়ালা বাড়িতে বাড়িতে জিনিস বিক্রি করে, বাদাম ভাজা, শোনপাপড়ি, আইসক্রিম? নতুন বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের ভিড় কি থাকবে? নাকি ওরা একা একা হয়ে যাবে? এইসব ভাবতে ভাবতে মন খারাপ হয়ে যায় অনির।

৭

অনি আবার নিজের সিটে ফিরে এল। যাত্রীরা বেশির ভাগ ঘুমে। যাত্রীদের প্রত্যেকের সিটে একটা ছোট করে ফ্লাটবেড টেলিভিশন সেট। অনি পরপর চ্যানেলগুলো পাল্টে দেখল। অনেকগুলো চ্যানেল। বেশির ভাগেই সিনেমা হচ্ছে। অনি ঘুরে ফিরে প্রথম চ্যানেলে ফিরে এল। বিরাট ম্যাপের ওপর প্লেনের

গতিপথ দেখাচ্ছে। ওদের প্লেনটা জাপানের কাছাকাছি এসে গেছে। স্থানীয় সময় বিকেল চারটে। প্লেনটা টোকিওতে থামবে না। সোজা ব্যাঙ্কক। আরও চারঘণ্টার পথ। টিভিটা বন্ধ করে অনি পুরনো দিনের কথা ভাবতে চেষ্টা করছে। স্মৃতিচারণে অনি এখন ফিরে গেছে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটের বাড়িতে।

খুলনা থেকে খানসাহেব আবার এসেছেন পরেশনাথ মন্দিরের কাছে শ্রীনাথ ভবনে, বিধুশেখরকে নিয়ে যাবার জন্য। কলকাতায় বিধুশেখরের কিছুই করার নেই। খুলনায় তবু কাজের মধ্যে ছিলেন। শুধু ভয় লাগে পুব বাংলায় মুসলমানেরা কেমন যেন মারমুখী হয়ে গেছে— সংখ্যালঘু হিন্দুদের কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। টুকরো টুকরো খবর ভেসে আসে ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, পাবনা থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের। বিধুশেখর অবশ্য খুলনায় তেমন কিছু বিদ্বেষ দেখেননি। শুধু ভয় লাগে বিজয় আর নীনার জন্য। ওরা স্কুলে যায়— নানারকম কটূক্তি শোনে। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু শিখতে হয়।

খানসাহেবকে দেখে বিধুশেখর আশ্চর্য হয়ে যান। স্টিমার কোম্পানির পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। খানসাহেব আবার ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে খানসাহেব বলেন, "দেখুন বিধুশেখরবাবু, আপনার খুলনায় ফিরে যেতে দ্বিধা হচ্ছে, সংকোচ হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি আপনার দ্বন্দ্ব। আপনি যদি তলিয়ে দেখেন আমরা বাজিকরের পুতুলের মতো। বাজিকর নাচাচ্ছে, আমরা নাচছি। রাজনৈতিক নেতারা সোনার বাংলাকে দু'ভাগ করে দিল। ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ লাগিয়ে দিল। ইংরেজরা যাবার আগে চিরকালের জন্য হিংসার বীজ পুঁতে দিল হিন্দু আর মুসলমানের মাঝে। সে-সব বীজ এখন অঙ্কুরিত হচ্ছে, পরে মহীরুহ হয়ে দেখা দেবে। তখন কী হবে কে জানে? ধর্মের নামে আমরা সব পশু হয়ে গেছি। আমরা সবাই বিধর্মী। আপনি আমার গুরুজন। আপনার কোনও অকল্যাণ হবে না যতদিন আমি বেঁচে আছি। আপনি আমার সঙ্গে খুলনায় চলে আসুন আমার কোম্পানিতে। আপনি ছাড়া কেউ আমার কাজ করতে পারবে না। আপনাকে আমার চাই।"

"দেখুন খানসাহেব, আপনি যখন আমাকে নিতে এসেছেন, আমি নিশ্চয়ই খুলনায় ফিরে যাব। তবে মাসখানেক দেরি হবে। আনন্দ সামনের সপ্তাহেই বেলঘরিয়ায় নতুন বাড়িতে চলে যাবে। ওরা একটু গোছগাছ করে বসলেই আমি, আমার স্ত্রী, বিজয় ও নীনাকে নিয়ে ফিরে যাব। কাজের মধ্যে থাকলে হয়তো আমি ভাল থাকব। ভাল কথা, পুরনো বাড়িটায় উঠব ভাবছি। আপনি একটু দয়া করে বাড়িওয়ালাকে বলে রাখবেন যাতে ওই বাড়িটা পাই।"

এবার বাসাবদলের পালা। অনির কষ্ট হচ্ছে সব ছেড়ে নতুন জায়গায় যেতে। হোলিচাইল্ড স্কুলে কত নতুন বন্ধু হয়েছে। তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। নতুন

জায়গায় কেমন স্কুল, কেমন টিচার, কেমন বন্ধু কে জানে? হেমছায়া আগের দিনে সব গোছগাছ করে রেখেছেন। একটা বড় ট্রাঙ্কে রান্নার বাসন সব গুছিয়ে রাখলেন। আবার নতুন করে সংসার শুরু করা। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। একটা স্থিতি দরকার। হেমছায়ার কোনও ধারণা নেই বাস্তুহারা কলোনি কেমন?

ভোরবেলা বাড়ির সামনে একটা লরি এসে দাঁড়াল। সবাই মিলে ধরাধরি করে জিনিসপত্র তোলা হল। খাট, বিছানা, একটা ছোট টেবিল। বাসনকোসন, অর্গান, সেতার, বেহালা, গোটা দুয়েক দেয়ালে টাঙাবার ছবি— একটা হেমছায়ার বিয়ের ছবি, একটা রবীন্দ্রনাথের। কীই বা জিনিস। একটা লরিতে সব এঁটে গেল। ঠিক হল প্রথমে আনন্দশেখর আর অনি লরিতে করে যাবে। বিকেলে সবাই আসবে বাসে করে নতুন বাড়িতে। ওরা নাকি উদ্বাস্তু কলোনিতে যাচ্ছে নতুন করে জীবন শুরু করতে। অনি উদ্বাস্তু কথার মানে তখনও জানে না।

অনির খুব ইচ্ছে লরির পেছনে বসে দেখতে দেখতে যায় সারা পথ। কোথায় কলকাতা শেষ হয় অনির খুব জানার ইচ্ছে। ওরা নাকি কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে। লরির ড্রাইভার অনির জন্য একটা চেয়ার পেতে জায়গা করে দিল। লরির ডালার পাশে লম্বালম্বি একটা লোহার রড আছে। ওটা শক্ত করে ধরে রাখতে বলল। আনন্দশেখর সামনে বসলেন ড্রাইভারের পাশে। আস্তে আস্তে লরি রওনা দিল। অনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে শিবু হাত নাড়ছে। চোখের সামনে মিলিয়ে গেল পরেশনাথের মন্দির— ওর ছোটবেলার রত্নদ্বীপ।

অনি তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। স্কুলের যাবার পথেই লরিটা যাচ্ছে। অনির রাস্তাঘাট সব মুখস্থ হয়ে গেছে। সেই মোড়ের মিষ্টির দোকানটা— একটু ছাড়িয়ে সর্বমঙ্গলা অয়েল মিল। মালিকের ছেলেকে একসময় আনন্দশেখর পড়িয়েছিলেন। সেই তেলের ঘানিতে শিবু আর অনি যখন সর্ষের তেল কিনতে যেত, ওদের কাছ থেকে এক আনা কম পয়সা নিত। গুরুদক্ষিণা হিসেবে। আস্তে আস্তে লরিটা স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। রোববার, রাস্তাঘাট ফাঁকা। অনির বুকটা কেমন করে উঠল। লোহার রেলিং দেওয়া পাঁচিলটা দেখল। ছুটির সময় অনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই টানা বারান্দা। যেখানে সকালবেলা প্রার্থনা হত যিশুর নামে। আর-একবার দেখল, পামগাছগুলো, মোরাম বাঁধানো খেলার জায়গাটা। বিদায় হোলিচাইল্ড। আর কখনও অনি ঢুকবে না এই স্কুলের চত্বরে।

একটু পরেই মানিকতলার বাজার, সেখানে ওদের এক জেঠিমা থাকতেন। ওরা বলত 'রেডিও জেঠিমা', কারণ বিরাট একটা রেডিয়ো ছিল ওদের বাড়িতে। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে অনি খুব আসত সেই 'রেডিয়ো' জেঠিমার বাড়িতে। খুব গল্প হত তখন। লরি এবার এল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। এবার আরও

উত্তর দিকে যেতে হবে বি টি রোড ধরে। এ-সব রাস্তায় অনি খুব একটা আসেনি। ফাঁকা রাস্তা। দু'পাশে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া, গাছ উঁচু হয়ে রাস্তাকে চাঁদোয়ার মতো ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। সত্যি সুন্দর ছিল সেই যুগের কলকাতা। কালো পিচের রাস্তা কোন দূরে একটা চুলে বাঁধা ফিতের মতো সরু হয়ে মিশে গেছে। বেশ-কিছুক্ষণ যাবার পর একটা বাসের পেছনে লরি এসে থেমে গেল। কিছু যাত্রী ওঠানামা করছে। কন্ডাক্টর চিৎকার করছে 'চিড়িয়ামোড়, চিড়িয়ামোড়' করে। নামটা শুনে অনির হাসি পেল। গাছে গাছে কোনও পাখি তো দেখতে পাচ্ছে না। কেন যে চিড়িয়ামোড় নামটা রেখেছে কে জানে? বাসটাকে ছাড়িয়ে লরি এগিয়ে গেল অনেকদূরে। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর একটা রেলওয়ে ওভারব্রিজ দেখতে পেল— লেখা ডানলপ। ডানলপ ব্রিজ ছাড়িয়ে একটু যাবার পর বড় রাস্তা ছেড়ে লরি ঢুকল লাল সুরকি রাস্তায়। উঁচু-নিচু পথ। দু'পাশে খোলা নর্দমা। ইটের খোলা, টেক্সটাইল মিল ছাড়িয়ে লরি এবার ঢুকল মাটির রাস্তায়। অনির মনে হল যেন শিকারপুরের গ্রামে চলে এসেছে। শুধু সাইকেল আর রিকশা দেখতে পাচ্ছে। মাটির রাস্তায় লরিটা খুব ঝাঁকানি দিচ্ছে। এবড়ো-খেবড়ো পথ। এখানে কোনও পাকা বাড়ি নেই। ছোট ছোট চালার ঘর— দরমার দেয়াল, টালির ছাদ। বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগান। অনি দেখে— খালি গায়ে, খালি পায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছে। একটু পরেই লরিটা থামল একটা বেড়ার ঘরের সামনে।

অনি লরি থেকে নেমে পড়ল আশাভঙ্গ হয়ে— এই ওদের নতুন বাড়ি? কোথায় ওদের বাংলো, কোথায় ওদের সুইমিং পুল? এই মাটির বাড়িতে থাকতে হবে? শুকতারার মলাটের ছবির সঙ্গে কোনও মিল নেই এই বাড়ির। মাটি দিয়ে উঁচু করে মেঝে করা হয়েছে। নিকোনো মেঝে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিরাট বিরাট ফাটল। এর মধ্যে দু'-একটা ইঁদুর ছোটাছুটি করছে। ফাঁকা ফাঁকা দরমার বেড়া দিয়ে দেয়াল। ঘরের মাঝখানে একটা বড় কাঠের থাম। লাল টালির ছাদ। ঘর বলতে একটা। তার পাশে ছোট্ট একটা রান্নাঘর। জল নেই, কল নেই। আলো নেই, ফ্যান নেই, রেডিও নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই। অনি আনন্দশেখরকে জিজ্ঞেস করে, "রাত্রিবেলা কী করে থাকব?" "কেন, হারিকেনের আলোয় তোমরা পড়াশুনো করবে?" আনন্দশেখর অনিকে নিয়ে বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। বাথরুম, পায়খানা একটু দূরে। অনি বাবাকে জিজ্ঞেস করে—

"বৃষ্টি হলে এই বাড়ি ভেঙে পড়বে না তো?"

আনন্দশেখর হেসে বলেন, "দূর বোকা, এই বাড়ি অনেক মজবুত, অনেক খাঁটি— চারদেয়ালের সিমেন্টের বাড়ি থেকে। গ্রীষ্মের সময় হাওয়া দেবে দরমার দেয়ালের ভেতর থেকে। শীতে আসবে রোদ্দুর। এখানে কলকাতার ভিড় নেই। সকালবেলা দেখবি, কী বিরাট সূর্য ওঠে এখানকার আকাশে। আমাদের বাড়িটা

পুবমুখী। বারান্দায় বসেই সূর্য ওঠা দেখবি। এই সূর্য না থাকলে এই পৃথিবীতে গাছপালা, জন্তুজানোয়ার কিছুই থাকত না। প্রাণ-সঞ্জীবনী সূর্য। রাতে দেখবি হিরের মতো তারার চুমকি। এখানে বাতাস অনেক পরিষ্কার, আকাশ অনেক নীল। সন্ধেবেলা আকাশের দিকে তাকালে দেখবি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ঘরে ফিরছে। এখানে আমরা নিজের হাতে বাড়ির সামনে বাগান করব— সজ্জির বাগান, ফুলের বাগান। কলকাতায় থেকে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে পর পর পুকুর আছে। একটা বড় দীঘি আছে আমাদের শিকারপুরের বাড়ির মতো। কলকাতায় তো এ-সব দেখিসনি। আমি ছোটবেলা এরকম গ্রামে বড় হয়েছি। দেখবি, এখানে থাকতে থাকতে ভাল লাগবে।"

"এখানে স্কুল কতদূর? কী করে যাব বাবা?"

"অত চিন্তা করিস না। সবে তো ক্লাস টু হল। কলোনির শেষেই আমরা একটা স্কুল করেছি। আমাদের গ্রামে বলত পাঠশালা। সেই পাঠশালায় যাবি।"

অনি ঘুরে ঘুরে দেখে। ওদের পাশেই আর-একটা দরমার বাড়ি। চালটা খড়ের। ভেতরে লোকজন। সামনে একটু সুন্দর বাগান। অনিকে দেখে ওরই বয়সি দুটো ছেলে বেরিয়ে আসে।

"কী নাম তোমার?" বড় ভাই জিজ্ঞেস করে।

"অনি, ভাল নাম অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়।"

"আমার নাম খোকন, এ আমার ছোট ভাই, এর নাম গৌতম। আমাদের বাড়ির ভেতর আসবে?"

অনি বলে, "তোমাদের এখানে নাকি সারি সারি পুকুর আছে, উঁচু রেল লাইন আছে, আমাকে দেখাবে? আমার দাদু খুব গল্প করত। বলত, দেখবি ওখানে কত সুইমিং পুল আছে।"

"তোমার দাদু ঠিকই বলেছে।" গৌতম বলে, "আমরা ওই পুকুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটি। তোমাকেও সাঁতার শিখিয়ে দেব। খুব মজা হবে।"

অনির ভালই লাগল নতুন বন্ধু পেয়ে। এর মধ্যে লরিওয়ালা মালপত্তর সব নামিয়ে ঘরের মধ্যে গুছিয়ে রেখে চলে গেছে। আনন্দশেখর অনিকে দেখে বলে, "এর মধ্যে বন্ধু পেয়ে গেছ? যাও ওদের সঙ্গে একটু ঘুরে চারদিকটা দেখে এসো, আমি যতটা পারি, বাড়ি গুছিয়ে রাখি। বিকেলবেলা তোমার মা সবাইকে নিয়ে এসে পড়বে।"

"কাকাবাবু, অনিকে নিয়ে আমরা একটু ঘুরে আসি"— খোকন বলে। গৌতম ও খোকন অনিকে নিয়ে গেল ওদের নতুন জায়গা দেখাতে। অনি আশ্চর্য হয়ে দেখছে। পরপর এতগুলো পুকুর ও কখনও দেখেনি। দুটো পুকুরের মাঝে চওড়া মাঠ। সেটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল বিরাট মাঠে। ওরা বলে ব্যান্ড। সত্যিকারের তেপান্তরের মাঠ। এখানে কেউ থাকে না। অনি আশ্চর্য হয়ে দেখে

কত উঁচু রেল লাইন চলে গেছে। ওদের চারতলা শ্রীনাথ ভবনের থেকে বোধহয় উঁচু হবে রেললাইন। চারদিকে জংলা ফুল। কচুরিপানা, হোগলার বন। গৌতম আর খোকন সব গাছপালা চিনিয়ে দিচ্ছে অনিকে।

খোকন বলে, "চল অনি, আমরা রেললাইনের ওপরে উঠি, ওপর থেকে আমাদের বাড়িগুলো পুতুলবাড়ির মতো দেখাবে। দেখি তুই তোদের বাড়িটা চিনতে পারিস কি না?"

অনি খুব উত্তেজিত অত উঁচু রেললাইনে উঠতে পারবে বলে। সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গেছে। অনির মনে হচ্ছে যেন কোন পাহাড়ে উঠছে। চারিদিকে কাঁটাঝোপ, লাল আর হলুদ কুটুস ফুল ছেয়ে আছে। মনে হচ্ছে কে যেন রঙিন শাড়ি শুকোতে দিয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক। ওরা উঠছে তো উঠছে। অনেক পরে রেললাইনের ওপরে উঠল।

অনি জিজ্ঞেস করে, "যদি ট্রেন এসে পড়ে? আমরা কোথায় দাঁড়াব?"

"ভাবিস না অনি"— বিজ্ঞের মতো বলে খোকন, "এ লাইনে ট্রেন চলাচল খুবই কম। সারাদিনে সাত-আটটার বেশি ট্রেন দেখবি না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একদিন বরানগর স্টেশনে যাব।"

অনি ওপর থেকে চেনার চেষ্টা করছে ওদের বাড়িটা। সত্যিই পুতুল খেলার বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। অত দূর থেকে সবই এক লাগছে। সব লাল টালির বাড়ির মাঝে হঠাৎ খোকনদের খড়ের ছাদের বাড়িটা দেখতে পায়। অনি জানে তার পাশের বাড়িটা ওদের। অনি আঙুল দিয়ে দেখায় ওদের বাড়িটা।

"ঠিকই ধরেছিস"— গৌতম বলে।

হঠাৎ ট্রেনের হুইসিল ওরা শুনতে পায়। খোকন বলে, "চল, একটু নেমে দাঁড়াই। দেখবি কী জোরে শব্দ করে তাড়াতাড়ি ট্রেনটা চলে যায়।" ওরা রেললাইন থেকে একটু নীচে এসে দাঁড়ায়। ঝিকঝিক করতে করতে কী জোরেই ট্রেনটা চলে গেল।

গৌতম সব দিকগুলো চিনিয়ে দিচ্ছে। "বুঝলি অনি, রেললাইনটা পুব-পশ্চিম বরাবর চলে গেছে— পুবদিকে গেলে শিয়ালদা পৌঁছে যাবি— যেমন এই ট্রেনটা যাচ্ছে। পশ্চিমদিকে ডানকুনি— উল্টোদিক দিয়ে ট্রেনটা তখন যাবে। এই পর পর পুকুরগুলো কেন হয়েছে জানিস? ওখানকার মাটি কেটে রেললাইনটা উঁচু করা হয়েছে। একটু দূরে গেলে দেখতে পাবি আর-একটা রেললাইন এর নীচ দিয়ে গেছে। তার মানে রেললাইন থেকে আমরা উত্তর দিকে তাকালে প্রথমেই দেখব ব্যান্ড— বিরাট ময়দান— তার পর সার সার পুকুর, তার পর কলোনি— আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়িগুলো একটু উঁচু জমিতে। কলোনিটা ক্রমশই ঢালু হয়ে গেছে পুবদিকে। বৃষ্টির সময় আমাদের

বাড়ির সামনে কোনও জল জমে না— কিন্তু পুবদিকে কলোনির দিকে যদি যাস মনে হবে যেন বাড়িগুলো দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে আছে— চারদিক জলে জলাকার। এইজন্য আমাদের জায়গাটাকে বলে হাইল্যান্ড আর পুবদিকের জায়গাটার নাম লোল্যান্ড।"

ওরা রেললাইন থেকে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। এতবড় মাঠ ও কলকাতায় দেখেনি। ওর খুব ছুটতে ইচ্ছে হল। ওর সঙ্গে সঙ্গে গৌতম ও খোকন পাল্লা দেয়। ছুটতে ছুটতে ওরা প্রায় ব্যান্ডের থেকে পুব দিকে এসে পড়ে। এখানে পুকুরটা বিরাট দীঘি হয়ে গেছে। খোকন বলে, "দীঘির ওপাশে যে বাড়িগুলো দেখছিস— ওটাই হচ্ছে লোল্যান্ড।"

অনি দীঘির কাছে যায়। টলটল করছে জল। অনেকে সাঁতার কাটছে ওপারে। মাঝে মাঝে বেগুনিফুল। গৌতম বলে, "এগুলো হচ্ছে কচুরিপানা— এরা শেকড় দিয়ে জল থেকে সব ময়লা শুষে নেয়। এইজন্য জলটা এত পরিষ্কার। কচুরিপানা শুকিয়ে গেলে আমরা ভেলা বানিয়ে পুকুরে ভাসব। ছোট ছোট নৌকোর মতো, কী মজাই লাগবে পুকুরের ওপর ভাসতে ভেলায় চড়ে।"

এবার ওরা দীঘির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফেরে। বিরাট বড় বড় ঘাসের মতো জঙ্গল। মাঝে একটা কঞ্চির মতো লাঠি, তার ওপরে হলুদ ভেলভেটের মতো একটা নরম জিনিস। যেন বিরাট কাঠির ওপরে হলুদ রঙের সরু আইসক্রিম। অনির খুব ইচ্ছে হল ওই ধরনের একটা লাঠি নেয়। খোকন বলে, "একে বলে হোগলা বন। দাঁড়া, আমার কাছে একটা ছুরি আছে। আমি কেটে দিচ্ছি। এই হোগলার শরগুলো দিয়ে আমরা তির তৈরি করি। বিকেলে তির-ধনুক খেলব এই ব্যান্ডে।"

অনি হোগলার শরটা পেয়ে হাতের ওপর আস্তে আস্তে ঝাড়ে। কী সুন্দর হলুদ রঙের পাউডার ছড়িয়ে পড়ছে। খোকন বলে, "এই হোগলগুড়ি নাড়ুর মধ্যে দিলে দারুণ খেতে লাগে।"

খোকন অনির জন্য এক ডজনের মতো হোগলার শর কেটে দেয়। অনি খুব খুশি। গৌতম বলে, "কাল সারাদিন আমরা এই দীঘিতে স্নান করব। হাত পা ছুড়তে ছুড়তে হঠাৎ দেখবি একদিন তুই নিজে নিজেই সাঁতার শিখে গেছিস। যখন সাঁতারটা রপ্ত হবে, আমরা দীঘির এপার-ওপার করব।"

অনি এবার বুঝতে পারে দাদুর কথা। ঠিকই বলেছিলেন, "পরপর সুইমিং পুল আছে।" বেড়ার বাড়ি দেখে যতটা মন খারাপ হয়ে গেছিল, দীঘি, ট্রেন আর হোগলার বন দেখে ততই আনন্দ লাগছে। ওরা তিনজনে মিলে যতদূর খুশি বেড়িয়ে আসবে। তির-ধনুকের যুদ্ধ করবে। দীঘিতে সাঁতার কাটবে। আর ট্রেন গেলে হাত নাড়বে যাত্রীদের।"

ওরা ঘাসের ওপর বসে গল্প করছে। অনি বলছে পরেশনাথ মন্দিরের কথা— সেই সব গুপ্ত জায়গার কথা— যেখানে ওরা লুকোচুরি খেলত। বলল সেই আশ্চর্য প্রদীপের কথা— যেটা নিভে গেলে নাকি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। গৌতম আর খোকন বলছে ওদের বেলেঘাটার কথা। তার আগে, ওরা যখন খুব ছোট, ওরা লাহোরে থাকত, সেইসব লাহোরের গল্প। লাহোর অনেক দূরে, এখন পাকিস্তানের মধ্যে চলে গেছে। ওরা ঠিক দাঙ্গার আগেই সব-কিছু ফেলে লাহোর থেকে চলে এসেছে।

অনি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে কী ভালই না লাগছে আকাশটাকে দেখতে। গৌতম ও খোকন ওর পাশে শুয়ে।

"তোদের স্কুল কতদূর রে? আমাকে তো আবার নতুন করে ভর্তি হতে হবে।"

"বেশিদূর নয়, দশ মিনিটের হাঁটাপথ। টিনের চালাঘর, আমরা সবাই মাটিতে বসি। প্রাথমিক স্কুল। পর পর চারটে ঘর, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। শুনছি নাকি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পরে হবে। কিচ্ছু ভাবিস না। আমরা সবাই কাছাকাছি থাকব। দারুণ মজা হবে।"

অনি অনেকটা আশ্বস্ত হয়। ঘণ্টা চারেক ওরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। বেশ খিদে পেয়ে গেছে। অনি বলে, "চল, বাড়ির দিকে ফেরা যাক। হয়তো মা এর মধ্যে এসে গেছে।"

ফিরতে ফিরতে অনি জিজ্ঞেস করে, "তোদের বাড়িতে কে কে আছে?"

গৌতম বলে, "আমরা পাঁচ ভাই আর বাবা— এ ছাড়া বিধবা জেঠিমা, আমরা ওনাকে বড়মা বলি। বড়মার দুই ছেলে, এক মেয়ে। ওঁরাও আছেন আমাদের সঙ্গে।"

"তোর মার কথা বললি না তো?"

"আমি যখন খুব ছোট, আমার ছোটভাই হবার সময় মা মারা যায়। আমার আবছা আবছা মনে পড়ে মাকে।" গৌতমের চোখটা ছল ছল করে ওঠে মার কথা বলতে গিয়ে।

ওরা গল্প করতে করতে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে দেখে বাড়ির উঠোনে মাদুর, সতরঞ্চি পেতে অনেক লোকে গল্প করছে। পরেশনাথের বাড়ি থেকে সবাই চলে এসেছে। গোল হয়ে বড়রা চা খাচ্ছে। খুব হাসি, হইচই। গৌতমদের বাড়ির সবাই যোগ দিয়েছে। গোধূলির আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের দেখে হেমছায়া বলে ওঠেন— "কী অনি, সারাক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করলি? নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তোরা বসে পড়। আমি লুচি, আলুর দম নিয়ে এসেছি।" অনি, গৌতম ও খোকন পাশাপাশি বসে পড়ল। হেমছায়া ওদের খেতে দেন। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আনন্দশেখর বলে ওঠেন, "জ্ঞানবাবু, এবার একটু গানের আসর বসুক।"

আনন্দের সহকর্মী জ্ঞানেন্দ্র— খুবই গুণী লোক। ভাল গান করেন। যদিও আনন্দশেখরের সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করেন, গানই হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রর পেশা ও নেশা। অনেক ছাত্রছাত্রী চারিদিকে। ওঁর বড় ছেলে দুলাল দারুণ বেহালা বাজায়। মেজোছেলে মানিক বাজায় তবলা। ওরাও সব গানবাজনার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসল। জ্ঞানেন্দ্র গাইছেন রবীন্দ্রসংগীত, গাইছেন ভজন। সঙ্গে বেহালায় দুলাল, তবলায় মানিক, সেতার ধরেছেন আনন্দশেখর। একটার পর একটা গান গাইছেন জ্ঞানেন্দ্র। বেশ রাত হয়ে গেছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। এর পরে গাইলেন হেমছায়া। সবাই হেমছায়ার গানের খুব প্রশংসা করল। এর পর গাইল ইনাপিসি, তার পর ফুলদি— গৌতমের জেঠতুতো দিদি। সবশেষে দুলালদা বাজালেন বেহালায় পুরিয়া ধানেশ্রী— তবলায় মানিকদা। দুজনেই খুব ওস্তাদ।

বেশ রাত হয়ে গেছে। অনি চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোনও ঘরে ইলেকট্রিক আলো নেই— রাস্তায় আলো নেই। শুভ্র জ্যোৎস্নার আলো। খোকন একটা হারিকেন জ্বালিয়ে এনেছে। অনির মনে হল হারিকেনে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। একটু পরে গৌতমের বড়মা বলে ওঠেন, "হেমছায়া, অনেক রাত হল। সবাই আমাদের বাড়িতে এসো। আমি খিচুড়ি আর বেগুনভাজা করে রেখেছি। কলাপাতা আছে। সবাই মিলে একসঙ্গে খেয়েদেয়ে নিই।"

বিরাট লাইন করে বসা হল গৌতমদের বাড়ির মাটির বারান্দায়। অনির মনে হল কোনও গ্রামে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে বসেছে পাতা পেতে। মেয়েরা সব পরিবেশন করছে। খাবার পরে সব দল বেঁধে পুকুরঘাটে গেল হাত ধুতে। কেমন বাঁশ দিয়ে ধাপে ধাপে পাটাতন করা হয়েছে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা অনির। জ্যোৎস্নার আলোয় চারদিক ভেসে গেছে।

শুতে শুতে অনেক রাত হল। মশারির ভেতর এর আগে অনি কখনও শোয়নি। হারিকেনের আলোটা কম করে রাখা হয়েছে ঘরের এককোণে। চারিদিকে শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। অনেক রাতে ঝিকঝিক করতে করতে একটা ট্রেন চলে গেল। সেই শব্দটা শুনতে শুনতে অনি কখন ঘুমিয়ে পড়ল কে জানে?

নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসতে লাগল মাসখানেক। গ্রীষ্মকাল। স্কুলের কোনও তাড়া নেই। অনি দিনরাত গৌতম আর খোকনের সঙ্গে খেলা করে। পুকুরে ঘণ্টার পব ঘণ্টা স্নান করে। এর মধ্যেই সাঁতারটা রপ্ত করে ফেলেছে। হোগলার বনে গিয়ে হোগলগুড়ির কাঠি কেটে আনে, ছুরি দিয়ে তির বানায়। রেল লাইনের ধারে ব্যান্ডে ওরা তির-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করে। কখনও রাম-রাবণের যুদ্ধ— কখনও কুরুপাণ্ডবের। বিকেলবেলা ফুটবল খেলে। খোকনই পাম্প দিয়ে ব্লাডারটা ফুলিয়ে বলটা বানায। ওদের দলে আরও কিছু ছেলে যোগ দিয়েছে— দীনেশ, পল্টু, তপন, শ্যামল। যতক্ষণ না সন্ধে হয় ওরা ফুটবল খেলে।

রেশন, বাজার সবই বেশ দূরে, এই বাড়ি থেকে। কলোনির শেষে, লোল্যান্ডে একটা মুদি দোকান আছে। হেমছায়া অনিকে পাঠায় ওই দোকানে কেনাকাটা করতে। সঙ্গে কেয়া যায়। বিরাট ফর্দ লিখে দেয় হেমছায়া। সেই ফর্দ মিলিয়ে তেল, নুন, চাল, ডাল, চিনি কিনে আনে ওরা বাকিতে। দোকানদার একটা বিরাট লালখাতায় তারিখ দিয়ে হিসেব লিখে রাখে। মাসের প্রথমে আনন্দশেখর টাকাটা শোধ করে দেন। বাজার, রেশন সাধারণত অজয়কাকু করেন। বেশ দূর। বাড়ি থেকে দু'-তিনমাইল হবে। অনি অজয়কাকুর সঙ্গে যায়। মাঝে মাঝে অফিসের পর আনন্দশেখর শিয়ালদা থেকে বাজার করে আনেন। এখানে কলোনিতে রাতটা খুব তাড়াতাড়ি নামে। হারিকেনের লণ্ঠনে ছায়ারা বড় বড় দেখায়। গা শির শির করে। দরমার বেড়া দিয়ে শোঁ শোঁ করে হাওয়া ঢোকে। মটমট করে ওঠে সারা বাড়িটা। দূরে শিয়ালের ডাক শোনা যায়। আনন্দশেখর বেশ রাত করে বাড়ি ফেরেন।

অনি অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে বাবার কথা ভাবে। বাবা যেই বাড়ি ঢোকে অনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে যায়।

ছুটির দিনে বিরাট মিটিং বসে আনন্দশেখরের বাড়িতে। জ্ঞানেন্দ্র হয়েছেন এই কলোনির সেক্রেটারি, আনন্দশেখর প্রেসিডেন্ট। কলোনির উন্নতির জন্য নানাধরনের পরিকল্পনা চলছে। কলোনিতে খাবার জলের ভীষণ কষ্ট। মাইলখানেক দূরে মিউনিসিপ্যালিটির একটা কল। সেখানে বিরাট লাইন দিয়ে জল আনতে হয়। অনি আর কেয়া জল নিয়ে যখন ফেরে, এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়। অন্তত গোটা দুয়েক টিউবওয়েল দরকার— একটা লোল্যান্ডে, একটা হাইল্যান্ডে।

কলোনির নাম হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামে— প্রফুল্লনগর। কলোনি যেখান থেকে শুরু— হিন্দুস্থান মিলের কাছে— সেখানেই নতুন স্কুল হয়েছে— প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যাপীঠ। টিনের চাল। এখনও ছাত্রছাত্রীদের জন্য চেয়ার টেবিল নেই, ওরা মাটিতে আসন পেতে বসে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য চেয়ার, টেবিল আছে। আছে ব্ল্যাকবোর্ড। কেয়া, অনি, খোকন— সবাই ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হল। গৌতম ক্লাস টুতে। বেশ-কিছু শিক্ষক, শিক্ষিকা— পূর্ব বাংলার স্কুলে পড়িয়েছেন। তাঁরাই এই স্কুল শুরু করলেন।

বৃষ্টিতে হাঁটু পর্যন্ত কাদা হয়। মাটির রাস্তা। চারিদিক জলে জলাকার। তখন সব পুকুরগুলো ভর্তি হয়ে মিশে যায়। অনির মনে হয় কোন সাগরে এসে পৌঁছেছে। রাস্তাগুলো ঠিক করা দরকার। যেহেতু জবরদখল জমি, মিউনিসিপ্যালিটি কলোনির উন্নয়নের জন্য কিছুই করবে না। মিটিং বসে আনন্দশেখরের বাড়িতে। অন্তত রাস্তাটা ঠিক করা দরকার। ইট, সুরকি কেনার মতো পয়সা কারও নেই। রেললাইনটা শক্তপোক্ত করা হয়েছে কয়লার ঘ্যাস

দিয়ে। যাতে জলটা না জমে ঢালুতে। সেই রেললাইনের ঢালু থেকে দল বেঁধে চুপড়ি করে ঘ্যাস এনে রাস্তা তৈরি করে কলোনির লোকেরা, সবাই যোগ দেয়। দুপুর পর্যন্ত কাজ চলে। বিরাট ডেকচিতে চা বসিয়ে দেন হেমছায়া। বাড়িতে এখন ছোট ছোট প্রচুর চায়ের গ্লাস। রাস্তা তৈরির পর ভলান্টিয়ারদের জন্য চা ও পটল বিস্কুট সবার জন্য তৈরি থাকে। অনি, গৌতম, খোকন অল্পবয়সেই চা খাবার আনন্দ পায় বড়দের সঙ্গে। মাঝে মাঝে পুকুরগুলো থেকে সবাই কচুরিপানা তোলে। ছোটরাও সাহায্য করে। প্রতিটি পুকুরের চারপাশে বাঁশের ঘাট বানিয়েছে। বড়দের সঙ্গে যোগ দেয় অনি, গৌতম ও খোকন— কলোনির উন্নতির জন্য। আনন্দশেখর বলেন, "শ্রমের মর্যাদা শেখো।"

অনি এখন ছিপ দিয়ে মাছ ধরে। পুকুর আর ঝিলে সারাদিন সাঁতার কাটে গৌতম আর খোকনের সঙ্গে। বিকেলে দলবেঁধে বেরিয়ে যায়। কখনও ফুটবল খেলে। কখনও হাঁটতে হাঁটতে ওরা রেললাইন পার হয়ে অনেক দূরে চলে যায়— তেপান্তরের মাঠে। আনন্দশেখর বাড়ির সামনে অনেক গাছ লাগিয়েছেন। রাতের বেলা অফিস থেকে ফিরে ফুলের বাগানে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করেন। অনি আর কেয়াকে হারিকেন ধরে থাকতে হয় বাবার বাগানের কাজে সাহায্য করার জন্য। অনির ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তখন। বাইরে বেশ মশা। সারাদিনের চা পাতা একটা ছোট বালতিতে জমিয়ে রাখা হয়। আনন্দশেখর গোলাপগাছের গোড়ার চারিপাশে ছড়িয়ে দেন সেই চা পাতা। বিরাট বিরাট ফুল গোলাপ গাছে। সামনে একটা বিরাট বকফুল গাছ। সাদা সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। অনির কাজ হল গাছে উঠে বকফুল তোলা। বেশ লাগে বেসন দিয়ে বকফুল ভাজা খেতে। এ ছাড়া নানা ধরনের শাকসব্জির বাগান হয়েছে। অনি বিকেলবেলা বাগানে জল দেয়। খোকন শিখিয়ে দিয়েছে কী করে টিনের কৌটোর ওপর আঙুল দিয়ে জলের ঝাপটা দিতে হয় সব্জির বাগানে।

অনি আর কেয়া একই ক্লাসে যায়— ক্লাস থ্রিতে। অনিকে এক ক্লাস উঁচুতে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। খোকনও ওদের ক্লাসে পড়ে। গৌতম এক ক্লাস নিচুতে। কী সব কঠিন কঠিন বিদঘুটে অঙ্ক— কড়াকিয়া— গণ্ডাকিয়া, সিঁড়িভাঙা। ইংরেজি স্কুলে পড়ে অনি কখনও এ ধরনের অঙ্ক করেনি। পাঠশালার অঙ্ক কিছুতেই বুঝতে পারে না অনি। এ-সব ব্যাপারে আনন্দশেখরের কোনও সহানুভূতি ছিল না। খুব দাপট ছিল আনন্দশেখরের। রাগী ছিলেন খুব। ছেলেমেয়েরা একটু দূরে দূরেই থাকত। সপ্তাহের ছটা দিন বাবার সঙ্গে খুব কম যোগাযোগই ছিল অনির। আনন্দশেখর ভোরবেলা অফিসে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। রোববারের ব্যাপার আলাদা। ভোরে উঠে চা খেতে খেতে যুগান্তর কাগজটা পড়তেন মনোযোগ দিয়ে। তার পর গম্ভীর গলায় বলতেন, "কেয়া আর অনি,

তোমাদের বইপত্র নিয়ে এসো আমার কাছে।” বড় খাটের ওপর সবাই বসে। অনি আর কেয়ার বুক কাঁপছে। প্রথমে ডিক্টেশন। তার পর কঠিন কঠিন ইংরেজি বানান সাইকোলজি, ডায়ারিয়া, থাইসিস, নিউমোনিয়া। বানান ভুল, চিৎকার, চেঁচামেচি আনন্দশেখরের। তার পর অঙ্ক। অনির বুক দুরুদুরু কাঁপছে। একটা ভুল, দুটো ভুল। আনন্দশেখরের মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে। হেমছায়া দূরে ভয়ে কাঠ। অনি কিছুই বুঝতে পারে না কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়ার মারপ্যাঁচ। খাটের ওপর বাপ-ছেলে অঙ্ক করছে। আনন্দশেখরের রাগ তুঙ্গে। হোলিচাইল্ডে অনি শুধু যোগ বিয়োগ শিখেছে। আনন্দশেখর উনিশঘরের নামতা ধরে। অনি কিছুই জানে না। হঠাৎ প্রচণ্ড জোড়ে অনিকে চড় মেরে বলে উঠলেন, “মাথার ভেতর গোবর নাকি?”

চড়টা বেশ জোরেই হয়ে গেছিল। অনি খাট থেকে ছিটকে ঘরের মাঝের শালগাছের খুঁটিতে ধাক্কা খেল। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত চারিদিকে। আনন্দশেখর অপ্রস্তুত। হেমছায়া জড়িয়ে ধরেন অনিকে। কেয়া গিয়ে তুলো দিয়ে চেপে ধরে কাটা জায়গাটা। আনন্দশেখর নিজেই গিয়ে আয়োডিন, ব্যান্ডেজ নিয়ে আসেন। হেমছায়া রক্ত মুছিয়ে, ওষুধ দিয়ে, ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন অনির মাথায়। সেই ঘটনার পর অনি কখনও বাবার কাছে আর পড়তে বসেনি। মারও খায়নি কোনওদিন।

আনন্দশেখর ঠিক করলেন একজন মাস্টার রেখে দেবেন কেয়া আর অনির জন্য। ওদের স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ান রামবাবু। দেখতে দারুণ সুন্দর। সিনেমার নায়কের মতো। স্কুলের পাশেই রামবাবুর বাড়ি। রামবাবু আই এ, আই এস্‌সি, আই কম— তিনটিতেই ফেল করেছেন। আনন্দশেখরের বক্তব্য এইজন্যই রামবাবুর জ্ঞানটা অনেক বেশি। রামবাবুর অল্পবয়েসি ফুটফুটে বউ। কেয়া আর অনি মাঝে মাঝে যায় বউদির কাছে গল্প করতে। কুলের আচার খেতে দেয় বউদি। ঠিক ভোর পাঁচটায় খটখট শব্দ করে খড়ম পরে রামবাবু পড়াতে আসেন, নিমদাঁতন করতে করতে। তখনও ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি। কেয়া আর অনি খড়মের শব্দে ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে বসে। বারান্দায় ওরা পড়তে বসে। হেমছায়া এক কাপ চা করে দেয় রামবাবুকে। মুখ ধুয়ে আস্তে আস্তে চা খান রামবাবু। কেয়া আর অনি বইখাতা নিয়ে বাইরের চেয়ার-টেবিলে পড়তে বসে। তার পর অত্যাচার চলে রামবাবুর। কঠিন কঠিন অঙ্ক দিয়ে দিন শুরু হয়। ভুল হলে মাথায় গাঁট্টা। অঙ্কের পরে সংস্কৃত। বড়ই খটমট। প্রচুর অঙ্ক আর সংস্কৃতের হোমটাস্ক দিয়ে রামবাবু পড়া শেষ করেন। কেয়া আর অনির চিন্তা হয়— পুরো সন্ধেবেলা কেটে যায় রামবাবুর হোমটাস্ক করতে। বছর খানেক ধরে রামবাবুর অত্যাচার চলল। কেয়া স্কুলের পর অনিকে নিয়ে যায় মাঝে মাঝে রামবাবুর বউয়ের কাছে। বলে, “বউদি, আপনি একটু বোঝান মাস্টারমশাইকে। আমরা এত অঙ্ক আর সংস্কৃত পড়তে পারছি না।”

বউদি হেসে বলে, "নিশ্চয়ই বলে দেব। কোনও চিন্তা কোরো না।"

শেষ দিকে খুবই ভয়াবহ হয়ে গেছিল রামবাবুর অত্যাচার। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত অনির। কেয়ার খাতা মিলিয়ে দেখত সব অঙ্ক ঠিক হয়েছে কি না। হেমছায়ার কাছে অনেক কান্নাকাটির পর রামবাবুকে ছাড়িয়ে দেয়া হল গৃহশিক্ষকতা থেকে। জীবনে কখনও অনি আর কেয়া এর পর কোনও মাস্টারের কাছে আলাদা ভাবে পড়েনি। রামবাবুর ভীতি ওদের স্মৃতির মাঝে বহুদিন ছিল।

মাসে একবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে সিনেমা দেখানো হত কলোনিতে। স্কুলের সামনের মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা হত। সবাই মাটিতে বসে দেখত সেই সিনেমা— খোলা আকাশের নীচে। মাসের শেষে এক ছুটির দিনে সাধারণত সেই সিনেমা দেখানো হত। কলোনির সবাই দেখত সেই সিনেমা। সাদা-কালোর ফিল্ম— বেশির ভাগই ডকুমেন্টারি। শব্দ শোনা যেত না খোলা মাঠে। তবু সবার ভাল লাগত সেই দিনটা। সিনেমার শেষে দল বেঁধে সবাই বাড়ি ফিরত।

এক ছুটির দিন আনন্দশেখর অনিকে নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে গেলেন। কলোনিতে আসার পর আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রেনে জানলার পাশে বসে অনি বাইরের দৃশ্য দেখছে। আনন্দশেখর বললেন, "আমাদের একটা কাজের লোক দরকার। তোমার মার খুব কষ্ট হচ্ছে এত লোকের জন্য রান্নাবান্না, বাসনমাজা, কাপড়কাচা ইত্যাদি করতে। শিয়ালদা স্টেশনে অনেক উদ্বাস্তু এসেছে। দেখি কোনও কাজের লোক পাই কি না। কত লোক সর্বস্বান্ত হয়ে পূর্ববাংলা থেকে ফিরে এসেছে। একটু মাথা গোঁজার জায়গার খোঁজ করছে। কাউকে যদি পাই, নিজের আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করবে। এককালে ওদের জমিজমা, বাড়িঘর সব ছিল, সব হারিয়ে এরা কলকাতায় ভিড় করছে।"

ট্রেন থেকে নেমে অনি আশ্চর্য হয়ে যায়। শিয়ালদা স্টেশনে হাজার হাজার লোক গিজগিজ করছে। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কাঁদছে খাবারের জন্য। পায়খানা, পেচ্ছাপ, বমি চারদিকে। চারদিকে ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। ছোট ছোট মাদুর পেতে কেউ কেউ শুয়ে। কেউ কেউ তিনটে ইট পেতে ছোট উনুন করে রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। আনন্দশেখর অনিকে শক্ত হাতে ধরে ভিড়ের মধ্যে এগোচ্ছেন। বলেন, "বাস্তুহারা আর উদ্বাস্তুর একই মানে, যারা গৃহহীন— যাদের ঘরবাড়ি কিছুই নেই। ভাবতে পার এদের এককালে সবই ছিল? রাতারাতি সব ছেড়ে ভয়ে সব কলকাতায় চলে এসেছে। জানে না কোথায় থাকবে, কোথায় যাবে, কী খাবে। এত বড় স্টেশনে মাথাগুঁজে পড়ে আছে একটু আশ্রয়ের জন্য। আজ এরা নিঃস্ব হয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে। সোনার বাংলার সর্বনাশ হয়ে গেল স্বাধীনতার পর।"

অনির হাতটা শক্ত করে ধরে আনন্দশেখর চলছেন ভিড়ের মধ্যে। সবারই ছোট ছোট সংসার। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা অনিকে দেখে বলে উঠলেন, "ও ভাই, আমারে তোমাদের বাড়ি নিয়া চলো। আমার কেউ নাই। আমি তোমাদের দুইবেলা রান্না কইরা দিমু। বাসন মাজব। ঘর পরিষ্কার করব। আমারে নিয়া চলো ভাই। এই স্টেশনে আর থাকা যায় না।"

আনন্দশেখর তাকান ভদ্রমহিলার দিকে। বিধবা, সুন্দর মুখশ্রী, মায়াজড়ানো মুখ। হেমছায়ার বয়সি হবে। সঙ্গে ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একা, ঝাড়া হাত-পা। অনি বলে ওঠে, "বাবা, ওনাকেই নিয়ে চলো আমাদের বাড়িতে।"

আনন্দশেখর রাজি হয়ে যান। কথা বলে জানতে পারেন ভদ্রমহিলার কেউ নেই কলকাতা শহরে। বরিশালে বাড়ি, অল্প বয়সে স্বামী মারা যায়। কোনও সন্তান নেই। সঙ্গে শুধু একটা পুঁটলি। দুই-একটা ধুতি আর সাদা ব্লাউজ।

আনন্দশেখরের কথায় উঠে বসেন ভদ্রমহিলা। পাশের একজনকে চিৎকার করে বলেন, "দিদি, একটা মাথা গোঁজার জায়গা হইল।"

ওরা ফেরার ট্রেনে ওঠে। ভদ্রমহিলা অনির পাশে বসে জড়িয়ে ধরে বলে, "তোমার নাম কী বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুক। দীর্ঘজীবী হও। তোমাদের বাড়িতে কে কে আছে, সবার কথা বলো।"

অনি মা, ভাইবোন, কাকা, পিসি— সবার কথা খুঁটিয়ে বলল। অন্ধকারে ট্রেন চলছে বেলঘরিয়ার দিকে।

সবাই মিলে বাড়ি ফিরল রাত্রিবেলা। আনন্দশেখর পরিচয় করিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলার সবার সঙ্গে—

"এই হচ্ছে তোমাদের পিসিমা। আজ থেকে উনি আমাদের বাড়ির একজন। আমাদের মতো বরিশালে বাড়ি। সব হারিয়ে কলকাতায় এসেছেন।"

পিসিমা হেমছায়াকে প্রণাম করে বলেন, "বউদি, রান্নাবান্নার ভার আমার ওপর ছাইরা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার এই ব্যাপারে আর কোনওদিন ভাবতে হবে না।"

হাতমুখ ধুয়ে পিসিমা রান্নাঘরে চলে গেলেন। হেমছায়ার খুব ভাল লাগল ওনার আন্তরিকতাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্নাবান্না করে সবাইকে খেতে দিলেন। খুবই চটপটে। সবার খাওয়া হয়ে গেলে বাসনকোসন মেজে পরিষ্কার করে রাখলেন। সত্যিই, সেই রাতে পিসিমা সারাজীবনের অঙ্গীকার করেছিলেন, হেমছায়াকে কোনওদিনই রান্নাবান্না, রেশন বাজার নিয়ে ভাবতে হয়নি। হেমছায়ার সংসারের সব ভার নিজের ঘাড়ে নিলেন পিসিমা। হেমছায়া নিশ্চিন্ত হলেন সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে পিসিমার ওপর। কেয়া অনি আর ওদের পরের সব ভাইবোন, পিসিমাকে ঠিক নিজের পিসির মতো সারাজীবন দেখেছে। পিসিমা এই বিরাট পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন সেই রাত থেকেই। স্নেহ, মায়া,

মমতা দিয়ে হেমছায়ার ছেলেমেয়েদের বড় করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন মাথা পেতে। সংসারে এ জিনিস খুবই দুর্লভ।

কলোনির এত সমস্যা, এত দারিদ্র্য, এত দৈন্যর মধ্যেও জ্ঞানেন্দ্র একটা কৃষ্টি বজায় রেখেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রর তালিম পেয়ে হেমছায়া আর ফুলদি দারুণ গাইছে। জ্ঞানেন্দ্র একটা গানের দল করেছেন সবাইকে নিয়ে। খুবই উঁচু মানের। এই দলে আছে বেহালায় দুলালদা, তবলায় মানিকদা, সেতারে আনন্দশেখর। গানে হেমছায়া, ফুলদি, ইনাপিসি ও অজয়কাকু। এদিক সেদিক থেকে ওদের ডাক পড়ে গান গাইবার জন্য। আনন্দশেখর জ্ঞানেন্দ্রকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন দ্বিজেনের সঙ্গে। দ্বিজেন আলাপ করিয়ে দিয়েছেন আনন্দের সহপাঠী শান্তিরঞ্জন পালিতের সঙ্গে। জ্ঞানেন্দ্র দ্বিজেন ও শান্তি পালিতের বাড়িতে গান শেখান ছেলেমেয়েদের। শান্তিরঞ্জনের বাড়িতে বিরাট করে দুর্গোপুজো হয় ওঁর পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। শান্তিরঞ্জন এখন নামকরা বিজ্ঞানী। সারা দেশ জুড়ে খ্যাতি। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটিতে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে যাদবপুরের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের নামকরা বিজ্ঞানী। শান্তিরঞ্জন নেমন্তন্ন করেছেন সদলবলে আনন্দশেখর ও জ্ঞানেন্দ্রকে— দুর্গোপুজোয় চণ্ডীপাঠের গান গাইবার জন্য।

দলবেঁধে সেজেগুজে দু' বাড়ির ছেলেমেয়েরা সপ্তমীর দিন তৈরি হল। ছেলেদের একই রকম জামাকাপড়— নীল জামা, কালো প্যান্ট, কাবলিজুতো। মাটির বাড়ি আর হারিকেনের আলোয় এতদিন কাটাবার পর শান্তিরঞ্জনের পাঁচতলা বাড়ি দেখে সবাই আশ্চর্য হয়। পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছেই বাড়ি। বাড়ির বাঁধানো উঠোনে ডাকের সাজের মা দুর্গার মূর্তি। ঢাক বাজছে জোরে। আনন্দশেখরকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন পুরনো বন্ধু শান্তিরঞ্জন।

"কেমন আছিস আনন্দ? কতদিন দেখা নেই। কলেজের কথা মনে পড়ে? কী আড্ডাটাই মেরেছি চায়ের দোকানে। ছেলেমেয়েরা কত বড় হল? কে কোন ক্লাসে পড়ছে। চল, আমার বাড়িতে তো কখনও আসিসনি? ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সারা বাড়িটা পুজোর উৎসবে মেতে গেছে। শান্তিরঞ্জন ও তাঁর বউ সারা বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। প্রতি তলায় গোটা চারেক ঘর— সুন্দর বাথরুম, অনি আশ্চর্য হয়ে যায়। এত বড় বাড়িতে বাবার বন্ধু থাকে? অনির সঙ্গে বন্ধুত্ব হল শান্তিরঞ্জনের দুই ছেলে— ববি আর জয়ের সঙ্গে। অনির কাছাকাছি বয়স ওদের। কায়দা করে ইংরেজিতে কথা বলে। দেশবিদেশের খেলনা দেখায়। বাবার সঙ্গে ওরাও বিলেত আমেরিকায় ঘুরে এসেছে এই বয়সে। অনি এখনও কোথাও যায়নি বাড়ি ছেড়ে। দু'-ভাইয়ের আলাদা আলাদা ঘর। কী

সুন্দর সাজানো গোছানো। আলমারিতে কত ছবির বই। প্রত্যেকের ঘরে রেডিয়ো, গ্রামোফোন। দু ভাই বিদেশের গল্প করছে অনিকে। গৌতম ও খোকন আছে অনির সঙ্গে। ওরা সব গল্প শোনে। ববি আর জয় হঠাৎ বলে, "চল, আমাদের জায়গাটা ঘুরে দেখাই। পার্ক সার্কাস ময়দানে দারুণ প্রতিমা, রমেশ পালের তৈরি। চল দেখিয়ে আনি।"

সত্যি অপূর্ব সেই প্রতিমার মুখ। পার্কে বিরাট মেলা বসেছে। ববি সবাইকে আইসক্রিম কিনে দেয়। অনির মনে পড়ে পরেশনাথের কথা। ঠিক এমনি করেই ওদের বিকেলবেলা মন্দিরে কাটত হইচই-এর মাঝে। কলোনিতে এ-সব কিছুই নেই। অনির হঠাৎ শিবুর কথা মনে পড়ে। কতদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই। কেমন আছে কে জানে?

রাত্রিবেলা বিরাট করে পুজোর প্রতিমার সামনে আসর বসল গানের। শান্তিরঞ্জনের অনেক বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এসেছেন পুজোতে। সামনে মাইক্রোফোন। বিরাট করে ফরাস পাতা। পেছনে কিছু ফোল্ডিং চেয়ার। জ্ঞানেন্দ্র সবাইকে নিয়ে গানে বসেছেন। পঙ্কজ মল্লিকের সুরে পুরো মহালয়ার গান গাইছেন। সঙ্গে ফুলদি, হেমছায়া, অজয়কাকু, ইনাপিসি। বেহালায় দুলালদা, তবলায় মানিকদা, সেতারে আনন্দশেখর। ঘণ্টাখানেকের প্রোগ্রাম। ঠিক রেডিয়োর মহালয়ার মতো শোনাচ্ছিল। অতি দূর থেকে মাকে দেখছিল অনি, সত্যিই ভাল গায় হেমছায়া।

গানবাজনার পর খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল। ওরা ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করল। অনি ববির ঘরে শুয়ে পড়ল। খোকন ও গৌতম জয়ের ঘরে। পরের দিন ভোর ভোরই ওরা সব রওনা দিল কলোনির দিকে। এবার আর ট্রেনে করে ফেরা নয়। শান্তিরঞ্জন ওদের ফেরার জন্য নিজের গাড়ি ও ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ফেরার সময় আনন্দকে জড়িয়ে ধরে বলেন—

"আনন্দ, আমরা সব কাজের তাগিদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছি। কলকাতা শহরে থাকি, তবুও কোনওদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। কথা দে। প্রতি পুজোর সময় আমাদের বাড়িতে আসবি? আগের থেকে নেমন্তন্ন করে রাখলাম।" শান্তিরঞ্জনের গাড়িতে ফেরার সময় হেমছায়া ভাবে, 'আমার জীবনেও তো এরকম সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য হতে পারত, আনন্দশেখর যদি আই সি আই-এর চাকরিটা না ছাড়তেন।' কলোনির দারিদ্র্যর কথা ভেবে অষ্টমীর দিন হেমছায়ার দু চোখ ভরে জল নামে।

জ্ঞানেন্দ্র এখন রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য নিয়ে মেতে উঠলেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বেশ-কিছু নর্তকী পাওয়া গেল। গানের জন্য যোগ দিল বেশ-কিছু শিল্পী, মহড়া বসে কলোনির বাড়িতে। ছুটির দিনে সবাই আসে। এক এক করে মঞ্চস্থ করলেন বাল্মীকি প্রতিভা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা। বেঙ্গল কেমিক্যালের বাৎসরিক উৎসবে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে এইসব অনুষ্ঠান হত।

এই সব গানবাজনা নিয়ে মেতে থাকলেন আনন্দশেখর ও হেমছায়া।

দুলালদা এর মধ্যে ভারতীয় গণনাট্যে যোগদান করেছে। বেহালা ছাড়া নিজে গান লেখে, নিজে সুর দেয়। হেমন্ত, সলিল চৌধুরী— এদের সঙ্গে খুব পরিচয়। একদিন ওরা কলোনিতে নাটক করল, 'নবান্ন'। এ ছাড়া সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতার নৃত্যনাট্য করল শম্ভু ভট্টাচার্য। অনবদ্য সুর সলিল চৌধুরীর। অপূর্ব ভরাট গলায় গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রানার ছুটছে পায়ে ঝুমঝুম বাজিয়ে— খালি গায়ে— চিঠির বোঝা নিয়ে। অনির এখনও মনে পড়ে সেই রাণার নৃত্য। দুলালদা আই পি টি এ-র এক ছোট শাখা করেছেন বেলঘরিয়ায়। তাতে মানিকদা, অজয়কাকু, ইনাপিসি আর কেয়া গান গায়, এখানে সেখানে। ওদেরও খুব নামডাক হয়েছে।

প্রফুল্লনগর কলোনিতে অনিদের আশেপাশের বেশির ভাগই পাবনা জেলা থেকে এসেছে। এদের পূর্ববাংলায় তাঁতের ব্যাবসা ছিল। নতুন উদ্যমে এরা শুরু করেছে ওদের ব্যাবসা। রোববার রোববার বিরাট মাটির গামলায় সুতো রং করে। তার পর সেই রং বেঁচে গেলে পাড়াপড়শির জামাকাপড় রং করে দেয় বিনে পয়সায়। হেমছায়া ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়, শাড়ি ওখানেই রং করিয়ে নেন, যাতে পুরনো কাপড় নতুনের মতো দেখায়— আর নোংরা না হয়। এ ব্যাপারে ভূপতিবাবু খুব সাহায্য করতেন। ওঁর ছোটবোন প্রতিভা আর মেয়ে জ্যোৎস্না কেয়ার খুব বন্ধু। ওরাই আগে থেকে কেয়াকে খবর পাঠাত কখন রং হবে। বিরাট বাণ্ডিল করে কেয়া হাজির হয় জামাকাপড় রং করার জন্য। সংসারের সাশ্রয়ের জন্য হেমছায়া সব করতে রাজি। কেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিও যায় রং দেখতে জামা-কাপড়ের। বেশ মজা লাগে— পুরনো জামাকাপড় নতুন হয়ে যায়। নতুন করে আর জামাকাপড় কিনতে হয় না দোকানে গিয়ে।

ছুটির দিন বিকেলে জ্ঞানেন্দ্র আর আনন্দশেখর বাইরে ইজিচেয়ারে শুয়ে চা খেতে খেতে গল্প করেন। দুই বন্ধু একই দিনে দুটো ইজিচেয়ার কেনেন একই লোকের কাছ থেকে। শিয়ালদা স্টেশনের কাছে। হকার্স মার্কেটে। জ্ঞানেন্দ্রর চেয়ারে হাতল লাগানো, তার জন্য দু'টাকা বেশি দিতে হয়েছে। দশ টাকা দাম। আনন্দ হাতলছাড়া কিনেছেন বলে একটু সস্তায় পেয়েছেন। ইজিচেয়ার কেনার সময় হয়তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাসিতার ওপর কটাক্ষটা মনে পড়েছিল। ইজিচেয়ারে হাতল থাকাতে জ্ঞানেন্দ্র চায়ের কাপটা পাশে রেখে গল্প করতে পারেন। আনন্দর সেই সুবিধে নেই। চায়ের কাপটা সবসময় হাতে ধরে রাখতে হয়। হঠাৎ মাথায় ব্রেন ওয়েভ খেলল আনন্দর—

"আচ্ছা জ্ঞানবাবু, আমরা তো নিজেরাই আমার ইজিচেয়ারে হাতলটা লাগাতে পারি? একটু ছুতোরের কাজ করলে কেমন হয়?"

জ্ঞানেন্দ্র সব ব্যাপারে উৎসাহী। "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই— এ আর এমন কী কাজ। চেষ্টা করলে সবই হয়।"

আনন্দশেখর খুব উৎসাহী হয়ে হেমছায়াকে ডাকলেন। "জানো হেম, অনেকদিন তো গানবাজনা হল— এবার একটু হাতের কাজ করব। শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে। জানো তো— যিশুখ্রিস্ট ছুতোর ছিলেন। আমরা ঠিক করেছি এটা আমাদের একটা হবি হবে। কাঠের কাজটা শিখে গেলে রান্নাঘরের আলমারি, ছেলেমেয়েদের পড়ার টেবিল, চেয়ার, এমনকী আমাদের শোবার জন্য একটা কাজকরা পালঙ্ক।"

যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। পরের দিন দু' বন্ধু অফিসের ছুটির পর কেনাকাটা করলেন যন্ত্রপাতি। ফিরলেন বাড়ি একসঙ্গে। আনন্দর হাতে একটা কাঠের বাক্স। "হেম, দেখে যাও কী জিনিস এনেছি।" বিশ্বকর্মার বাক্স। গর্ব করে খুলে দেখাচ্ছেন সবাইকে। ছেলেমেয়েরা চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। "এই দ্যাখো করাত, এটা বাটালি, এই হচ্ছে র‍্যাঁদা। একে বলে ছেনি। এ ছাড়া হাতুড়ি, পেরেক, স্ক্রু। সব কাজে লাগবে ফার্নিচার বানাতে।"

"নিশ্চয়ই অনেক টাকা লেগেছে এ-সব যন্ত্রপাতি কিনতে?" হেমছায়া জিজ্ঞেস করেন ভয়ে ভয়ে।

"আমরা খুব সস্তায় পেয়েছি। পঞ্চাশ টাকার মধ্যে সব হয়ে গেছে।" জ্ঞানেন্দ্র বললেন।

জ্ঞানেন্দ্রর হাতে দুটো কাঠের পাটাতন। যাতে ইজিচেয়ারের হাতল দুটো হয়।

"একটু ভাল করে চা করো তো হেম। চা খেয়ে কাজে লেগে যাই। কী বলেন জ্ঞানবাবু?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

কাপের পর কাপ চা আসে। ছেলেমেয়েরা সব গোল হয়ে দেখে ছুতোরের কারিকুরি। দু' বাড়ি থেকে দুটো হারিকেন এসে গেছে। বাইরের উঠোনে কাজ চলছে। দিন সাতেকের মধ্যে দুটো সুন্দর হাতল হল ইজিচেয়ারের। সেদিন ছুটির দিন। রোববারের বিকেল। সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছে। স্ক্রু দিয়ে লাগানো হল ইজিচেয়ারের হাতল দুটো। হেমছায়া গরম গরম চা নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে বকফুল ভাজা। কাঠের শিল্পীদের অনুপ্রেরণা দিতে সবাই দাঁড়িয়ে। বন্ধ চেয়ার দুটো পাশাপাশি রাখা হয়েছে। একই রকম দেখতে। জ্ঞানেন্দ্র তাঁর পুরনো চেয়ার খুলে বসে পড়লেন বিনা দ্বিধায়। এবার আনন্দর পালা। যার জন্য এত সাধ্য-সাধনা। এত খরচা। প্রচণ্ড টানাটানি করছেন আনন্দ। চেয়ার আর কিছুতেই খোলে না হাতল লাগাবার পর। জ্ঞানেন্দ্রও চেষ্টা করছেন। কিছুতেই খুলছে না, নতুন হাতল লাগানো, নতুন সৃষ্টির অনুপ্রাণিত ইজিচেয়ার।

"হাঁ করে কী সব দেখছিস?" আনন্দ চিৎকার করে ওঠেন। অনি, গৌতম,

খোকন ভয়ে ভয়ে ভিড় থেকে সরে যায়। হেমছায়া হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে ঢোকেন। ইজিচেয়ার তবু অনড়, অটল।

"দূর ছাই। হাতলছাড়া ইজিচেয়ারই আমার ভাল ছিল।" এই বলে হাতলদুটো খুলে ফেলেন আনন্দশেখর। তার পর থেকে হাতলহীন ইজিচেয়ারটাই ভালবেসে ফেললেন আনন্দশেখর। কাঠের কাজে এর বেশি কিছু সৃষ্টি হয়নি তার পরে। ছুতোরের বাক্সটা ধুলোয় আর অবহেলায় মলিন হয়ে থাকল বহু বছর ধরে। মাঝে খোকন হাতলদুটো নিয়ে দুটো সুন্দর ক্রিকেটের ব্যাট বানিয়েছিল। শীত পড়লে ব্যান্ডের মাঠে ক্যাম্বিস বলে ওরা ক্রিকেট খেলত এ ব্যাট দুটো দিয়ে।

অনির ছোটভাই আকাশ অল্প বয়স থেকে নিজের মনে অর্গান বাজায়। প্রচণ্ড সুরজ্ঞান ওর ভেতরে। ছোট ছোট আঙুলে কত রকম সুর তোলে। যে-কোনও গান একবার শুনলেই নিজে নিজে বাজাতে পারে। আকাশ দু' হাতে অর্গান বাজায়। ওর যন্ত্রপাতিতে খুব উৎসাহ। নিজের মনে খেলা করে দুপুরবেলা। কেয়া আর অনি তখন স্কুলে। তাঁতিদের কাছ থেকে রংবেরঙের সুতো নিয়ে আসে। দুপুরবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আকাশ স্বপ্নের জগতে চলে যায়। সারা বাড়িটা সুতো দিয়ে মাকড়সার জালের মতো করে রাখে। তখন আর কারও হাঁটার উপায় থাকে না। সবাই যেন সুরের জালে বন্দি। পাশের বাড়ির টুকটুক ওর বন্ধু। গৌতমের ছোটভাই। টুকটুকও যোগ দেয় আকাশের সঙ্গে সুতোর জাল বানাতে।

আনন্দশেখর একটা প্লেনের জানলা কিনে এনেছিলেন। যুদ্ধের পর খোলা বাজারে নানারকম জিনিস বিক্রি হত। অ্যালুমিনিয়ামের জানলা। খোলা বন্ধ করা যায়। মিস্ত্রি ডেকে একদিন দরমার বেড়া কেটে প্লেনের জানলাটা লাগিয়ে দেন আনন্দশেখর। বেড়ার ঘরে জানলাটা অদ্ভুত দেখাত। আকাশের ওই জানলা খুব প্রিয় ছিল। সব সময় ওই জানলার ওপর বসে থাকত— পা দুটো বাইরে ঝুলিয়ে। নিজেকে মনে করত পাইলট। প্লেন চালিয়ে মেঘের রাজ্যে যায়। একদিন বিকেলে সবাই বাইরে খেলা করছে। আকাশ জানলার ওপর বসে খেলা দেখছে। হঠাৎ বাইরে আচমকা পড়ে যায়। পড়েই হাতটা ভেঙে যায় বিশ্রীভাবে। হেমছায়া ছুটে আসেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আকাশের, চিৎকার করতে থাকে। হেমছায়া নিজেই ব্যান্ডেজ করে দেন। আশেপাশে কোনও ডাক্তার নেই। হাতদুটো কেমন যেন ঝুলছে। নিজেই রিকশা করে আকাশকে নিয়ে চললেন দূরের হাসপাতালে। রাতের দিকে ফিরলেন আকাশকে নিয়ে। আকাশের হাতে বিরাট করে প্লাস্টার বাঁধা। বেশ কয়েক মাস ছিল সেই প্লাস্টার। আকাশ তখন এক হাতেই অর্গান বাজাত।

ইন্দ্র আকাশের পরের ভাই। ছোটবেলা ইন্দ্র খুব পেটরোগা ছিল। কিন্তু হাঁটাচলায় আর কথাবলায় ছোটবেলা থেকেই খুব স্মার্ট। পুজোর সময় ওকে একটা কালো আর সাদা সিল্কের নেভিসুট কিনে দিয়েছিলেন হেমছায়া। ইন্দ্র সেই

নেভিসুটটা পড়ে গটগট করে হাঁটত। শনিবার শনিবার তাঁতিপাড়ায় হরির লুট হয়— বাইরে তুলসী গাছের নীচে। ইন্দ্র সেখানে গলা খুলে গাইত। কতই বা বয়েস তখন ইন্দ্রর। বছর তিনেক হবে। ওর সব কীর্তন গান মুখস্থ। ছোটবেলা থেকে ইন্দ্র ছিল লিডার। ও এক লাইন গাইত, সেই লাইন গাইত সবাই— সমবেত ভাবে। এর জন্য ইন্দ্র সবসময় নকুলদানা আর বাতাসা বেশি করে পেত।

ছুটির দিনে রাতের দিকে অনি আর গৌতম সিনেমা দেখাত সবাইকে। একটা সাদা বিছানার চাদর টাঙিয়ে পর্দা করা হত। যেখানে যত ভাঙা কাচের টুকরো, সেগুলো সব জড়ো করত ওরা। সেই কাচের টুকরোগুলো প্রদীপের শিখায় কালো করত ফোটোগ্রাফির প্লেটের মতো। তার ওপর ঝাঁটার কাঠি দিয়ে ওরা ছবি আঁকত। অন্ধকার ঘরে আঁকা কালো কাচের ওপর টর্চ ফেলে তার ছবি বড় হয়ে পড়ত সাদা পর্দার ওপর। প্রতি সপ্তাহে নিত্য নতুন গল্প হত। ইন্দ্রের খুব ভাল লাগত এই ঘরোয়া সিনেমা। তখন থেকেই ওর মনে হয়েছিল বড় হয়ে ও সত্যিকারের সিনেমা করবে।

একদিন আকাশ ভেঙে কালবৈশাখী নামল। বৃষ্টি আর থামে না। সপ্তাহখানেক ধরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। পুকুর সব ভর্তি হয়ে একাকার হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে এক হাঁটু জল। টালির ছাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বৃষ্টির জল ঘরে পড়ছে। জায়গায় জায়গায় পিসিমা বালতি, হাঁড়ি রেখে দিয়েছে যাতে বৃষ্টির জল পড়ে মেঝেটা কাদা না হয়ে যায়। মাছগুলো বৃষ্টির জলে ডাঙায় উঠে এসেছে। একদিন বিকেলবেলা কেয়া আর অনি একটা গামছা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে এক বালতি ছোট মাছ নিয়ে এল। বাড়িতে এলে প্রচণ্ড বকুনি দিলেন হেমছায়া বৃষ্টিতে ভেজার জন্য। না জানি সর্দি, জ্বরে দুজন কতদিন পড়ে থাকে। রাত্রিবেলা সবাই মিলে মাছ ভাজা আর মাছের ঝোল খেল খুব তৃপ্তি করে। নিজের হাতে মাছ ধরার একটা আনন্দ আছে।

পিসিমা অনিকে নিয়ে রেশন আনতে যায়, বাজার করে। মাঝে মাঝে দূরে নিমতার বাজারে খোলা চাল কিনতে যায়। পুলিশের কড়াকড়ি— খোলা বাজারে চাল কেনা বেআইনি। কিন্তু রেশনের চাল— মোটা কাঁকর মেশানো অদ্ভুত বিশ্রী বোঁটকা গন্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকারে অনিকে নিয়ে পিসিমা চাল কিনতে যায়। মাঝে মাঝে পুলিশ তাড়া করে। পিসিমা ও অনি ছোটে চালের থলি নিয়ে। সংসারের খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করেন পিসিমা। পুকুর থেকে তুলে আনেন কলমিশাক আর শাপলা। জঙ্গল থেকে কচুর শাক। এ ছাড়া বকফুল আর পাটপাতা বাড়ির বাগানেই হয়। এমনি করেই বছর তিনেক কেটে যায় কলোনিতে।

সংসারে এখন টানাটানি। আনন্দশেখর অফিসের পর একটা পার্ট-টাইম চাকরি নিয়েছেন। বাড়ি ফেরেন রাত দশটায়। বেরিয়ে যান অফিসে ভোর সাতটায়।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই কম— রোববার ছাড়া। রাতের সময় আনন্দশেখর যতক্ষণ না বাড়ি ফেরেন— অনি ঘুমোতে পারে না। চিন্তা হয় বাবার জন্য। বরানগর স্টেশন থেকে রেললাইন ধরে হেঁটে আসেন আনন্দশেখর। একদিন বেশ রাত করেই ফেরেন আনন্দশেখর। অনির দু চোখে ঘুম নেই। দরজার কড়া শুনে ও উঠে দরজা খুলে দেয়।

"অনি, এখনও ঘুমোওনি?" আনন্দশেখর বলেন।

হেমছায়া দেখেন আনন্দশেখরের ধুতি পাঞ্জাবি কাদায় মাখামাখি।

"একী অবস্থা তোমার? কোথায় আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলে?"

"আর বোলো না। রেল লাইন ধরে হাঁটছি। বৃষ্টিতে চারিদিক পিচ্ছিল। যখন ব্রিজটার ওপর দিয়ে আসছিলাম, আমার পা স্লিপ করে যায়। ওইখানটায় আবার কাঠের স্লিপারগুলো ফাঁকা ফাঁকা— যাতে রেললাইনের জল নীচে চলে যেতে পারে। আমার সারা শরীরটা শূন্যে ঝুলছে। বুকের কাছটায় আটকে গেছে। মনে হল আমি বোধহয় আর উঠতে পারব না। অন্ধকার— কেউ নেই। কী অসহায় লাগছিল। ভাগ্যিস কোনও ট্রেন ছিল না সেই সময়। অনেক ধস্তাধস্তির পর নিজেকে ছাড়িয়ে লাইনে উঠেছি। সারা বুকটা মনে হয় ছড়ে গেছে। বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে।"

হেমছায়া একটু গরম জল করে আনেন। আস্তে আস্তে নরম কাপড়ে গরম জল ভিজিয়ে বুকটা মুছে দেন আনন্দশেখরের। চাপ চাপ রক্ত। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। সেই অন্ধকার বৃষ্টির রাতে কী করবেন বুঝতে পারেন না হেমছায়া।

"রাতটা কাটুক। ভোরবেলা আমি নিজেই ডাক্তারের কাছে যাব। কী রান্না করেছ দেখি?"

খেয়েদেয়ে শুতে শুতে বেশ রাত হল। অনি বুঝতে পারে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। পরের দিন ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরলেন আনন্দশেখর। বুকে বড় ব্যান্ডেজ বাঁধা। বুকের খাঁচার দুটো পাঁজর ভেঙে গেছে। সপ্তাহখানেক বাড়িতে বসে রইলেন আনন্দশেখর। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কথা ভাবেন। কাজের চাপে কিছুই খোঁজখবর নেওয়া হয়নি।

ছুটির মধ্যে ঠিক করলেন অনিকে আর খোকনকে বেশ দূরে এক ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। আনন্দ আর জ্ঞানেন্দ্র নিয়ে গেলেন নতুন স্কুলে— প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে। ওদের বাড়ি থেকে মাইল পাঁচেক দূর হবে। হেঁটেহেঁটেই যেতে হবে স্কুলে। অনি আর খোকন ভর্তি হয়ে এল নতুন স্কুলে। অনেকটা হাঁটাপথ। বাড়ি থেকে বেশ আগেই বের হয়ে যায়। স্কুল থেকে যখন ফেরে বিকেল গড়িয়ে যায়। রাতে আর পড়াশোনা করার ইচ্ছে থাকে না। ঘুমে দু'চোখ জুড়িয়ে আসে অনির খাওয়াদাওয়ার পর।

বছরে একবার হিন্দুস্থান কটন মিলসের মালিক— পাইসাহেব ওঁর জমিতে

তৈরি আঁখ বিলি করতেন গরিব দুঃখীকে। কলোনিতে হইচই পড়ে যেত "পাইসাহেব আঁখ বিলি করছে।" কেয়া অনিকে নিয়ে লাইন দিত। বিরাট লাইন। সবাইকে মাথাপিছু তিনটে করে বড় আঁখের ডাণ্ডা দিত। কেয়া আর অনি গোটা ছয়েক আঁখ নিয়ে কলোনির বাড়িতে ঢুকত বিজয় গর্বে। বেশ মিষ্টি ছিল আঁখের রস।

প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে যাবার সময় একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা এখনও মনে আছে। খোকন আর অনি সাড়ে আটটার মধ্যে স্কুলে বেড়িয়ে পড়ত। ওদের ক্লাসে অমল বলে এক বড়লোকের ছেলে পড়ত। স্কুল থেকে বেশি দূরে বাড়ি নয় অমলের। অমল অনির খুব বন্ধু ছিল। বিরাট হলুদ রঙের তিনতলা বাড়ি। লোহার গেট খুলে অনি আর খোকন ঢুকত। অমলের প্রতিদিনই স্কুলে তৈরি হতে দেরি হত। ওদের দেখেই অমলের দিদি এসে বলত, "অমল এখন খাচ্ছে। তোমরা একটু বসার ঘরে অপেক্ষা করো।" অনি আর খোকন আরাম করে সোফায় বসে। অমলের দিদি ফ্যান খুলে দেয়। কলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে অমলের দিদি ফিজিক্স নিয়ে এম এস্‌সি পড়ছে। হালকা চেহারা। অনির খুব ভাল লাগত দিদিকে। "অনি, অমল তোমার কথা প্রায়ই বলে। তুমি ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হও। অমলটা দিনরাত খেলাধুলো নিয়ে থাকে। কিছুতেই পড়তে বসে না। তোমাদের বাড়ির সবাই ভাল তো?"

প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু কথা বলেন অমলের দিদি। যতক্ষণ অমল তৈরি না হয় কাছে এসে বসেন। তার পর তিনবন্ধু হইচই করতে করতে স্কুলের দিকে রওনা হয়। অমলের মুখেই শুনেছিল ওর এক দাদা জার্মানিতে থাকে। হঠাৎ একদিন অমলের বাড়িতে বসে আছে অনি আর খোকন সকালবেলা স্কুলে যাবার পথে। অমলের দিদি এসে ওদের বলেন, "আমার দাদা বউদি জার্মানি থেকে কাল এসেছে। অমলের কাছে তোমাদের কথা শুনেছে। এক্ষুনি আসছে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে। বউদি কিন্তু জার্মান, বাংলা একদম জানে না।"

একটু পরেই অমলের দাদা ও জার্মান বউদি ঘরে এসে উপস্থিত।

"জানিস দাদা, এই হচ্ছে অনি, এই হচ্ছে খোকন। অনি খুব ভাল ছেলে। অমলদের ক্লাসে ফার্স্ট, সেকেন্ড হয়। ওরা বাস্তুহারা কলোনিতে থাকে মাটির বাড়িতে। দ্যাখ, ওই বাড়ি থেকে কী সুন্দর ছেলে হয়েছে। আর আমাদের অমল— দুটো মাস্টার আছে, তাও প্রতিবছর টেনেটুনে পাস।"

অমলের দাদা অনি আর খোকনকে দুটো চকোলেট বার দিল। বহুদিন বিদেশে থেকে বাস্তুহারা কলোনি কী জানে না। অমলের দিদি ওর দাদাকে বোঝাবার চেষ্টা করে— "পার্টিশনের পর লাখ লাখ উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতার আশেপাশে জবরদখল কলোনিতে নতুন জীবন শুরু করে। আমি একটা কলোনিতে গিয়েছিলাম। দিনরাত মারামারি লেগে আছে। কী করে একটা ঘরের মধ্যে এতগুলো লোক থাকে ভাবতে পারি না। ভেবে দ্যাখ, অনি সেই বাড়ির ছেলে।"

লজ্জায়, অপমানে অনির নিজেকে খুব খারাপ লাগল। হঠাৎ অমলের সঙ্গে নিজের তফাত বুঝতে পারল। অমল কলকাতার বনেদি ঘরের ছেলে। অনি পূর্ব পাকিস্তানের বিতাড়িত উদ্বাস্তু। সারাটা পথ অমলের সঙ্গে কথা বলতে পারল না।

'উদ্বাস্তু' কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা দীনতা আছে। অমলের দিদি কি ওদের করুণা করে?

মাঝে মাঝে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় হেমছায়া। তার মতো কত হাজার হাজার পরিবার পূর্ব বাংলায় সর্বস্বান্ত হয়ে আস্তানা গড়েছে এইসব বাস্তুহারা কলোনিতে— বেলঘরিয়া, যাদবপুর, বিজয়গড়, গড়িয়া, নাকতলা, পুটিয়ারি, নেতাজিনগর, হাবড়া— আরও কত জায়গায়। এর মধ্যে বেশ-কিছু পরিচিত লোক আছে, আত্মীয়স্বজন আছে। তারা যদি থাকতে পারে, হেমছায়াকেও মানিয়ে নিতে হবে এই পরিবেশে। মাঝে মাঝে ভাবেন, সম্পদ যেমন মানুষকে নষ্ট করে প্রাচুর্য দিয়ে, দারিদ্র্যও মানুষের প্রতিভা, অনুপ্রেরণা, স্বপ্নকে পিষে মারে। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকান। হতশ্রী, দৈন্য চেহারা। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখেন, কবে একটু ভাল জায়গায় গিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবেন।

এর মধ্যে খবব এল হঠাৎ রাজেন্দ্র মারা গেছেন। হেমছায়া ছুটে যান দ্বিজেনের বাড়ি। চারিদিকে শোকের ছায়া। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই দেখতে এসেছেন। বিরাট করে শোকসভা হল বরিশাল সেবা সমিতির আনুকূল্যে। বিরাট হল ভাড়া করে হয়েছিল সেই সভা। দেখাসাক্ষাৎ হল। দ্বিজেন এখন কলকাতায় ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত। পোর্ট কমিশনারের ডাক্তার। প্রচুর নামডাক। ছোটভাই নরেন যাদবপুরের বিজয়গড় কলোনিতে থাকে। হেমছায়ার মতো নরেনেরও আর্থিক অনটন। ছোটখাটো ব্যাবসা করে নরেন। দু' ভাইয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ কম। রাজেন্দ্রর মৃত্যুতে সবাই একজায়গায় হল।

হেমছায়ার সংকোচ লাগে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেতে। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকান আর কষ্ট পান। চারদিকে একটা দারিদ্র্যের ছাপ। অভাবের সংসার। সন্ধ্যার অন্ধকারে নাবালক সন্তানদের নিয়ে গোল হয়ে বসে গল্প করেন, স্বপ্ন দেখেন কবে একটু সুখের দিন আসবে। ছেলেমেয়েদের কেমন রোগা রোগা চেহারা। জামাকাপড়ের ছিরিছাঁদ নেই। বেশির ভাগই ভূপতিবাবুর তাঁতের দোকানের রং করা জামাকাপড়। টকটকে রং— নীল, লাল, কালো, সবুজ, হলুদ। নোংরা হওয়ার ভয় কম। বাড়িতে অজয় আর ইনাও বড় হচ্ছে। কোনও অভিযোগ নেই ওদের। পিসিমা সংসারের ভার নিজের কাঁধেই নিয়েছেন। এই অভাব অনটনের মধ্যে জন্ম হল ঈশানের। সবাই ছোট ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঈশানের জন্মের পর হেমছায়ার শরীরটা ভেঙে পড়ে। পিসিমা নিজের ছেলের মতন আদর আর ভালবাসা দিয়ে ঈশানকে বড় করতে থাকেন। হেমছায়া বাধা দেন না।

হঠাৎ ঠিক হল, চারজনের পইতে হবে পরেশনাথ মন্দিরের কাছে শ্রীনাথ

ভবনে। যতিশেখর সেই বাড়িতেই থেকে গেছেন। শিবু, অনি, আকাশ আর ছোটকাকা বিজয়ের একসঙ্গে পইতে হবে। সব কাছাকাছি বয়স। বহুদিন পরে পুরনো জায়গায় ফিরে অনির খুব ভাল লাগল। একা একা পরেশনাথ মন্দিরের চারিদিক ঘুরে দেখে। ছোটবেলার কত কথাই মনে পড়ছে। শিবুর সঙ্গে কত সময় কাটিয়েছে এই মন্দিরে।

পইতের ভোরবেলা শুরু হল কৃচ্ছ্রসাধন। পরপর চারজনকে মাথা ন্যাড়া করে কুলকাটা দিয়ে কানফুটো করে গঙ্গায় স্নান করানো হল। তার পর গৈরিক অঙ্গবাস। মাটির হাঁড়িতে আতপচালের ভাত রান্না করছে চারজন শ্রীনাথ ভবনের ছাদে। ইটের তৈরি উনুন। পাটকাঠি দিয়ে আগুন তৈরি হয়েছে। ধোঁয়ায় সবার চোখেমুখে জল। এর পর যজ্ঞ। গায়ত্রী মন্ত্র শেখা। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। ওদের পইতে হয়ে গেল। সন্ধেবেলা সব লোকজন আসবে। বিরাট করে প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে ছাদে। শিবু আর অনির দীক্ষাগুরু হলেন ধানবাদের পিসেমশাই হেমন্ত।

আস্তে আস্তে লোকজনের আনাগোনা শুরু হল সন্ধে হতেই। ওরা গেরুয়া কাপড়ে মুখ ঢেকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এক-একটা চেয়ারে বসে আছে। কেউ টাকা, কেউ ফল, কেউ বই ভিক্ষের ঝুলিতে দিয়ে যাচ্ছে। সবার কৌতূহল কী উপহার পায়। কিন্তু দেখার উপায় নেই। এর মধ্যে পিসেমশাই এসে উপস্থিত।

"অ্যাই শিবু, অনি, আমার সঙ্গে আয়। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বসে আছিস। চ— তোদের একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

আচার্যর কথা উপেক্ষা করা যায় না। শিবু আর অনি তড়াক করে উঠে বসে। পাশের দুটো চেয়ারে বিজয় আর আকাশ বসে আছে মুখ ঢেকে। মাথা ন্যাড়া, গেরুয়া কাপড়, পায়ে বিদ্যাসাগর চটি। পিসেমশাই ওদের নিয়ে রাস্তায় চলে আসেন। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পিসেমশাই হাত দেখিয়ে ট্যাক্সিটা থামায়। "চলো, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে।" ট্যাক্সিওয়ালাকে নির্দেশ দেয় পিসেমশাই।

পাঁচমাথার ওপরে ট্যাক্সি থেকে ওরা নেমে পড়ে। পাশেই একটা পাঞ্জাবির কষামাংসের দোকান। পিসেমশাই ওদের নিয়ে দোকানে ঢোকে। আতপচালের হবিষ্যি খেয়ে মুখটা কেমন স্বাদহীন হয়ে ছিল সারাদিন। পিসেমশাই অর্ডার দেয়— "তিন জায়গায় মোগলাই পরোটা, সঙ্গে কষা মাংস। আর স্পেশাল চা।"

শিবু হাসতে হাসতে মৃদু প্রতিবাদ করে, "পিসেমশাই, আজকে সবে ব্রাহ্মণ হলাম। পইতের দিনে মাংস খাওয়াটা কি ঠিক হবে? যদিও খেতে খুবই ইচ্ছে করছে। তুমি আমাদের আচার্য। তুমি যা বলবে তাই হবে।"

"তোরা ধর্মের কী বুঝিস? ধর্মের কোনও গোঁড়ামি যাতে না থাকে— সেটা আজ রাতে ভেঙে দিলাম। জীবনে কখনও খাওয়ার বাছবিচার করবি না। এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নেই।"

এর মধ্যে খাবার এসে গেছে। খুব তৃপ্তি করে শিবু আর অনি খেল। মৌরি খেতে খেতে রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে দাঁড়ায়। ওরা হাঁটতে থাকে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে। সামনে একটা সিনেমা হল। সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' চলছিল। পিসেমশাই তিনটে সিনেমার টিকিট কাটে। শিবু আর অনির মুখে কথা নেই।

অনি বলে, "পিসেমশাই, পইতের দিনে কতলোক আসবে। আমাদের না দেখতে পেয়ে কিছু ভাববে না তো? বাবা জেঠামণি নিশ্চয়ই খুব বকবে। কোথায় আমরা উধাও হয়ে গেছি।"

"আনন্দ যখন করবি ভাল করে কর। ভাবনাগুলো আমার হাতে ছেড়ে দে। আমি ম্যানেজ করে দেব।"

মুগ্ধ হয়ে তিনজন 'অপুর সংসার' দেখল। সিনেমা শেষ হলে পিসেমশাই একটা ট্যাক্সিতে অনি ও শিবুকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাত তখন এগারোটা হবে। বেশির ভাগ নিমন্ত্রিত লোকজন খেয়েদেয়ে বাড়ি চলে গেছে। যতিশেখর ও আনন্দশেখর শিবু ও অনিকে দেখে প্রচণ্ড খাপ্পা।

"আজকে পইতের দিনে তোমাদের বের হতে হল? সবাই তোমাদের খোঁজ করছিল। বেয়াদপির একটা সীমা আছে।"

হেমন্ত হইচই দেখে হাসতে হাসতে বলে, "আমি ওদের আচার্য, দীক্ষাগুরু। ওদের ভালমন্দর ভার আমার হাতে ছেড়ে দিন। ওদের মঙ্গলকামনায় আমি ওদের নিয়ে একটু দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। যাতে একটু ঠাকুর দেবতায় ভক্তিশ্রদ্ধা হয়।"

"তা বেশ, তা বেশ। তবে তোমাদের বলে যাওয়া উচিত ছিল।" যতিশেখর বললেন।

"ছেলেদুটো সারাদিন ঘরের মধ্যে আটকা পড়েছিল। ভাবলাম একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।" হেমন্ত বলে।

শিবু আর অনির প্রচণ্ড হাসি পেয়ে যাচ্ছিল পিসেমশাইয়ের মিথ্যে কথা শুনে। পিসেমশাইয়ের কথা ভেবে বহুদিন পইতের সন্ধেবেলার অভিযানের কথা ওরা কাউকে বলেনি।

অনি আর আকাশ পইতের উৎসবে প্রচুর গল্পের বই উপহার পেয়েছিল। কলোনিতে ফিরে অনি ওইসব বই দিয়ে একটা ছোট্ট ঘরোয়া লাইব্রেরি করে। আস্তে আস্তে বইয়ের সংগ্রহ বাড়ে— অনেকেই বইগুলো পড়তে নেয় অনির লাইব্রেরি থেকে।

হেমছায়ার কিছুতেই ভাল লাগে না এই কলোনির পরিবেশ। মারামারি, দলাদলি লেগেই আছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য চিন্তিত হেমছায়া। কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব। ছেলেমেয়েরা দিনরাত খালি পায়ে বাইরে বাইরে টো টো করে। ওরা কি কোনওদিন ভাল স্কুলে কলেজে পড়তে পারবে না? এই

মাটির ঘরেই সারাজীবন কাটাতে হবে? নিজেকে বড় অপরাধী লাগে। শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না বহুদিন। সবসময় ক্লান্তি ছেয়ে আছে।

হেমছায়ার শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনে এক ছুটির দিনে দ্বিজেন এসে হাজির কলোনির বাড়িতে। বড় দাদাকে দেখে হেমছায়া অস্বস্তি অনুভব করেন। হেমছায়ার দিকে তাকিয়ে বলেন— "হেম, একী চেহারা হয়েছে তোর? তুই আমাদের সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে আদরের বোন। তোর শাড়ি ছেঁড়া, গায়ে কোনও গয়না নেই, তোদের এই দুর্দশা কেন হল?"

হেমছায়া ম্লান হেসে দাদার দিকে তাকিয়ে বলে, "কতদিন পরে এলি আমাদের বাড়িতে। এখানে খেয়ে যাস কিন্তু।"

অনেক মিষ্টি এনেছেন দ্বিজেন ভাগনেভাগনিদের জন্য। সবাইকে কাছে ডেকে আনেন। আনন্দশেখর কাছে এসে বসেছেন। পরনে গেঞ্জি-লুঙ্গি— দাড়ি কামানো হয়নি। পায়ে খড়ম। কেমন একটা দীনতা কুণ্ঠা সারা শরীরে।

দ্বিজেন আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলেন, "দেখো আনন্দ, তুমি আমার শুধু শালাই নও, তুমি আমার বন্ধু, একটা কথা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার মধ্যে কত প্রতিভা ছিল, কত সম্ভাবনা ছিল। আজ তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তুমি জীবনযুদ্ধে হেরে গেছ। আদর্শের দিকে আলেয়ার পেছনে ছোটার মতো তুমি জীবনের বেশির ভাগটা কাটিয়েছ। কী পেলে? একবার ভেবেছ হেমছায়ার কথা? ছেলেমেয়েদের কথা? তুমি কি ঠিক করেছ এই বৃষ্টি কাদা, এই অন্ধকার, এই গ্রাম্য পরিবেশে সারাটা জীবনই কাটাবে? তোমার বন্ধু-বান্ধবদের দেখো, সহপাঠীদের কথা ভাবো। ওরা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তুমি পড়ে রইলে সর্বহারাদের দলে। এর জন্য তুমি দায়ী। কোনওদিন নিজের উন্নতির কথা ভাবলে না। সেই যে পি সি রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালে ঢুকেছিলে বিয়ের পরে— সেইখানেই অল্প মাইনেতে রয়ে গেলে। একি উদ্‌যোগের অভাব? না কি এ এক ধরনের দুঃখবিলাসিতা? তুমি যদি তোমার ছেলেমেয়েদের উন্নতি চাও, হেমছায়াকে যদি সুখী করতে চাও নতুন করে চাকরি খোঁজো। তুমি কেমিস্ট, তোমার চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না, আমারও বেশ-কিছু চেনাজানা লোক আছে। এখনও যদি চেষ্টা করো— জীবনের মোড়টা ঘোরাতে পারবে।"

চাবুকের মতো দ্বিজেনের কথাগুলো লাগল আনন্দশেখরের। মনে হল কে যেন জোর করে ঠেলে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিয়েছে। সত্যিই তো জীবনযুদ্ধে হেরে গেছেন আনন্দশেখর। হঠাৎ মনে হল দ্বিজেন যেন সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এতদিন একটু একটু করে চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছিলেন। এই প্রথম একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছেন।

"ঠিকই বলেছ দ্বিজেন্দ্র। উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, সেই ভোর সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই— রাত দশটায় ফিরি। সন্ধেবেলা একটা পার্ট-টাইম কাজ

করি। তবুও সংসার চলে না। ছেলেমেয়েরা আমাকে চেনে না। হেমছায়ার শরীর ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। একটা কিছু করা দরকার।"

এ যেন এক নতুন মানুষ আনন্দশেখর। সত্যি সত্যি চাকরি খোঁজা শুরু করলেন। মাসখানেকের মধ্যে একটা মনের মতো চাকরি পেয়ে গেলেন আনন্দশেখর। বেহালার ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির রিসার্চ কেমিস্ট। এদের 'লোকুলা', 'এন্টারোকুইনল', 'ক্যালরন' ভারতের ঘরে ঘরে। মাইনেপত্র ভদ্র গোছের। আর পার্ট-টাইম করতে হবে না, নটা-পাঁচটার কাজ। সম্পূর্ণ গবেষণার মধ্যে থাকবেন আনন্দশেখর। রিসার্চের কাজ হবে সর্পগন্ধা গাছ থেকে ব্লাড প্রেসারের ওষুধ 'রেসারপিন' তৈরি করা। এই কাজের জন্য বছর দুয়েক আগে সুইজারল্যান্ডের 'সিবা' কোম্পানির কেমিস্ট নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। 'সর্পগন্ধা'র গাছগুলো সিবার কেমিস্টরা কলকাতা থেকেই পায়— হাজার বছর ধরে আয়ুর্বেদে সর্পগন্ধার ব্যবহার চলে আসছে রক্তের চাপমাত্রা কমাবার জন্য। আনন্দশেখর আবার স্বপ্ন দেখছেন নতুন করে জীবন শুরু করার। এবার আর পেছনে তাকাবেন না। এবার সামনে চলার পালা। ছেলেমেয়েদের তৈরি করতে হবে, নজর দিতে হবে হেমছায়ার দিকে। বহুদিন অন্ধকার গুহায় হাঁটার পর হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেয়েছেন আনন্দশেখর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মস্থল থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি পেয়ে গেলেন আনন্দশেখর। একমাসের মধ্যেই কলোনির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে এলেন বেহালার পাঠকপাড়ায়। কলোনির বাড়িতে থাকবে ওদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়— পরে খুলনা থেকে বিধুশেখরেরা ফিরলে তাদের নতুন আস্তানার জন্য আর ভাবতে হবে না। কলোনির বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন থাকতে পারবেন।

নতুন বাড়িতে এসে সবাই খুশি। আত্মীয়স্বজন আর করুণা করবে না। কেয়া, অনি আর আকাশ নতুন স্কুলে, ভাল স্কুলে পড়বে। হেমছায়া বহুদিন পরে খুব খুশি। উদ্বাস্তু কলোনির সব স্মৃতি মুছে ফেলতে চান। নতুন করে কলকাতা শহরতলির বাসিন্দা হবেন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। ছেলেমেয়েরা বাবাকে দেখবে। নতুন করে সংসার শুরু করলেন হেমছায়া।

৮

অনি তন্ময় হয়ে কলোনির কথা ভাবছিল প্লেনের ভেতর বসে। দরমার বাড়ি আর কাদার মধ্যে পাঁচ বছর ছিল প্রফুল্লনগর কলোনিতে। গৌতম, খোকনের বন্ধুত্ব ছাড়া কলোনির কোনও ঘটনাই মনে রাখার মতো নয়। পাঁচ বছর ওরা সবাই মিলে খুবই কষ্ট করেছে। সামনে টেলিভিশনের স্ক্রিনে দেখতে পারছে ব্যাঙ্ককে পৌঁছতে প্লেনের এখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। একটু কফি খাওয়া যাক। বেহালার ঘটনা সাজাতে বসে অনি। ও নিজের জন্য সম্পূর্ণ একটা আলাদা ঘর পেয়ে খুশি হয়েছিল। মনে পড়ছে পাঠকপাড়ার কথা।...

আনন্দশেখর কলোনির বাড়ি ছেড়ে উঠে এলেন বেহালার পাঠকপাড়ায়। এক ভাড়াটে বাড়িতে। সাবেককালের বিরাট বাড়ি, তিনতলা, হলুদ রং। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। খুব খোলামেলা। উঁচু সিলিং, দোতলা ও তিনতলায় বিরাট ছাদ। অনেক ভাড়াটে। সামনে বিরাট মাঠ। বাড়ির সামনেই একটা জামরুল গাছ। তার পেছনে একটা পুকুর। এককালে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখন পানায় ভর্তি। কেউ ব্যবহার করে না। গাছের নীচে বিরাট কলতলা। টিউবওয়েল।

দোতলার ফ্ল্যাট পেয়ে হেমছায়া খুবই খুশি। গোটা তিনেক ঘর। একটা বসার জায়গা। সুন্দর রান্নাঘর ও বাথরুম। বিরাট ছাদটা সম্পূর্ণ নিজের, বাড়ির সামনে একটা ফাঁকা বারান্দা। সেখান থেকে অনেক দূর দেখা যায়। কলোনির বাড়িতে সন্ধে নামলেই অন্ধকার ঘিরে থাকত। কেমন যেন একটা আতঙ্ক হত হেমছায়ার। কোথায় সাপ. ব্যাঙ লুকিয়ে আছে। বর্ষার সময় দুর্গতির অন্ত ছিল না। চারিদিকে জলকাদায় মাখামাখি। আনন্দশেখর যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন গভীর রাত কলোনিতে। সবাই ঘুমিয়ে। হেমছায়া আর পিসিমা না খেয়ে বসে থাকতেন আনন্দশেখরের জন্য। অপেক্ষা করে থাকতেন কখন আনন্দশেখরের কথা শুনতে পাবেন, "দরজা খোলো"। তার পর নিশ্চিন্ত। হারিকেনে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। পড়তে বসলেই ঘুমের আবেশ লাগত ছেলেমেয়েদের। অন্ধকার হলে প্রচণ্ড মশার দাপট। এই দোতলা বাড়ির খোলামেলা পরিবেশ খুব ভাল লাগছে হেমছায়ার। ইলেকট্রিসিটি আর ফ্যান থাকাতে সন্ধেবেলাটা ভালই লাগছে হেমছায়ার। পুরনো আত্মীয়-স্বজন আবার যাতায়াত শুরু করেছে এই বাড়িতে। কলোনিতে যাতায়াতের খুব অসুবিধে ছিল বলে অনেকটা নির্বাসনেই কাটিয়েছেন হেমছায়া গত পাঁচ বছর। পিসিমা নতুন ফ্ল্যাট দেখে বলে, "বউদি, এতদিন পরে আমাদের দুঃখ ঘোচল।" দু'বেলা ভারী এসে জল দিয়ে যায় নীচের কলতলা থেকে। পিসিমা এখন সময় পান গল্প করার। এ ছাড়া ঈশানকে বড় করার দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের থেকেই। দোকান, বাজার, রেশন কিছুই বাড়ি থেকে দূরে নয়। খুব ভাল লাগছে এই নতুন পরিবেশ।

হাতে এখন অফুরন্ত সময় আনন্দশেখরের। কাজের চাপে সংসারের দিকে নজর দেবার সুযোগ হয়নি এতদিন। ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়ে গিয়েছে। কাক-ভোরে উঠে ট্রেন ধরার তাড়া নেই এখানে। আনন্দশেখরের অফিস হাঁটাপথে— দশমিনিটেই পৌঁছে যান অফিসে। সকালে উঠে চা খান। যুগান্তর কাগজটা পড়েন অনেকক্ষণ ধরে। এ-সব বিলাস ছিল না কলোনির বাড়িতে। বাড়ি থেকে ন'টা বাজার দশ মিনিট আগে বেরিয়ে যান অফিসে। ফেরেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। সন্ধেবেলা নিজের পরিবারের লোকের সঙ্গে সময় কাটাবার সুযোগ পাননি আনন্দশেখর বহু বছর। এখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধু হবার চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে কেয়া আর অনিকে নিয়ে যান ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরিতে। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা সুন্দর লাল বাড়ি। সামনে কত রংবেরঙের ফুল। আনন্দশেখরের ল্যাবরেটরি দোতলায়। মাঝেমাঝে হেমছায়া পান অথবা মিষ্টি অনির হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেন। অনিই বেশির ভাগ সময় যায়। অনিকে দেখলেই নেপালি দারোয়ান গেট খুলে দেয়। সাদা অ্যাপ্রন পরা বাবার সঙ্গে দেখা হয়। অনির বাবাকে দেখে গর্ব লাগে। হাতে টেস্ট টিউব। কত কিছু এক্সপেরিমেন্ট করছেন নতুন ওষুধ তৈরি করার জন্য। অনি মনে মনে ঠিক করে ফেলে বড় হলে বাবার মতো বিজ্ঞানী হবে। আনন্দশেখর একটা ইংরেজি বই কিনে দিয়েছেন অনিকে, দেশবিদেশের বিজ্ঞানীদের জীবনকথা। প্রতি রাতে বইটা পড়ে অনি ঠিক ঘুমোবার আগে। ম্যাডাম কুরি আর পিয়ের কুরির মতো গবেষণায় নিমগ্ন থাকবে অনি। বইটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে অনি।

সন্ধেবেলা এখন অফুরন্ত সময় আনন্দশেখরের। একটা নতুন জিনিস চালু করলেন। বিয়ের কিছুদিন পরেই হেমছায়াকে নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা শুনেছিলেন "আরতিস্তব ও শ্রীরামসংকীর্তন।" রামায়ণের গান। ভীষণ ভাল লেগেছিল দু'জনের। প্রতি সন্ধ্যায় সবাইকে নিয়ে বসলেন সেই আরতিস্তব করার জন্য।

"শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর নাম,
কালাত্মক পরমেশ্বর নাম।"

সন্ধেবেলায় প্রদীপের আলোয় আর ধূপের ধোঁয়ায় সবাই সংকীর্তন করছে, একশো আটটা রামনাম। হাতে বেলুড় মঠের ছোট ছোট বই। আকাশ বাজাত হারমোনিয়াম। আনন্দশেখর বেহালা। সবার আগে ইন্দ্রর মুখস্থ হয়ে গেল পুরো বইটা। প্রার্থনার জন্য সন্ধেবেলা সবাইকে জড়ো হতে হত। যে যেখানে থাকুক, খেলার মাঠে অথবা দোকান বাজারে, বাড়ি ফিরে আসতে হত সন্ধেবেলায়।

ছেলেমেয়েদের কাছের স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হল। অনি আর আকাশ ভর্তি হল বেহালা হাইস্কুলে। ইন্দ্র বাড়ির সামনে প্রাথমিক স্কুলে যায়। কেয়া যায়

মহাকালী বিদ্যাপীঠে, বেহালা থানার ঠিক সামনে স্কুল। সেখানেই ট্রাম-বাসের স্টপ। ইনাপিসি ম্যাট্রিক পাস করে গান শিখছে। অজয়কাকু বঙ্গবাসীতে ভর্তি হয়েছে বি এ ক্লাসে। রাতে প্রফেসরদের গল্প করেন, রাজকুমার চক্রবর্তী কীভাবে শেক্সপিয়রের হ্যামলেট আর ম্যাকবেথ পড়ান। অনি আর আকাশের বঙ্গবাসী কলেজের সব গল্প এখন মুখস্থ। অজয়কাকু ভোরবেলা বাজারটা করে দেয়। অনিও যায় সঙ্গে সঙ্গে। বেশ ভাল লাগে বাজার করতে অনির।

অজয়কাকুর জন্য একটা আলাদা ঘর এখন। ছোট্ট ঘর। শীতের দিনে লেপের মধ্যে অজয়কাকু শুয়ে থাকে আরাম করে। হাতদুটো ঢুকিয়ে। পাশে বসে থাকে আকাশ। আকাশের কাজ বইয়ের পাতা উলটে দেয়া। চোখের সামনে বইটা খোলা। পাতাটা পড়া হলে আকাশকে বলত অজয়কাকু, "এবার পাতাটা উলটে দে।" এই কাজের জন্য আকাশ প্রতি মাসে একটা টাকা পেত অজয়কাকুর কাছ থেকে।

ছাদের দিকের ছোট্ট ঘরটা অনির নিজের ঘর। ছোট্ট একটা খাট। চেয়ার, টেবিল, বইয়ের তাক। সামনে বড় জানলা। ছাদে যেতে হলে অনির ঘরের মধ্য দিয়েই যেতে হয়। হঠাৎ নিজেকে বড় মনে হয় অনির। সেই পাঁচ মাইল হেঁটে হেঁটে এখানে স্কুলে যেতে হয় না। বাড়ির কাছেই স্কুল। বিকেলে স্কুলের বন্ধুরা আসে। ছাদে গিয়ে সবাই গল্প করে। কখনও সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ে পর্ণশ্রীর মাঠে। বেলঘরিয়া থাকতে খুব খেলাধুলা করত অনি। বেহালায় এসে পড়ার নেশা পেয়ে বসল অনির। ক্লাস সিক্সে ভরতি হয়েছে। ওর একটা নিজের লাইব্রেরি হয়েছে। পড়াশুনো ছাড়া গল্পের বই পড়া একটা নেশার মতো অনির কাছে বাবার বন্ধু বাদল বিশ্বাস মাঝে মাঝে আসেন বেড়াতে। আমতলার কাছে এক মিশনারি স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক বাদল কাকাবাবু। যখনই আসেন অনির সঙ্গে কথা হয় পড়াশুনো নিয়ে, অঙ্ক নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে। বাদলকাকুই অনির পরিচয় করিয়ে দিলেন রাশিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে। টলস্টয়, চেকভ, ডস্টয়ভস্কির প্রচুর বই কিনে দিলেন অনিকে। অনির লাইব্রেরি থেকে অনেকে এখন বই নিয়ে পড়ে। স্কুলের দুই বন্ধু— তপন ও শ্যামল আসে বিকেলে। পর্ণশ্রীর মাঠে দেখা হয় সমরের সঙ্গে। সমর এই বয়সে বাংলা সাহিত্যের খুব খোঁজখবর রাখে। ওরা সারাটা বিকেল গল্প করে পর্ণশ্রীর মাঠে।

ছুটির দিনে মাদুর বিছিয়ে গানের আসর বসে বিরাট ছাদে, সন্ধেবেলার দিকে। দিনের বেলা আনন্দশেখরের কোনও বন্ধু উপস্থিত, হাতে মাছ নিয়ে। কখনও জ্ঞানেন্দ্র, কখনও সুধাংশু, কখনও সত্যমামা, কখনও বাদল বিশ্বাস। রোববারের খাওয়াটা খুব হইচই করে হয়। ইনা আর কেয়া গান শিখছে। আনন্দশেখরের সামনে গান গাইতে ওদের একটু ভয় লাগে। কোথায় একটু তালে ভুল হলে রক্ষা নেই। বিশেষ করে ইন্দ্র ভুল ধরতে ওস্তাদ। ইন্দ্র এর মধ্যে বেনারস ঘরানার রবীন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তবলা শিখছে। দারুণ বোল ওর হাতে। আকাশ বাজায় হারমোনিয়াম আর অর্গান। সংগীতটা ওর মজ্জায় মজ্জায়। সুন্দর গান গায় আকাশ। হারমোনিয়ামে আকাশ আর তবলায় ইন্দ্রর লহরা জমে যায়। হেমছায়া গান করেন রবীন্দ্রসংগীত। সঙ্গে বেহালায় অথবা সেতারে আনন্দশেখর। জ্ঞানেন্দ্রর কাছে শেখা গান গায় হেমছায়া। অনেক রাত পর্যন্ত চলে এই গানের আসর।

জামরুল গাছের নীচের একতলা বাড়িতে এলেন নতুন ভাড়াটে। জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, বড়িশা কলেজে পড়ান। খুবই শান্তিপ্রিয় লোক। বউ ফরসা লম্বা, জ্যোতিবাবুর চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক বড়। খুব হাসিখুশি। ওঁদের তিন মেয়ে— সবাই গান গায়। সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন হেমছায়া। রোববারের দুপুরে মাঝে মাঝে সবাই মিলে ওঁদের বাড়িতে অনুরোধের আসর শুনতে যেতেন। তার পর গল্প, চা-শিঙাড়া। ওঁদের মেয়েরা গান গাইত হেমছায়ার ছাদে, সান্ধ্য আসরে। বেশ গাইত পারুদি। কুমকুম গাইত আধুনিক। শ্যামল মিত্রের কাছে গান শিখত কুমকুম। অনির সঙ্গে খুব গল্প করত কুমকুম। মাঝে মাঝে নিয়ে আসত ওর এক বন্ধুকে অনির কাছে। নীচের ফ্ল্যাটেই থাকত গীতা। দিল্লি থেকে এসেছে। এক মিলিটারি অফিসারের মেয়ে। ফরসা, সুন্দরী দেখতে গীতাকে। বেণী দুলিয়ে হাঁটে। অনিকে দেখে মুচকি হাসে। কুমকুম ও গীতা বোধহয় অনির প্রথম গার্লফ্রেন্ড। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আর সরস্বতী পুজোয় অনি ওদের নিয়ে যায় পাড়ার ফাংশনে— গীতা দারুণ নাচে, আর গান গায় কুমকুম। অনির হঠাৎ মনে পড়ে প্লেনে যেতে যেতে দুই কিশোরী বান্ধবীর কথা। ওরা কোথায় আছে, কী করছে কে জানে? নিশ্চয়ই এখন কারও ঘরনি, কারও মা— চেনা চেনা মুখ কোথায় সব হারিয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় দেখা হলে চিনতে পারবে কি?

হেমছায়ার দোতলার লাগোয়া ফ্ল্যাটে থাকতেন এক ভদ্রমহিলা, তাঁর তিন মেয়ে আর দুই ছেলেকে নিয়ে। ছোটছেলে এয়ারফোর্সে, বড় ছেলে ইংরেজিতে এম এ, ছোটবেলায় পোলিওতে পঙ্গু। পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। তিন মেয়ে চাকরি করে। ফটফট করে ইংরেজি বলে। হাই হিল আর নাইলন শাড়ি পরে খুব কায়দা করে হাঁটে। বাড়ির বারান্দায় বিরাট একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর বাঁধা। রাতে প্রচুর লোকের আড্ডা, হইচই, পার্টি লেগেই আছে। ওদের নিয়ে পাড়াপড়শিদের কৌতূহল খুব। ভদ্রমহিলা খিদিরপুরের কোনও এক মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট। একদিন এসে হেমছায়ার সঙ্গে আলাপ করলেন। অনেক কথা হল। বললেন, "ইনা তো বাড়িতে বসে আছে। ও আমার অর্গানাইজেশনে ভলান্টিয়ারের কাজ করতে পারবে। এটা একটা আমেরিকান সেবা প্রতিষ্ঠান। অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হবে ইনার। এ ছাড়া নানাধরনের আমেরিকান খাবার ইনা তার কাজের জন্য পাবে।

ইনা সব শুনে খুব খুশি। বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে। সেই আমেরিকান সেবা সমিতিতে কাজ শুরু করল ইনা। বাড়িতে আসা শুরু হল নানারকমের টিন-ভর্তি আমেরিকান ফুড, ঘি, টমেটো জুস, মটরশুঁটি, ভুট্টার দানা, মিল্ক পাউডার, সারডিন মাছ। বেশ কয়েক মাস ধরে চলল বিদেশি খাবারের আনাগোনা হেমছায়ার হেঁশেলে। এর মধ্যে বিধুশখেরের ঘনঘন চিঠি। ইনার বিয়ে দিতে হবে। কলোনির বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। খুলনার সব পাট চুকিয়ে বেলঘরিয়ায় তিনি চলে আসতে চান। এর মধ্যে যেন ইনার বিয়ে ঠিক হয়।

প্রস্তুতি চলল বেশ কয়েক মাস ধরে। হঠাৎ চেতলার এক সম্ভ্রান্ত গাঙ্গুলি পরিবার থেকে ইনাকে দেখে পছন্দ করে গেলেন। নিজেদের বড় বাড়ি, ছেলে ব্যাঙ্কের অফিসার। খুব হইচই করে বিয়ে হয়ে গেল ইনাপিসির। অনির মনে পড়ে। বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল সকাল থেকে। ওদের ছাদে ম্যারাপ বেঁধে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিয়েটা খুব সুন্দর ভাবে হল। সব আত্মীয়-স্বজন এসেছিল সেই বিয়েতে। বিয়ের পরে কেয়া আর অনি মাঝে মাঝে দেখতে যায় ইনাপিসিকে, চেতলার পীতাম্বর ঘটক লেনে। বেশ আদর যত্ন করে খেতে দেয় ইনাপিসি। সুনীল পিসেমশাই মজার মজার গল্প করেন। সঙ্গে ব্যাঙ্কের ডায়েরি, পেন, ক্যালেন্ডার, চাবির রিং ইত্যাদি দিয়ে দেন অনি আর কেয়াকে।

আনন্দশেখরের সান্নিধ্যে কেমিস্ট্রির ওপর অনির একটা স্বাভাবিক দক্ষতা এসে গেছে। ঠিক পুজোর আগেই অনিকে নিয়ে আনন্দশেখর বসেন কিচেন কেমিস্ট্রিতে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের জন্য তৈরি করেন পুজোর উপহার। বাজার থেকে নানা ধরনের ছোট ছোট জার কিনে নিয়ে আসেন। টুথ পাউডার আর মুখে মাখার স্নো তৈরি হবে। অনি এখন বাবার অ্যাসিস্টেন্ট। আনন্দশেখর তাঁর ছোট পেতলের দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে বসেন। ছোট ছোট ওজন-বাটখারা— ১০ গ্রাম, ২০ গ্রাম, ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম। এই সময় অনির নিজেকে সায়েন্টিস্ট মনে হয়। স্প্যাচুলা, হামান দিস্তা, এনামেলের ডেকচি, খবরের কাগজ, সব নিয়ে গুছিয়ে বসে অনি। আনন্দশেখর ফরমুলা দেন অনিকে। অনি মেপে মেপে রাখে। এনামেলের ডেকচিতে বী ওয়াক্স (Bee Wax) গরম হচ্ছে। গলানো ওয়াক্সের মধ্যে কী কী ঢালতে হবে আনন্দশেখর বলে যান অনিকে। অনি ছোট ছোট পুরিয়া ঢেলে দেয়। স্প্যাচুলা দিয়ে আনন্দশেখর মেশান ওয়াক্সের সঙ্গে। এবার 'স্নো' তৈরি। ছোট ছোট জারে হেমছায়া আর পিসিমা ভরে রাখেন মুখে মাখার ক্রিম। এর মধ্যে অনি আর আনন্দশেখর তৈরি করছে দ্বিতীয় শারদীয়ার উপহার। টুথ পাউডার, সোডিয়াম বাইকার্বনেট আর সোডিয়াম মনোক্লোরো ফসফেটের পাউডার মেশানো হয়েছে। ব্লিচ করার জন্য একটু মিশিয়ে দিয়েছেন চারকোল। একটু মেন্থল ঝাঁঝের জন্য। এবার শিশিতে ভরা হচ্ছে টুথ পাইডার। সারা বছরের রসদ তৈরি হয়ে গেল। বিজয়ার পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব যারাই দেখা করতে

আসে, তাদের জন্য উপহার থাকে একশিশি টুথ পাউডার আর একজার ফেস ক্রিম।

আনন্দশেখরের কাছেই হাতেখড়ি হল অনির বাজি বানাবার। সোড়া, গন্ধক, অ্যালুমিনিয়াম, স্ট্রনশিয়াম আর লোহাচুর মিশিয়ে অনি তৈরি করত ফুলঝুরি, তুবড়ি আর পটকা। কালীপুজোর দিন মণ্ডপে মণ্ডপে তুবড়ি জ্বালিয়ে তাক লাগিয়ে দিত অনি। বন্ধুবান্ধবেরা অনির কাছ থেকে বাজি বানাবার ফরমুলা নিয়ে যেত। অনিকে কে যেন একটা কাঁধে ঝোলানো এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ দিয়েছিল। কালীপুজোর দিন সেই ব্যাগ ভর্তি করে বন্ধুবান্ধবেরা বাজি নিয়ে বেরত রাত্রিবেলা।

ইনাপিসির বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই জন্ম হলে হেমছায়ার দ্বিতীয় মেয়ে খেয়ার। এবারও পিসিমা এগিয়ে এলেন সাহায্য করার জন্য— মায়ামমতা দিয়ে খেয়াকে বড় করার দায়িত্ব নিয়েছেন। ঈশান এখন অনেক বড় হয়েছে। ইন্দ্রর পেছনে ঘোরাফেরা করছে। বড় বড় কাজল-টিপ দিয়ে সাজিয়ে দেন ঈশানকে পিসিমা। বিকেলে ইন্দ্রর সঙ্গে খেলার মাঠে যায়। মাঝে মাঝে কেয়া ঈশানকে নিয়ে যায় বান্ধবীদের বাড়িতে। কেয়ার এখন অনেক বান্ধবী। বিকেলে আড্ডা মারে ওদের বাড়িতে।

আকাশ আর ইন্দ্র বিকেলবেলা যায় 'সব পেয়েছির আসরে'। নানাধরনের খেলাধুলা, ড্রিল শেখে ওরা। সপ্রতিভ আচরণের জন্য ইন্দ্র স্কাউটমাস্টার বিমল চক্রবর্তীর খুব কাছের হয়ে গেল। বিমলদার কাছেই অল্প বয়সে তালিম পায় ইন্দ্র দল গড়ার ক্ষমতার। মাঝে মাঝে ওরা ফিল্ডে যায়। ইন্দ্র ধরে ব্যাঙ, সাপ, পোকামাকড়; নানাধরনের গানে নেতৃত্ব দেয় ইন্দ্র।

পাঠকপাড়া বাড়ির ফ্ল্যাটের কত চরিত্রের কথা মনে পড়ে অনির। লাচ্চুদার বিয়ের রাত এখনও মনে পড়ে। বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে থাকেন আলিপুর কোর্টের এক জজসাহেব। সুন্দর সৌম্য চেহারা। তাঁর ছোট ছেলে লাচ্চুদার সঙ্গে অনিদের খুব বন্ধুত্ব ছিল। লাচ্চুদা পাড়ার সব কিশোর-কিশোরীর খুব প্রিয় ছিল। খেলাধুলা, সরস্বতী পুজো, রবীন্দ্র জয়ন্তী— এ-সবের নেতা ছিল লাচ্চুদা। খুব সুন্দর দেখতে ছিল লাচ্চুদাকে। মুম্বাইয়ের ফিল্মস্টারদের মতো। ভাল একটা অফিসে কাজ করত। ছুটির দিনে সবাইকে ক্রিকেট শেখাত। হঠাৎ একদিন শোনা গেল লাচ্চুদার বিয়ে। বাড়ির সামনের মাঠে বিরাট করে ম্যারাপ বাঁধা হল। খুব হইচই করে বউভাত হল। নতুন বউকে দেখতে সবার সঙ্গে অনিও গিয়েছিল। খুবই সুন্দরী, লাচ্চুদার পাশে দারুণ দেখাচ্ছে। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সবাই বিদায় নিল। বেশ রাত হয়েছে। ফ্ল্যাটের সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল অনির। ইতিমধ্যে বাড়ির সবাই বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অনি জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে মা?"

"লাচ্চু বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।"

অনি দোতলার বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছে লাচ্চুদা দু'হাতে কোলে করে নতুন বউকে নিয়ে বাইরের মাঠে চলে এসেছে। ভয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করছে নতুন বউ, "আমায় ছেড়ে দাও।"

লাচ্চুদা বউকে দু'হাতে কোলে করে দোলাচ্ছে আর চিৎকার করে গান গাইছে, "দোলে, পিয়াল শাখে দোলে না।"

ওর মা চিৎকার করে কাঁদছেন, "লাচ্চু, বউমাকে ছেড়ে দে।"

কে কার কথা শোনে। লাচ্চু বউকে দু'হাতে কোলে করে দোলাচ্ছে আর গাইছে।

অনিরা সব ছুটে দেখতে এল নীচে, লাচ্চুদাকে। লাচ্চুদার চোখ লাল, সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখতে। চুলগুলো খাড়াখাড়া, বিভ্রান্ত। কোলের মধ্যে সিঁটিয়ে আছে নতুন বউ। সবাই জোর করে লাচ্চুদার হাত থেকে নতুন বউকে উদ্ধার করল। লাচ্চুদা তখন শেক্সপিয়র থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছে। তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। একটু পরে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে লাচ্চুদাকে লুম্বিনি হাসপাতালে নিয়ে গেল। বউভাতের রাতে উন্মাদ হয়ে গেল লাচ্চুদা। এর বেশ-কিছুদিন পরে জজসাহেব বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। অনির সঙ্গে লাচ্চুদার আর কোনওদিন দেখা হয়নি।

পাড়ার মধ্যে ছিল ভারতবিখ্যাত এক ব্যায়ামবিদ, সবাই তাকে নীলুদা বলত। মি. স্যান্ডো, মি. বেঙ্গল, মি. ইন্ডিয়া ইত্যাদি খেতাবে বিভূষিত নীলুদা। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটত সবাই একটু সমীহ করে চলত। ইয়া বুকের ছাতি, গেঞ্জির ভেতর দিয়ে হাতের গুলির কারুকার্য দেখা যায়। আনন্দশেখরকে নীলুদা মামা বলে ডাকতেন। একদিন আনন্দশেখর নীলুদাকে ব্রেকফাস্টে নেমন্তন্ন করেছেন। বাড়ি কাঁপিয়ে সকাল সাতটায় নীলুদা হাজির। হেমছায়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন, "নীলু, সকালবেলায় কী খাও?"

"বেশি কিছু না মামিমা। দশটা ডিমের ওমলেট, ৬ পিস রুটি আর এক গ্লাস দুধ।"

পিসিমা তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করতে রান্নাঘরে চলে যান। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হলে আনন্দশেখর বলেন, "নীলু, তোমার মতো আয়রন-ম্যান পাড়ায় থাকতে আমার ছেলেরা এত দুবলা কেন। অনির দিকে তাকিয়ে দেখো, ও তো হাওয়ায় উড়ে যাবে।"

নীলুদা বলেন, "বেশি পড়াশুনো করলে সব এনার্জিগুলো ব্রেনে চলে যায়। তবে আমার হাতে অনি পড়লে ঠিক মানুষের মতো হয়ে যাবে। বারবেল, ডামবেল, বেঞ্চপ্রেসে ওর শরীরটা মজবুত করা দরকার। বুঝলি অনি— দিনরাত বই পড়লে চোখের জ্যোতি কমে যায়, মাস্‌লগুলো শুকিয়ে যায়। এইজন্য তো আমি কোনওদিন স্কুলে গেলাম না।"

একটা নীল হাওয়াই শার্ট পরেছিল নীলুদা। "বড্ড গরম, জামাটা খুলে রাখি মামি"— এই বলে জামাটা খুলে রাখল। থাকে থাকে পেশির নাচ দেখে সবাই তাজ্জব। বিরাট বুকের খাঁচা, ছোট কোমর। বিরাট বিরাট বাইসেপস, ট্রাইসেপস। ফজলি আমের মতো। নীলুদা জানে সবাই ওকে দেখছে। কারণে অকারণে হাতগুলো এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে মাস্‌লের খেলা দেখাতে লাগল। হঠাৎ নীলুদা বলে ওঠে, "মামি, একটা আস্ত নারকেল আছে? ঝুনো নারকেল, থাকলে নিয়ে আসেন, একটা খেলা দেখাব।"

খাটের তলা থেকে একটা নারকেল নিয়ে আসে আকাশ। নারকেলটা হাতে তুলে বলে, "আপনারা কী দিয়ে নারকেলটা ফাটান?"

পিসিমা বলেন, "কখনও দা দিয়া, কখনও বা শিলনোড়া দিয়া।"

নীলুদা বলেন, "এর চেয়ে সহজ নিয়ম আছে।" এই বলে শুকনো নারকেলটা এক হাতে ধরে খুব জোরে মাথায় ঠোক্কর লাগায়। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হয়। সবার ধারণা মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়বে। তা নয়, নারকেলটা ভেঙে দু' টুকরো।

ইন্দ্র চিৎকার করে ওঠে, "এ তো দারুণ সার্কাস।" সবাই হাততালি দেয়।

হঠাৎ খপ করে প্রচণ্ড জোরে অনির হাতটা ধরে নীলুদা। ওর সরু হাতটা মনে হয় এখুনি ভেঙে যাবে পাটকাঠির মতো।

"ভয় পাবি না অনি। কাছে আয়। জানিস তো এই পৃথিবীতে জোর যার মুলুক তার। যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবি, মনে করবি তোর পায়ের চাপে তিনফুট মাটি নীচে নেমে যাচ্ছে। আজ তোকে দু'-একটা একসারসাইজ শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার ব্যায়ামাগারে চলে আয়। দেখবি চেহারা কাকে বলে বানিয়ে দেব। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে তোর দিকে। অ্যাই আকাশ, দুটো ইট নিয়ে আয় তো? একটা সোজা ব্যায়াম শিখিয়ে দিই। প্রতিদিন সকালে বিকেলে পঞ্চাশটা করে ডন বৈঠক দিবি।"

এর মধ্যে আকাশ ছাদ থেকে দুটো ইট নিয়ে আসে। নীলুদা দুটো ইট কাছাকাছি রেখে অবলীলাক্রমে পঞ্চাশটা ডন করল। এবার অনির পালা। দশটা দেবার পর অনির হাতে আর জোর নেই। "ওর কি কিছু হবে নীলু?" আনন্দশেখরের প্রশ্ন। "অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। শুভস্য শীঘ্রম। আজ বিকেলেই ও যেন আমার ব্যায়ামাগারে আসে।"

আনন্দশেখরের পীড়াপীড়িতে মাসখানেক অনি ব্যায়াম করেছিল নীলুদার তত্ত্বাবধানে। চারিদিকে আয়না সাজানো। একটু ব্যায়াম করেই আয়নায় দেখত নিজের চেহারা, হাতের গুলি কিছু বেড়েছে কি না? কিছুই উন্নতি হল না একমাসে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখত সবার কী সুন্দর চেহারা। নিজের লিকলিকে চেহারা দেখে লজ্জা লাগত অনির। চুপ করে নীলুদার ব্যায়ামাগারে একদিন

যাওয়া বন্ধ করে দিল। বাড়ির লোক বিশেষ করে আনন্দশেখর বুঝতে পারলেন যে অনির বুকের ছাতি বাড়াবার কোনও ইচ্ছেই নেই।

দেশ বিভাগের পর সর্বস্বান্ত হয়ে হেমছায়ার বড়দিদি বনলতারা উঠেছিলেন মানিকতলার এক মিলিটারি ব্যারাকে। স্বামী ধীরেন্দ্রের চাকরি নেই, টুইশনি করে সংসার চালায়। যুদ্ধের সময় এইসব ব্যারাকে সৈন্যরা থাকত। সরকার এখন নামমাত্র ভাড়ায় উদ্বাস্তুদের থাকতে দিয়েছে এই ব্যারাকে। প্রতি পরিবারের জন্য একটাই ঘর বরাদ্দ। বেশ বড় ঘর, সামনে একটা সরু বারান্দা। সেখানেই রান্নাবান্না হয়। পরপর সারিসারি ঘর। ফুটবল মাঠের মতো বিরাট লম্বা করিডর। দু'পাশে ঘর। করিডরের দুই প্রান্তে সর্বজনীন বাথরুম, অনেকগুলো একসঙ্গে। বেলঘরিয়ায় থাকার সময় অনি ও কেয়া মাঝে মাঝে বড়মাসির বাড়িতে বেড়াতে যেত কিছুদিনের জন্য। অনির সঙ্গে ওর মাসতুতো ভাই অভীকের খুব বন্ধুত্ব। অভীক অনির চেয়ে বয়সে বছর খানেকের বড়। একই ক্লাসে পড়ে। সুন্দর দেখতে অভীক। ফরসা টিকলো নাক, মাথায় ঢেউ খেলানো চুল। সেই তুলনায় অনি শ্যামবর্ণ। অভীক অনিকে নিয়ে কলকাতার রাস্তাঘাট চিনিয়ে দিত। হেঁটে হেঁটে দু' ভাই অনেক দূরে যেত, কলেজ স্ট্রিট, বসু বিজ্ঞান মন্দির, সাহিত্য পরিষদ। রাত্রিবেলা অনি আর ওর মাসতুতো ভাইরা সবাই মিলে মাদুর, বালিশ আর চাদর নিয়ে চলে যেত তিনতলা ছাদের ওপরে শোবার জন্য। ছাদে যাবার কোনও সিঁড়ি ছিল না। একটা ছোট ফোকর ছিল। সেইখানে মই লাগিয়ে সবাই ছাদে উঠত। বিরাট ছাদ। অনেক লোক শুয়ে আছে। অনি আর অভীক শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখত। দেখত মেঘের আনাগোনা। গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত কখন। মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়িয়ে নিত গায়ের চাদর। ছাদে কোনও প্রাচীর ছিল না। ওরা সবাই ছাদের মাঝখানে শুত। যাতে ঘুমের ঘোরে কেউ গড়িয়ে রাস্তায় না পড়ে যায়।

সকালবেলা অভীক আর অনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখত লোকজনের আনাগোনা। ঠিক আটটার সময় সুন্দর এক ভদ্রলোক কারুকার্য করা পাঞ্জাবি পরে নীচের পানের দোকান থেকে পান কিনতেন। অভীক বলে, "জানিস, এই শৌখিন ভদ্রলোকের নাম বাদশা ঠাকুর। আমাদের পাড়ায় থাকেন। ভদ্রলোক ঠাকুরবংশের ছেলে। দূর সম্পর্কের নাতি রবীন্দ্রনাথের। অভীকই একদিন অনিকে নিয়ে যায় জোড়াসাঁকোয়, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দেখাতে। ফেরার পথে ওরা দেখতে যায় মল্লিকদের মার্বেল প্যালেস। রংবেরঙের পাখি, পেইন্টিং, নানারকমের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সংগ্রহ দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। পরে অনি জানতে পারে এই পেইন্টিংগুলোর মধ্যে নাকি পৃথিবী-বিখ্যাত ফ্লেমিশ আর্টিস্ট পিটার রুবেন্স-এর চারটে পেইন্টিং আছে। মুরহাউসের লেখা 'ক্যালকাটা' বইটা পড়ে সে-খবর পায়।

বড়মাসির ব্যারাকের উলটোদিকেই দোতলা বাড়িতে থাকতেন কবি নজরুল ইসলাম। অভীক আর অনি সন্ধেবেলা কবিকে দেখার চেষ্টা করত। নজরুলের এক জন্মদিনে অভীক অনিকে নিয়ে গেল কবিকে প্রণাম করার জন্য। উদাস হয়ে তাকিয়ে আছেন বিদ্রোহী কবি, চিরকালের জন্য মৌন হয়ে গেছেন। একটা খাটে শয্যাশায়ী কবির স্ত্রী প্রমিলা— ফরসা সুন্দর দেখতে। মাথায় বড় করে সিঁদুরের টিপ। অভীক আর অনিকে কাছে টেনে খাটের ওপর বসতে বললেন। ঘরের মাঝে একটা বিরাট মাদুর পাতা। তার ওপর কবি বসে আছেন। গলায় ফুলের মালা। উদাস চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। কবির দুই ছেলে অনিরুদ্ধ আর সব্যসাচী পাশে বসে। প্রথমে সব্যসাচী ভরা গলায় আবৃত্তি করলেন 'বিদ্রোহী' কবিতা। তার পর অনেক নজরুল গীতি গাইলেন ফিরোজা বেগম। সবশেষে গিটারে বাবার প্রিয় গান বাজালেন অনিরুদ্ধ। লোক বলতে আর কেউ ছিল না। নজরুল-জন্মদিনের এই ঘরোয়া অনুষ্ঠান অনির মনে দাগ কেটে গিয়েছিল।

অনিরা বেহালায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই বনলতারা চলে এলেন বড়িশার বড়বাড়িতে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীর আদি বাড়িতে। অনির তখন মজা দেখে কে? ছুটির দিনে টুক করে বাসে উঠে অনি চলে আসত অভীকের কাছে। অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ লাগত এই বড়বাড়িতে।

পোড়ো নাটমন্দিরের সরুগলি পার হয়ে এই বড়বাড়ি। কলকাতার ইতিহাসের কত সাক্ষী এই বড়বাড়িতে আছে কে জানে? কত নর্তকী কত বাইজির কান্না এই জলসাঘরের কোণে কোণে জমে আছে। কালের মন্দিরায় সব হারিয়ে গেছে কলকাতার এই জমিদারের কত কাহিনী। অনি আর অভীক ঘুরে ঘুরে দেখে সেই ভাঙা ইটের কাজ, ভগ্নমন্দির, সেই জীর্ণ প্রাসাদ। অভীক বলে, "ভাবতে পারিস অনি, মাত্র তখনকার দিনের তেরোশো টাকায় সাবর্ণ রায়চৌধুরী, কলকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর দিল্লির বাদশা আওরঙজেবের কাছে বিক্রি করেছিল।" অভীক নিয়ে যায় একটা ছোট টিলার কাছে— যা দিল্লির দরবারের কাছে বেচাকেনার সাক্ষী হয়ে আছে।

মাঝে মাঝে অভীক আর অনি চলে যেত অক্সফোর্ড মিশনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা শুনত কনসার্ট। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাজাচ্ছে। কেউ বেহালা, কেউ চেলো, কেউ পিয়ানো। এইসব ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই অনাথ। জানে না এদের বাবা মা কে। এরা জন্ম থেকেই পিতৃমাতৃপরিচয়হীন। এদের কথা ভাবতে ভাবতে অভীক আর অনি উদাস হয়ে যেত। এখানেই প্রথম পাশ্চাত্য মিউজিকের সঙ্গে পরিচয় হয় অনির।

আনন্দশেখর একদিন বাড়ির সবাইকে নিয়ে শনিবারের সন্ধেবেলা পার্কস্ট্রিটের ওয়াই এম সি এ-তে নিয়ে গেলেন। বেহালা থেকে ট্রামে সন্ধে ছ'টার মধ্যে ওরা সব পৌঁছে যেত ওয়াই এম সি এ-তে। প্রফেসর নস্কর, তাঁর দুই ছেলে ও

ছাত্রছাত্রীরা মাসে একবার কনসার্ট দিতেন। শেষ হত ন'টা নাগাদ। ওয়েস্টার্ন মিউজিক শুনতে শুনতে অনির মন সাগরপারে চলে যেত। প্রফেসর নস্করের বড় ছেলে অমলেন্দু কলকাতা শহরের সব চেয়ে গুণী ভায়লিনিস্ট। তার ভাই কমলেন্দু দারুণ পিয়ানো বাজায়। কনসার্টের শেষে আনন্দশেখর সবাইকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গি যেতেন। সেখানে 'কল্পতরু'তে খাওয়া হত গরম গরম শিঙারা আর অমৃতি। তার পর রাতের ট্রাম ধরে বাড়ি ফেরা। প্রায় এক বছর ধরে আনন্দশেখর নিয়ে যেতেন এই ওয়েস্টার্ন কনসার্টে।

হঠাৎ একদিন আনন্দশেখর নিজেই ওয়েস্টার্ন মিউজিকে উৎসাহী হয়ে পড়লেন। অমলেন্দু সপ্তাহে একদিন করে পাশ্চাত্য সংগীতে বেহালা শেখাতে শুরু করলেন আনন্দশেখরকে। আনন্দশেখরের তখন বয়স চল্লিশের মাঝামাঝি। নতুন উৎসাহে শেখা চলল বেহালা অমলেন্দুর কাছে। অজয়কাকুর ঘরটা ফাঁকা। অজয়কাকু চলে গেছে বেলঘরিয়ার কলোনির বাড়িতে। একটা লোহার খাটের ওপর চেয়ার লাগিয়ে তৈরি হয়েছে মিউজিক স্ট্যান্ড। ওয়েস্টার্ন নোটেশন দেখে প্র্যাকটিস করেন আনন্দশেখর। আকাশ কানে শুনে সুরগুলো বাজিয়ে দেয় অর্গানে। ইন্দ্রজিতেরও ভাল লাগে এই নতুন সুর। গুনগুন করে গান গায়— হঠাৎ যেন নতুন সুরের জোয়ার লাগে। তানসেন, যদুভট্টর বদলে মোৎসার্ট আর বেঠোফেনের আনাগোনা বেহালার বাড়িতে। পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে অল্পবয়সেই পরিচয় ঘটল সবার— আনন্দশেখরের দৌলতে।

অজয়কাকু চলে যাবার পর অনি নিজেই বাজার করে। বাজার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে ও কেনে স্বপনকুমারের ডিটেকটিভ সিরিজ। অনি নিজেই বই বাঁধানো শিখে গেছে। ওর লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। স্কুলের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট হচ্ছে। অঙ্ক খুবই সোজা লাগে অনির। চটপট করে অঙ্ক করে। ওর এক সহপাঠী সমর সাহিত্যে খুব পটু। ভাল ছবি আঁকে। ভাল বাংলা লেখে। কিন্তু অঙ্কে সমরের খুব সংকট। সমর অনিকে ধরল অঙ্ক শেখার জন্য। অনি রাজি। পরিবর্তে সমর তার বহু মূল্যবান নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'কালো ভ্রমর'-এর চারটে খণ্ড উপহার দিল অনিকে। অনির তখন আনন্দ দেখে কে? কালো ভ্রমরের চাহিদা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রচুর। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে প্রথম শেষ করতে পারে পুরো সেটটা।

অনির ছিল প্রচুর ডাকটিকিটের সংগ্রহ। এ ব্যাপারে ওর স্কুলের দুই বন্ধু তপন আর শ্যামল খুব সাহায্য করেছে। বেশ-কিছু অ্যালবাম ভরে উঠেছে দেশবিদেশের ডাকটিকেটে। লোকজন এলে অনি ওর ডাকটিকিট দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত, বিশেষ করে মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোনেরা এলে। হঠাৎ একদিন ওর একটা মোটা অ্যালবাম পাওয়া যাচ্ছে না। অনির মন খারাপ। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আনন্দশেখর জেরা করেন আকাশ

ও ইন্দ্রকে। ইন্দ্রই বলল, "ছোড়দা স্ট্যাম্পের অ্যালবামটা ওর এক বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছে।"

"কেন দিয়েছিস?" আনন্দশেখর মারতে ওঠেন আকাশকে।

ইন্দ্র বলে, "সেই ছেলেটা ছোড়দাকে একটা গণেশের রাংতার ছবি দিয়েছে, তার বদলে ছোড়দা অ্যালবামটা দিয়েছে।"

"কী ছবি, নিয়ে আয়— আমাকে দেখা।"

আকাশ নিয়ে আসে রাংতার গণেশের ছবি। গোল করা ছবি— নতুন ধুতির ওপরে রাংতার সিল যাকে বলে— সেই ছবি।

"চল, আমাকে দেখা সেই বন্ধুর বাড়ি," চিৎকার করে ওঠেন আনন্দশেখর।

সবাই দলবেঁধে অ্যালবাম উদ্ধারের জন্য আকাশের বন্ধুর বাড়ি চড়াও হল। ও লোকজন দেখে তাড়াতাড়ি অ্যালবামের খাতাটা ফেরত দেয়। আকাশ ফিরিয়ে দেয় গণেশের ছবি। অনি ওর অ্যালবাম পেয়ে খুশি। কোনও স্ট্যাম্প খোয়া যায়নি বলে নিশ্চিন্ত। এই ঘটনা নিয়ে ইন্দ্র আকাশকে খোঁটা দিয়েছে বহুবছর।

"ছোড়দা, তুই কী করে রাংতার গণেশের সঙ্গে স্ট্যাম্পের অ্যালবামটা পাল্‌টালি। কী বোকা তুই।"

আকাশ চুপ করে হজম করত ছোটবেলার সেই ভুল। ইন্দ্রের কটাক্ষ। এই নিয়ে ইন্দ্র কম খোঁটা দেয়নি আকাশকে, বিশেষ করে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলে ইন্দ্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে মজার করে স্ট্যাম্প হারাবার গল্প করত। আকাশ লজ্জায় চুপ করে থাকত। রাগ হত ইন্দ্রর ওপর।

উৎসবের জন্ম হল বেহালার পাঠকপাড়া বাড়িতে থাকার সময়। উৎসবই ওদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বেহালা ট্রামডিপোর কাছে একটা নার্সিং হোমে ওর জন্ম হয়। কেয়া আর অনি নার্সিং হোমে দেখতে যেত মাকে আর উৎসবকে।

হেমছায়ার মেজোদিদি স্বর্ণলতা বহুদিন পরে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে ফিরেছেন। স্বর্ণলতার স্বামী অমর বহুদিন উড়িষ্যার রাজবাড়ির দেওয়ান ছিলেন, ছিলেন প্রধান শিক্ষক। প্রচুর টাকাপয়সা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন। শোনপুরের রাজার ছেলেমেয়েদের পড়ানোর দায়িত্ব ছিল অমরের। স্বর্ণলতার ছিল সোনার বরন। অমরও সুপুরুষ ছিলেন, কাশ্মীরী পণ্ডিতের মতো চেহারা। ওদের ছেলেমেয়েরা সবাই অপরূপ দেখতে। টালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি কিনেছেন অমর। বাড়ির ঠিক মাঝেই বাঁধানো উঠোন। চারিপাশে সার সার অনেক ঘর। বিরাট রান্নাঘর। বিরাট বাগান। সেখানে নানাধরনের গাছপালা। বেশ-কিছু মূলতানী গোরু কিনেছেন অমর। মেজোমাসির বাড়িতে গেলে খুব মজা হত কেয়া আর অনির। এত বড় বাড়ি। সবাই ছোটাছুটি করছে। রাতে স্টেজ বেঁধে নাটক করে।

বিরাট কড়াইয়ে দুধ জ্বাল হচ্ছে সারাদিন। প্রচুর ফল। কতরকমের রান্না হয় সারাদিন ধরে।

স্বর্ণলতার বড়মেয়ে, মেজোমেয়ে ও বড়ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজোছেলে বিষ্ণু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে শিবপুরে। ভাল ক্রিকেট খেলে। কেয়ার সঙ্গে বিষ্ণুর খুব ভাব। বিষ্ণুর পরের ভাই মদন অনির সঙ্গে গল্প করে। মদনের সাহিত্যে খুব ঝোঁক। এক গ্রীষ্মের ছুটিতে কেয়া আর অনি অনেকদিন ছিল মেজোমাসির বাড়িতে। খুব মজা হয়েছিল তখন। কোনও কাজ ছিল না। খাওয়াদাওয়া, গল্পের বই পড়া আর রাত্রিবেলা ভূতের গল্প করা। ভাগ্যের কী পরিহাস। এই মদনই পরে ইন্দ্রর সঙ্গে কাজ করত ফিল্মের ব্যাপারে। পরে ইন্দ্রকে পথে বসিয়ে দেয় এই মদনই।

অনি আর কেয়া একই ক্লাসে পড়ে। দু'জনেই তৈরি হচ্ছে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। ভালই পরীক্ষা হল। পবীক্ষার পর অনি আর কেয়াকে নিয়ে আনন্দশেখর ছোটবোন লীনার কাছে নিয়ে গেলেন বর্ধমানের কাছে গলসি বলে একটা জায়গায়। ওখানে লীনার স্বামী শ্যামাপতি পুলিশের ইন্সপেক্টর। ঠিক হল সপ্তাহ দুয়েক অনি আর কেয়া বড়পিসির বাড়িতে থাকবে। কেয়া আর অনিকে লীনার বাড়িতে রেখে আনন্দশেখর ফিরে গেলেন বেহালায়।

কলকাতা থেকে এতদূরে এসে কেয়া আর অনির খুব ভাল লাগছে। পিসেমশাইয়ের সুন্দর বাংলো। তার পাশেই থানা। সামনেই আদি গঙ্গা, পরিষ্কার টলটলে জল। গ্রীষ্মে অনেকটা শুকিয়ে গেছে। বড়পিসির দুই ছেলে সূর্য আর বিভাস অনিকে নিয়ে সারা দুপুর গঙ্গায় সাঁতার কাটে। বিকেলবেলা ওরা বেড়াতে যায় অনেকদূরে। গ্রাম বাংলার পথে, সূর্য পড়াশুনায় তুখড়।

সন্ধেবেলায় বড়পিসি সবাইকে নিয়ে বসে গান করেন। খুব সুন্দর গলা বড়পিসির। "আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে"— সঙ্গে গলা দেয় সবাই। গানবাজনার পর খাওয়াদাওয়া। নিত্যনতুন রান্না করেন বড়পিসি। এর পরে ঘর অন্ধকার করে পিসেমশাই রোমহর্ষক ডাকাতির গল্প শোনান। পিসেমশাই গুলি বের করে ফাঁকা পিস্তলটা দেখতে দিয়েছেন অনিকে। সত্যিকারের পিস্তল হাতে পেয়ে অনির খুব আনন্দ। নিজেকে কিরীটী রায় অথবা দীপক চ্যাটার্জি লাগছে। বেশ মজায় ছুটি কাটছে বড়পিসির বাড়িতে।

হঠাৎ একদিন আনন্দশেখর আর জ্ঞানেন্দ্র রাত করে হাজির বড়পিসির বাড়িতে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। অনি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে। অনেক করে লীনা থাকতে বলল ছোড়দাকে। আনন্দশেখর রাজি হলেন না। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে রাতের ট্রেনেই রওনা দিলেন কলকাতায় সবাইকে নিয়ে।

ট্রেনের বাঙ্কে জ্ঞানেন্দ্র আর আনন্দশেখর শুয়ে পড়েছেন। জানলার পাশে একটা সিটে অনি। উলটো দিকে কেয়া চুপ করে বসে। অনি জানলা দিয়ে রাতের আকাশ দেখতে দেখতে চলল। দু'চোখে ঘুম নেই। ওর উলটোদিকের সিটে এক

অপরূপা সুন্দরী বসে— অল্প বয়সের বউ। রাজস্থানী হয়তো হবে। ওর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। অনির মনে হল চোখের জল যেন গলে গলে মুক্তো হয়ে পড়ছে। অনি মনে মনে ভাবে এত সুন্দরীরও এত দুঃখ জমে? সবাই ঘুমিয়ে।

মনে সাহস করে অনি জিজ্ঞেস করে, "আপনার কী হয়েছে? কাঁদছেন কেন?"

বউটা কথার কোনও উত্তর দেয় না। দু'চোখ দিয়ে চোখের ধারা বেয়ে চলেছে।

হঠাৎ গম্ভীর গলায় এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "খোকাবাবু, ও আমার ছেলের বউ। ওর কোলের ছেলেটা আজকেই মারা গেছে। বড় দুঃখী আমার বউ। ওকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।"

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি। কলকাতা ফিরেই অনির কলেজের ভর্তি নিয়ে তোড়জোড় চলল। অজয়কাকুর খুবই ইচ্ছে অনি সেন্ট জেভিয়ার্সে অথবা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়। অজয়কাকু এখন পোর্ট কমিশনার্সে কাজ করে। মাঝে মাঝে অফিসের পর দেখা করতে আসে। অজয়কাকু সেন্ট জেভিয়ার্স আর প্রেসিডেন্সি কলেজের ফর্ম নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে হঠাৎ আনন্দশেখরের সঙ্গে ওঁর এক সায়েন্স কলেজের সহপাঠী অনিলবরণ মজুমদারের দেখা। অনিলবরণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ও সায়েন্স কলেজের ডিন। অনিলবরণই জোরজার করলেন যাদবপুরে ভর্তি হবার জন্য।

"আনন্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এখন খুব খারাপ। আমরা সব ভাল ভাল প্রফেসরকে অনেক মাইনে দিয়ে যাদবপুরে নিয়ে এসেছি। এখানকার ক্যাম্পাস পুরো আমেরিকান য়ুনিভার্সিটির মতো। ছাত্র কম— প্রচুর অধ্যাপক। ছাত্রছাত্রীদের ওপর খুব নজর রাখা হয়। তোর ছেলের যদি সায়েন্স পড়তে ইচ্ছে, যাদবপুরে ভর্তি করে দে।"

অনির খুব ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ছিল। তার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কলেজে পড়া দরকার। দ্বিজেন এসেছেন অনির পরীক্ষার সাফল্যের কথা শুনে। অনির ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে শুনে দ্বিজেন মোটেই উৎসাহী হলেন না।

"অনি, আমি ডাক্তার, আমি জানি মেডিক্যাল প্রফেশন কী। ডাক্তারি পড়লে তোর হয়তো অনেক টাকাপয়সা হবে, কিন্তু কোনও সোশ্যাল লাইফ থাকবে না। দিনে রাতে সব সময় পেশেন্টকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবি। টাকাপয়সাটা জীবনে সব-কিছু নয়। এমন কিছু নিয়ে পড়, যাতে জীবনে আনন্দ করতে পারবি। নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবি। জানিস তো আনন্দ কত বড় সায়েন্টিস্ট হতে পারত। সে দুঃখ এখনও মনের মধ্যে আছে। তুই তোর বাবার ইচ্ছা পূর্ণ কর। পিয়োর সায়েন্স নিয়ে গবেষণা কর। আনন্দ সত্যিই খুব খুশি হবে।"

আনন্দশেখরও দ্বিজেনের কথায় সায় দিলেন। অনির ডাক্তার হবার স্বপ্ন ভেঙে

গেল। ঠিক করল ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে পড়বে যা ওদের আত্মীয়-স্বজন কখনও পড়েনি। জিওলজি অনার্স নিয়ে অনি যাদবপুরে ভর্তি হল। টিউশন ফ্রি। এ ছাড়া একটা স্কলারশিপ পেল যাতে ওর হাতখরচ চলে যায়। প্রথম দিন থেকেই ওর যাদবপুর খুব ভাল লাগল।

সুন্দর সাজানো গোছানো য়ুনিভার্সিটি। ছোটখাটো ক্লাস। ক্লাসের সবাই খুব ভাল ছাত্রছাত্রী। খুব দরদ দিয়ে পড়াতেন বেশ-কিছু প্রফেসর। কেমিস্ট্রির একটা ক্লাস পড়াতেন আনন্দশেখরের সহপাঠী বিদ্যুৎকমল ভট্টাচার্য। হার্ভার্ড থেকে ফিরেছেন সম্প্রতি। পুরো আমেরিকান অ্যাকসেন্ট। ক্লাসে তন্ময় হয়ে ছাত্ররা শুনত বিদ্যুৎকমলের লেকচার। একদিন ক্লাসের পরে করিডরে অনি বিদ্যুৎকমলের সঙ্গে কথা শুরু ক'রে বলে, "ভীষণ ভাল লাগছে আপনার ক্লাস। বাবার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমার বাবার নাম আনন্দশেখর চট্টোপাধ্যায়। আপনার সঙ্গে সায়েন্স কলেজে পড়তেন।"

বিদ্যুৎকমল হেসে বলেন, "তুমি আনন্দর ছেলে? আনন্দ কী করছে? জান তো, আনন্দ আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট ছিল। প্রচুর গাট্‌সও ছিল। এককথায় আই সি আই-এর চাকিরটা ছেড়ে দিল।"

অনেক গল্প হল বিদ্যুৎকমলের সঙ্গে। সেই থেকে অনির ওপর বিদ্যুৎকমলের একটা স্নেহ পড়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎকমলের স্ত্রী ছিলেন আমেরিকান। ওঁদের কোনও সন্তান ছিল না। বহুদিন পরে শ্যামবাজারের মোড়ে অনির সঙ্গে দেখা বিদ্যুৎকমলের। তখন সম্পূর্ণ উন্মাদ বিদ্যুৎকমল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ফরমুলা আওড়াচ্ছেন। এত সোজা কেমিস্ট্রি রাস্তার লোকে বুঝতে পারছে না। এই ভেবে নিজের মনেই হাসেন বিদ্যুৎকমল।

যাদবপুরের প্রথম চারটে বছর অনির জীবনের স্বর্ণযুগ। কত ভাল প্রফেসরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিল তখন। ক্লাসের বন্ধুরা ছিল দারুণ। পড়াশুনোর যেমন চাপ ছিল, কলেজের পরে আড্ডাও চলত জোরকদমে। অনি মাঝেরহাট স্টেশন থেকে ট্রেনে করে যাতায়াত করত যাদবপুরে। কলেজের প্রথম দিকে এন সি সি-র নেভিতে ঢুকেছিল অনি। এন সি সি-র দৌলতে সারা ভারত ঘোরা হল অনির। এখনও মনে পড়ে প্রথম ক্যাম্প হয়েছিল কোচিনে, সমুদ্রের কোল ঘেঁষে। সারা ভারতের সব ক্যাডেট এসেছিল কোচিনে। অনির সহপাঠী বরুণও ছিল নেভিতে। বরুণের সঙ্গে অনির খুব বন্ধুত্ব হয় কোচিন থেকেই।

এ ছাড়া কলেজ থেকে জিওলজি ফিল্ডে গেছে প্রতি বছর, বিভিন্ন জায়গায়, কোলিয়ারিতে— নানাধরনের মাইনসে, ম্যাপ করার জন্য পাহাড়ে, পর্বতে। তবুও রাজমহলের ফিল্ডের কথা মনে পড়ে। সেবার বিরাট ক্যাম্প হয়েছিল। সারাদিন কাজ করে সন্ধেবেলা একটা ঝরনার তলে সবাই স্নান করত। ওদের সঙ্গে পড়ত ঢেঙ্কানলের রাজকুমার কামাখ্যাপ্রসাদ সিংদেও। পরে কামাখ্যা দিল্লির মন্ত্রী

হয়েছিল। এ ছাড়া ছিল চিরকুমার বোস, আলিপুরের ট্রামে করে কতদিন চিরকুমারের বাড়িটা দেখত অনি— 'সান সাওসি'— বিরাট মার্বেল প্যালেস। এককালে নাকি সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস স্যার ইলাইজা ইম্পের বাড়ি ছিল। তার পর রাসবিহারী ঘোষের। চিরকুমার ওদের সব বন্ধুদের একদিন নেমন্তন্ন করেছিল ওদের বাড়িতে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখিয়েছিল ঐতিহাসিক বাড়িটার।

অনির কলেজে ভর্তির কিছু পরেই হেমছায়ার ছোট ছেলে উৎসবের জন্ম হল। পাঠকপাড়ার বাড়িতে এখন জায়গার অভাব। নতুন বাড়ি খোঁজা হচ্ছে। আনন্দশেখরের এক দূর সম্পর্কের ভাই কেশব ব্যানার্জি। জাহাজের স্টিভেডরের ব্যাবসা করে খুব বড়লোক হয়েছেন কেশব। খিদিরপুরে বিরাট বাড়ি। সেই বাড়িতে দুর্গাপুজোয় আনন্দশেখর সবাইকে নিয়ে গেছেন অনেকবার। কেশবের এক বাগানবাড়ি ছিল বেহালায়। বড় মেয়ের নামে বাগানবাড়ির নাম "মঞ্জুবীথি"। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি। মাঝে বাঁধানো পুকুর। প্রচুর ফুলের গাছ। ম্যাগনোলিয়া, রজনীগন্ধা আর গোলাপের বাগান একদিকে। আর-একদিকে নতুন করে দোতলা বাড়ি। মাঝে মাঝে কেশব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক করতে আসেন বাগানবাড়িতে। একদিন আনন্দশেখরের সঙ্গে দেখা হতে কেশব বলেন, "দ্যাখ আনন্দ, অত সুন্দর বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। ইচ্ছে হলে মঞ্জুবীথির একতলাটা তুই ভাড়া নিতে পারিস। প্রচুর জায়গা। ভালই লাগবে। আমিও নিশ্চিন্ত থাকব।"

সবাই মিলে একদিন মঞ্জুবীথি দেখতে গেল। পাঠকপাড়ার বাড়ি থেকে হাঁটাপথেই— পঞ্চাননতলায়। বেশ রোম্যান্টিক বাড়ি। হেমছায়া খুব খুশি নতুন বাড়ি দেখে। একদিন ঠেলাগাড়ি ডেকে পাঠকপাড়ার সব জিনিসপত্র নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে এলেন আনন্দশেখর। নতুন বাড়ির পরিবেশে সবাই খুশি।

৯

অনি সিট থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ব্যাঙ্ককে পৌঁছে যাবে। এয়ারপোর্ট হোটেলে রাতের জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করা আছে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই ফাইভ স্টার হোটেল। এই হোটেলে অনি অনেকবারই থেকেছে যাতায়াতের পথে। বেশ ভাল লাগছে স্মৃতিচারণ করতে। ভাল লাগছে প্রথম যৌবনের কথা ভাবতে, 'মঞ্জুবীথি'র কথা ভাবতে।...

বড় বড় লোহার গেট খুলে নতুন বাড়িতে ঢুকলেন হেমছায়া। গেটের ওপরে লোহার একটা আর্চ। তাতে কেয়ারি করা মাধবীলতা গাছে থোকা থোকা লাল ফুল ফুটে আছে। দরজা খুলেই একটা গাড়ি বারান্দা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ড্রয়িং রুম। ড্রয়িংরুমের দুপাশে দুটো ঘর। তার পর টানা বারান্দা। একটা খাবার জায়গা।

রান্নাঘর, বাথরুম। সব-কিছুই ছিমছাম। মোজেকের ফ্লোর। সারা ঘরে বড় বড় জানলা। দক্ষিণমুখী বাড়িটা। দোতলা এখনও খালি। প্রচুর আলো, বাতাস। আশেপাশের বাড়ি বেশ দূরেই। পাঁচিল ঘেরা বাড়িতে একটা প্রাইভেসি আছে। পুবদিকের ঘরটা পছন্দ করলেন হেমছায়া নিজেদের জন্য। পশ্চিমের ঘরটা রইল অনি, আকাশ আর ইন্দ্রের জন্য। রাত্রিবেলা ড্রয়িংরুমে পিসিমা শোয়— সঙ্গে কেয়া, খেয়া, আর-একদিকে ঈশান আর উৎসব।

অনিদের ঘরের পশ্চিম দিকে বাড়ির লাগোয়া একটা বাঁধানো পুকুরঘাট। পরপর সিঁড়ি নেমে গেছে জলের দিকে। ঘাটের পাশে লাল সিমেন্টের একটা বসার জায়গা। তার পেছনে উঁচু পাঁচিল চলে গেছে বাড়ির উত্তরের সীমানা দিয়ে। পাঁচিলের ওপাশ থেকে বাঁশগাছের ঝাড় বসবার জায়গাকে সব সময় ছায়াবৃত করে রাখে। কেশব জ্যাঠা শৌখিন লোক। বাগানবাড়িটা সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পুকুরের পশ্চিমদিকে ফুলের বাগান। বাগানের মাঝ বরাবর উত্তর-দক্ষিণ দিকে বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে। মাঝখানে একটা বেদি— সেখানে ম্যাগনোলিয়া গাছ। সরু বাঁধানো রাস্তার দু'পাশে নানা ধরনের ফুলের বাগান। গোলাপ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, জুঁই, চামেলি, শিউলি। এ ছাড়া গ্রীষ্মের সময় ডালিয়া ও শীতের সময় গাঁদা। বাগানের উত্তরেই একটা নিকোনো মাটির ঘর। সেখানেই কেশব জ্যাঠা বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটির দিনে পিকনিক করেন। দক্ষিণদিকে আর-একটা বড় লোহার গেট। অনেকটা জায়গা নিয়ে মঞ্জুবীথির এই বাগানবাড়ি। বেশ রোম্যান্টিক লাগে অনির। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে পশ্চিমের বাগানে অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করে অনি, খোলা আকাশের নীচে। হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের। ভাবে কলেজের কথা বন্ধুবান্ধবের কথা । শীতের কোনও দেশে তুষারঢাকা পথে হাঁটছে। ভাবছে প্রবাসী জীবন...

মঞ্জুবীথিতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আনন্দশেখর বদলি হয়ে গেলেন সরশুনায়— ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালের মেইন অফিসে। বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। অফিসের গাড়ি নিয়ে যায়। দিয়ে যায়। রাতের দিকে প্রায়ই হাঁপানির টানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পানিহাটি ফ্যাক্টরির অ্যাসিড দূষণের মূল্য দিতে হচ্ছে প্রতি রাতে শ্বাস কষ্টে। ঠিকমতো ঘুম হয় না আনন্দশেখরের। হেমছায়াকেও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়।

কেয়া কলেজে যায়, যোগমায়া দেবীতে— ভোর সকালে। নতুন পাড়ায় এসে বেশ-কিছু বন্ধুবান্ধব হয়েছে। কেয়ার হাবভাব আনন্দশেখরের মতো। ভাইবোনের ওপর প্রচণ্ড দাপট। হিন্দিভজন শেখে এক ভদ্রমহিলার কাছে। কেয়ার গলাটা একটু ভাঙা। গলা খুলে যায়। ইন্দ্র দিদিকে ভ্যাঙায় গলা মোটা করে, ভজনের কলি গেয়ে—

"ভজরে ভাইয়া রামনাম সুখদাম"—

কেয়া ইন্দ্রর পেছনে ছোটে মারবার জন্য।

এই নতুন বাড়িতে ইন্দ্রই সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। ও নিউ আলিপুরে হরেন্দ্র বিদ্যাপীঠে যায়। দিনরাত ওর বন্ধুবান্ধব ঘরে আসছে। ওদের মোড়ের বাড়িতে থাকে এক মাদ্রাজি ক্রিশ্চিয়ান পরিবার। তাদের বড় ছেলে রডনি ইন্দ্রর খুব বন্ধু হয়ে গেল। বিরাট লম্বা চওড়া রডনি, ৬ ফুটের উঁচু দৈর্ঘ্য। ভাল স্পোর্টসম্যান, সেন্ট টমাসের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। ইন্দ্র রডনিকে বডি গার্ড করে ঘোরে। বুক ফুলিয়ে হাঁটে। কারণে অকারণে মাতব্বরি করে। পাড়ার লোকেরা মঞ্জুবীথির নাম দিয়েছে অ-আ-ক-খ-র বাড়ি— ইন্দ্রকে রাগাবার জন্য অ-আ-ক-খ-তে অনি-আকাশ-কেয়া আর খেয়ার প্রথম বর্ণ আছে। ইন্দ্রর নাম নেই।

ছেলেমেয়েদের নামকরণ নিয়ে আনন্দশেখর একটু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিতে চাইতেন। একদিন অনিকে ডেকে বললেন, "অনি, আমাদের পরিবারের বংশপঞ্জি দশমিক প্রথায় চালু করলে কেমন হয়? আমার ঠাকুরদা ছিলেন রামশেখর চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে দিয়েই শুরু করা যাক। তার সংখ্যা বংশপঞ্জিতে হবে ১। আমার বাবা বিধুশেখর আমার ঠাকুরদার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর সংখ্যা হবে ১.১। তাঁর চার ছেলে, চার মেয়ে, দাদা— যতিশেখর (১.১১), আমি— আনন্দশেখর (১.১২), লীনা (১.১৩), বীণা (১.১৪), ইনা (১.১৫), অজয় (১.১৬), নীনা (১.১৭) ও বিজয় (১.১৮)। বলতে পারিস আমার ছেলেমেয়েদের কী সংখ্যা হবে?"

অনি বলে, "খুবই সোজা। তোমাকে দিয়ে শুরু করি। তোমার বংশপঞ্জির সংখ্যা হচ্ছে ১.১২। আমরা পাঁচ ভাই, দুই বোন। শুরু হবে আমাদের সংখ্যা তৃতীয় দশমিক থেকে।

"কেয়া (১.১২১), আমি— অনি (১.১২২), আকাশ (১.১২৩), ইন্দ্র (১.১২৪), ঈশান (১.১২৫), খেয়া (১.১২৬) আর উৎসব (১.১২৭)। ডেসিম্যাল প্লেস থেকে বোঝা যাবে রামশেখর থেকে আমরা কত পুরুষের। আমি এই নিয়ে একটা বংশলতা করব।" আনন্দশেখর শুনে খুশি হন। "মনে রাখিস তোর কোড নাম্বার হচ্ছে ১.১২২। তোর ছেলেমেয়ে হলে সংখ্যার নামকরণ করবি চতুর্থ দশমিক থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নানাধরনের সাংকেতিক ভাষা ছিল। যাতে শত্রুপক্ষ বুঝতে না পারে। এটা আমাদের একটা ফ্যামিলি সিক্রেট কোড।"

আনন্দশেখর খুবই রাশভারী ছিলেন। ছেলেমেয়েরা ভয় পেত আনন্দ-শেখরকে। কিন্তু ইন্দ্রই বোধহয় প্রথম বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ইন্দ্রর পড়াশুনায় খুব একটা মন নেই। আনন্দশেখর অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করেও নিয়মমতো ইন্দ্রকে পড়তে বসাতে পারেননি। ইন্দ্রর মাঝে নিজের বেশ-কিছু মিল পান। ইন্দ্র অসম্ভব রাগী। কিন্তু লোকজন ভালবাসে। ভালবাসে গানবাজনা, হইচই। আড্ডা। ছুটির দিনে বাড়িতে গানবাজনার বৈঠক বসে। আনন্দশেখর এখন দর্শকের

ভূমিকায়। ইন্দ্রই এখন নতুন জেনারেশনের নেতা, পথপ্রদর্শক। ওর ডাকাবুকো ভাব দেখে আনন্দশেখরের ইচ্ছে, ইন্দ্র বড় হয়ে ডাক্তারি পড়বে। বাড়িতে একজন ডাক্তারের দরকার।

ইন্দ্রর কথার চালে, গানে, আর স্মার্টনেসে বাড়ির সবাই একটু ম্লান হয়ে গেছে। বাড়িতে ওই এখন মধ্যমণি। আকাশ আর ইন্দ্রর বন্ধু হল দুই ভাই— কানু আর ভানু। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ওরা। ওদের বাড়িতে আছে নানাধরনের বিদেশি গানের রেকর্ড। এসব গানের রিদম্ ইন্দ্রর খুব ভাল লাগে। স্কুলের পর ইন্দ্র ওখানে চলে যায়— পপ আর রক মিউজিক শোনে। কিন্তু এসব গান গাইবার জন্য চাই গিটার। ইন্দ্র তবলা বাজায়। ও ঠিক করল তবলা ছেড়ে গিটার শিখবে।

ইন্দ্রর হাতে কঠিন তবলার বোল উঠত সহজভাবে। ওর লহরা ছিল নিটোল, ছন্দময়। তবলা বাজিয়ে, গান গেয়ে আর আবৃত্তি করে ইন্দ্র অনেক প্রাইজ পেয়েছে। ইন্দ্র একদিন ঘোষণা করল ও তবলা ছেড়ে দেবে। একদিন সন্ধেবেলা আনন্দশেখরকে ইন্দ্র জানায় ওর মনোভাব—

"বাবা, আমি ঠিক করেছি আর তবলা বাজাব না। তার চেয়ে গিটার বাজাব। সারাজীবন ধরে আমি অন্যকে ফলো করতে পারব না, সংগত দিতে পারব না। সত্যিকথা, আমার মনে হয় তবলচিরা জাতে একধাপ নীচে— কণ্ঠশিল্পী, সেতারি বা সরোদিয়ার চেয়ে। তবলচিদের নিজস্ব সত্তা নেই। ভেবে দেখো, গভীর রাতে কেউ যদি সেতার বা সরোদ বাজায়— মনে হয় যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। আর গভীররাতে কেউ যদি ধুমধাম করে শুধু তবলা বাজায়, পাড়াপড়শিরা বিরক্ত, কুকুররা চেঁচায়। তবলাটা আসলে প্রকৃতির ছন্দঃপতন। মেঘডাকার মতন। মনে হয় যুদ্ধের দামামা।"

আনন্দশেখর বলেন, "এত বছর ধরে তবলা শিখলি ইন্দ্র, এককথায় ছেড়ে দিবি। কী মিষ্টি তোর হাত। ভাল তবলচির তবু কদর আছে। আমি তো কখনও কোনও নামকরা গিটারিস্টের নাম জানি না।"

"তার কারণ তুমি পপ মিউজিক শোন না। সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড আমেরিকায়, গিটার ছাড়া কোনও গানই হয় না। আমি নতুন ধরনের মিউজিক করব এদেশে। সুর মেশাব প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের।"

আনন্দশেখর দুঃখ পেয়েছিলেন ইন্দ্রর ব্যবহারে। কিন্তু কার সাধ্য ইন্দ্রকে বোঝায়। যেটা ঠিক করে সেটা করবেই। ইন্দ্র চায় পথ দেখাতে। ও যেতে চায় মিছিলের পুরোভাগে। ও কারও পেছনে হাঁটতে পারবে না। তবলা ছেড়ে শুরু করল গান। শুরু করল গিটার। বাড়ির কাছেই থাকেন বিদ্যুৎ ব্যানার্জি। খুব ভাল ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল গিটার বাজান বিদ্যুৎ। ইন্দ্র মনপ্রাণ দিয়ে গিটার শিখল বিদ্যুৎদার কাছে। গভীর রাতে ওর বাজনা শুনে মনে হয় কোনও এক জিপসি যেন

শত শতাব্দীর দুঃখ জানাতে আকুল হয়ে বাজাচ্ছে কোনও মরমিয়া সুর। ইন্দ্র শুরু করল নতুন সুরে গান বাঁধতে। বিদেশি ভাঙা সুর আর বাউলের আকুল ডাক মিশিয়ে নতুন গানের জোয়ার আনল ইন্দ্র। ইন্দ্রর সঙ্গে যোগ দিল ওর বন্ধুবান্ধব, আর ছোট ভাই ঈশান, পিসতুতো ভাই রঙ্গন। ইন্দ্রর জন্য সবসময় ভিড় লেগে আছে বাড়িতে। গানের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র নতুন ধরনের নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

বিয়ে পার্বণে ইন্দ্র ঈশানকে সাজায় বানর। ঈশানের গলায় দড়ি বেঁধে দেয়। নিজে বাজায় ডুগডুগি। ঈশানকে নিয়ে রাস্তায় বানর খেলা দেখায়। ঈশান করে বানরের অভিনয়। থেকে থেকে গা চুলকায় বানরের মতো। দাঁত বের করে ভেংচি মারে। থপথপ করে লাফায়— কখনও দু'পায়ে, কখনও চার পায়ে।

ইন্দ্র ডুগডুগি বাজিয়ে বলে, "ফুলকুমারী, বিয়ে করবি?" লজ্জায় লুটিয়ে পড়ে ঈশান।

"বিয়ে করবি দিলীপকুমারকে?"

মাথা নাড়ে ঈশান।

ইন্দ্র ও ঈশানের বানর খেলা দেখে সবাই হেসে লুটোপুটি।

বিয়ের বাসররাতে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ইন্দ্রর হিজড়ে নাচ। ঈশান আর ইন্দ্র শাড়ি পরে হিজড়ে নাচ করে। অদ্ভুত লক্ষ্য ইন্দ্রর। হিজড়েদের অঙ্গভঙ্গি, হাঁটা, গান— ইন্দ্রর মুখস্থ।

হিজড়েদের মতো হেড়ে গলায় গায় ইন্দ্র—

"মনের মতো কুসুম দিয়ে বাসর সাজাব
বাসর সাজাব সখী বাসর সাজাব।"

সঙ্গে গলা দিত ঈশান। গানের সঙ্গে দু' ভাইয়ের হিজড়ে নাচ।

ইন্দ্র আর ঈশান তালি বাজিয়ে বাজিয়ে আর মোটা গলায় গান গেয়ে নতুন বউয়ের কাছে গিয়ে বলে—

"কী হল দিদি, ছেলে হল না মেয়ে হল।"

ওদের নাচ আর গান দেখে সবার হাসতে হাসতে পেট ফাটার জোগাড়। বিয়ের সারারাত ধরে চলে ইন্দ্রর গান, অভিনয়, তার সঙ্গে লক্ষ্মণ ভাই ঈশানের সহযোগিতা।

অনির সাহিত্যে বরাবরই ঝোঁক ছিল। অনি আর অভীক আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়ে একটা হাতে-লেখা ম্যাগাজিন "বরণ" বের করে স্বর্গীয় দাদু ও দিদিমার স্মরণে। বছরে একদিন এই বরণ-উৎসব হত। মাসতুতো পিসতুতো, মামাতো, জেঠতুতো ভাইবোনেদের লেখায় বরণ খুব অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। উৎসবের দিন বরণ থেকে লেখা পড়া হত। গান হত। বেশির ভাগ লেখাই খুব মেলোড্রামাটিক ছিল। শিশুসাথী, শুকতারার লেখার মতো। অনি আর অভীক

লেখাগুলো ঘষেমেজে বরণের যোগ্য করার চেষ্টা করত। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব— সবাই বরণোৎসবে আসত মঞ্জুবীথিতে। এই উৎসবে আর লেখায় মেজোমাসির ছেলে মদন অনেক কাছের হয়ে গেল অনি আর অভীকের সঙ্গে। এই বরণেই আনন্দশেখর একটা প্রবন্ধ লিখলেন 'সর্পগন্ধা'র ওপর। বেশ-কিছু বছর পরে অভীকের কোম্পানিতে মদনের একটা চাকরি হয়। সে চাকরি বেশিদিন টেঁকেনি। পরে এই মদনই ইন্দ্রকে সর্বস্বান্ত করে। সে অনেক বছর পরে। অনি তখন প্রবাসী, আমেরিকায় থাকে।

উনিশশো বাষট্টি সালের মাঝামাঝি। অনির এখনও মনে পড়ে সেই সন্ধেটা। পরীক্ষা হয়ে গেছে মাসখানেকের আগে। বৃষ্টি পড়ছে সারাদিন ধরে। হঠাৎ কলেজের সহপাঠী বরুণ এসে হাজির।

"কী রে অনি, ঘরের ভেতরে বসে কী করছিস? কলেজ যাসনি? তোর জন্য আমরা সবাই বসেছিলাম। আজকে রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে।"

অনির বুকটা কেঁপে উঠল রেজাল্টের কথা শুনে।

"সত্যি বরুণ? আমি ভয়ে ভয়ে কলেজে যাইনি। তোর কী খবর?"

বরুণ চিৎকার করে ওঠে, "মাসিমা, মিষ্টি খাওয়ান, অনি পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে।"

"বরুণ, সত্যি কথা বলছিস? আমার ভয় ছিল চিন্ময় ফার্স্ট হবে। কে কে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে রে?"

"তুই, চিন্ময়, শ্যামাপ্রসাদ আর অশ্রু।"

হেমছায়া ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন অনিকে। চোখে জল। "অনি, তুই আমাদের মাথা উঁচু করে তুললি। এতদিনের দুঃখ, কষ্ট, আজ সব ভুলে গেলাম।"

আনন্দশেখর বললেন, "জানিস অনি, আমি যা জীবনে করতে পারিনি, তুই তাই করবি। আশীর্বাদ করি তুই বিরাট সায়েন্টিস্ট হবি। সারা পৃথিবী জুড়ে নামডাক হোক। এর চেয়ে বেশি আমি কিছু চাই না।"

অনি বাবা-মাকে এত খুশি দেখেনি বহুদিন। আনন্দশেখরের পুরনো দিনের দুঃখ আবার মনে পড়ল। অনি আর বরুণকে সব গল্প শোনায়, সায়েন্স কলেজের গল্প, পি সি রায়ের গল্প, ইম্পিরিয়াল কলেজের আমন্ত্রণের গল্প, বিলেতে গবেষণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার গল্প। ভাইবোনেরা সব অনিকে ঘিরে হইচই করে।

পরের দিন আনন্দশেখর ছুটি নিলেন অফিস থেকে। চৌরঙ্গি পাড়া থেকে একটু সুন্দর 'সাইমা' রিস্ট ওয়াচ কিনে দিলেন। সুইস ঘড়ি। দোকানের মালিক আনন্দশেখরের বন্ধু। অনির কথা শুনে খুব খুশি। জোর করে লস্যি খাওয়ালেন দু'জনকে। অনি ঘড়িটা পেয়ে খুব খুশি। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ভদ্রলোক একটা সুন্দর ডায়েরি দিলেন অনিকে কলেজের জন্য।

ঘড়ির দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে হাঁটছে। আনন্দশেখর জিজ্ঞেস করেন—

"কেমন লাগছে ঘড়িটা? এম এস্‌সি পড়বে। কলেজে খুব দরকার হবে। পছন্দ হয়েছে তো সুইস ঘড়িটা?" খুব ভাল লাগছে অনির বাবার এই উপহার। মাথা নাড়ে।

নিজেকে একটু বড় লাগছে ঘড়িটা পরে। অজয়কাকুর ঘড়িটা দেখে খুব লোভ হত। দু'পাশের দোকানে পণ্যসামগ্রী দেখতে দেখতে ওরা হাঁটছে। বাবা আর ছেলে।

"এই রেস্টুরেন্ট কলকাতার খুব বিখ্যাত। নাম অ্যামবার। দু'-একবার বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি। চল একটু সেলিব্রেট করি তোর পরীক্ষার সাফল্যে।"

অনি বাবার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢোকে, বেশ অন্ধকার। এয়ার কন্ডিশনড। মোটামুটি ভিড়। ওয়েটার ওদের একটা টেবিলে নিয়ে গেল। অনি বাবার মুখোমুখি বসে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। অনেকেই ড্রিঙ্ক করছে।

"কী খাবি?"

"তোমার যা ইচ্ছে।"

"এখানকার মোগলাই পরটা আর কষা মাংস খুব বিখ্যাত। খাবি?" অনি মাথা নাড়ে।

আনন্দশেখর অর্ডার দেন।

"অনি, এবার এম এস্‌সি পড়বি। খুব মন দিয়ে পড়বি। থিসিস লিখতে হবে। এর ওপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে। তার পর ডক্টরেট। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে। আমি যা পারিনি— তোর তাই করতে হবে। ছেলের মধ্যে দিয়ে বাবার স্বপ্ন পূর্ণ হয়।"

গরম গরম মোগলাই পরটা আর মাংস খেতে দারুণ লাগছে। বাবার সঙ্গে এরকম মুখোমুখি বসে অনি কখনও খায়নি। সঙ্গে গরম চা। খাওয়াদাওয়া হলে দু'জনে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ে। আনন্দশেখর আজ সত্যিই খুশি ছেলের কৃতিত্বে। নিজের কলেজের জীবনের কথা ভাবেন।

ওরা রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে যায় উত্তরদিকে। হঠাৎ একটা রেডিয়োর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। নানা ধরনের রেডিয়ো বিক্রি হচ্ছে। অনিদের বাড়িতে রেডিয়ো নেই। দু'পাশে নানাধরনের রেডিয়োর দোকান।

"বুঝলি অনি, তোর পরীক্ষার সাফল্যের জন্য একটা রেডিয়ো কিনে ফেলি। কী বলিস? কোনটা পছন্দ? ফিলিপস না টেলিফুঙ্কেন।"

অনি এক বন্ধুর বাড়িতে টেলিফুঙ্কেন রেডিয়ো দেখেছে। জার্মানির তৈরি, খুব সুন্দর আওয়াজ।

অনি বলে, "কিনলে টেলিফুঙ্কেনই কিনে ফেলো— জার্মানির জিনিস অনেক টেকসই, সুন্দর।" ওরা দোকানের ভেতর ঢোকে। বড় দোকান। মালিক খাতির

করে বসায়। আনন্দশেখর একটা সুন্দর টেলিফুঙ্কেন রেডিয়োর দাম জিজ্ঞেস করেন। দাম শুনে আঁতকে ওঠেন।

"এ যে আমার এক মাসের মাইনে, চল অনি। অন্য দোকানে যাই।"

পাশাপাশি অনেক দোকান। দাম প্রায় সবজায়গায়ই এক। আনন্দশেখরের ক্ষমতার বাইরে।

হঠাৎ একটা ছোট্ট দোকানে ওরা ঢোকে। দোকানের মালিক বাঙালি। পাশেই দু'জন কর্মচারী নানাধরনের রেডিয়ো তৈরি করছে। আনন্দশেখরের একটা রেডিয়ো খুব পছন্দ হল।

"স্যার, এর ভেতর টেলিফুঙ্কেন স্পিকার বসানো। দাম অর্ধেক অথচ কোনও ফারাক পাবেন না। আমারই তৈরি। এটা আমাদের খুব চলতি রেডিয়ো। নিয়ে যান। সারা জীবন এনজয় করতে পারবেন।"

রেডিয়োটা খুলে ওদের শোনান। দিল্লি থেকে কে যেন ক্ল্যাসিক্যাল গাইছে। পরিষ্কার আওয়াজ। সত্যিই মিষ্টি আওয়াজ। সামনে টিউনিং করার জন্য একটা ম্যাজিক আই। হরিণের চোখের মতো দেখায়। অনির খুব পছন্দ। আনন্দশেখর টাকাপয়সা দিয়ে রেডিয়োটা কিনে ফেলেন। সামনেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন—

"রেডিয়োটা কি ট্যাক্সিতে তুলে দেব? বাসে নিয়ে যাওয়া অসুবিধে হবে। অ্যাই ট্যাক্সি— বেহালা যাবে? ট্যাক্সিটা নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে যান।"

আনন্দশেখর বলেন, "ঠিকই বলেছেন ট্যাক্সি ছাড়া উপায় নেই। এত বড় বাক্স নিয়ে বাসে ওঠা যাবে না।"

ট্যাক্সি করে ওরা বেহালার দিকে রওনা দেয়।

"বুঝলি অনি, বাঙালির নিজের হাতে তৈরি করা রেডিয়ো। জিনিসটা ভাল, দামেও সস্তা।"

অনি ভাবে— রাত্রিবেলা পাশের বাড়ির রেডিয়োর আওয়াজ আসত। এবার ওরা বাড়িতে বসেই শুনতে পাবে— গান, বাজনা, খবর।

ওরা ট্যাক্সি থেকে মঞ্জুবীথিতে নামল। ট্যাক্সিওয়ালা রেডিয়োটা নামিয়ে রাখল। আনন্দশেখর আর অনি রেডিয়োটা ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। আকাশ ইন্দ্র ছুটে এসেছে। আকাশের ছোটকাল থেকেই যন্ত্রপাতির ওপর ঝোঁক। হেমছায়ার ঘরে একটা কাঠের আলমারি ছিল। ঠিক হল তার ওপরই রেডিয়োটা রাখা হবে। আকাশই বাক্স খুলে তার লাগিয়ে রেডিয়োটা চালিয়ে দিল। অনি সবাইকে ঘড়িটা দেখায়।

ইন্দ্র বলে, "দাদা, ঘড়িটা একটু পরে থাকতে পারি?"

অনি ঘড়িটা ইন্দ্রর হাতে পরিয়ে দেয়। সবাই গোল হয়ে বসে রেডিয়োর গান শুনল, শুনল খবর। শুনল নাটক। এর পর থেকে অনুরোধের আসর শোনবার জন্য

অন্য কোনও বাড়ি যেতে হবে না। এই ভেবে কেয়ার খুব আনন্দ হল।

অনির দিকে তাকিয়ে কেয়া বলে, "তোর কথাই আলাদা অনি। তুই গোল্ড মেডালিস্ট। সঙ্গে সঙ্গে রিস্টওয়াচ রেডিয়ো। বাবাকে কোনওদিন কিছু কিনতে দেখিনি। তুই তো এই বাড়ির ভোল পাল্টে দিলি। তোর ফার্স্ট হওয়ার কথা শুনে অনেকে দেখা করতে এসেছিল। তোর কল্যাণে এবার যদি আত্মীয়স্বজনদের মাঝে আমাদের একটু খাতির হয়। ছাপটা তুই প্রথম মুছে ফেলতে পারলি অনি। আমাদের আর কেউ হেলাফেলা করতে পারবে না।" অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে কেয়া কথাগুলো বলল।

যাদবপুরেই অনি ভর্তি হল এম এস্‌সি পড়ার জন্য— অ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে। টিউশন ফ্রি, ইউ জি সি-র স্কলারশিপ— হাতে এখন অনেক টাকা। টানাটানির সংসারে অনির পড়ার খরচ আর লাগবে না। প্রতিমাসেই স্কলারশিপের টাকা দিয়ে সংসারের জন্য কিছু কেনে অনি। হঠাৎ একদিন স্কুলের বন্ধু সমরেশের সঙ্গে দেখা হয় বেহালা হাইস্কুলের সামনে।

"কী রে অনি, কেমন আছিস? খবরের কাগজে তোর ছবি দেখলাম বি এস্‌সিতে ফার্স্ট হবার। দ্যাখ, আমার তো পড়াশুনো আর হল না। একটা ফার্নিচারের দোকান দিয়েছি। তোর সময় আছে? চল, আমার দোকানটা দেখিয়ে দিই।"

"চল। আমার কিছু করার নেই। তোর দোকানটা দেখে আসি।" বেহালা থানার পাশেই খুব সুন্দর দোকান সমরেশের। কত রকমের ফার্নিচার। বেশ নতুন ডিজাইন। একটা বইয়ের আলমারি দেখে অনি মুগ্ধ হয়ে গেল। ওর এতদিনের বইয়ের সংগ্রহ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। অনি আলমারির দুটো স্লাইডিং পাল্লা নাড়াচাড়া করছে। সত্যি ভাল লাগছে বুক কেসটা।

"বুক কেসটা নিবি নাকি অনি? তোকে সস্তায় দিতে পারি। কালকেই তোদের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি। তোকে পুরো টাকাটা একসঙ্গে দিতে হবে না।" অনি ভাবল স্কলারশিপের টাকায় বইয়ের আলমারিটা হয়ে যাবে। প্রতিমাসে একটু একটু করে টাকাটা শোধ দেবে। অনি রাজি হয়ে যায়। পরের দিন সমরেশ বুক কেসটা ঠেলাগাড়ি করে পৌঁছে দেয়। বাড়ির কেউ জানত না। মাঝের ঘরে রাখা হল বুক কেসটা। আকাশ আর ইন্দ্রর কী উৎসাহ। সবাই মিলে সব গল্পের বই অতবড় আলমারিতে সাজিয়ে রাখে। কাচের পাল্লা দিয়ে সব বই দেখা যায়। ইন্দ্র একটা খাতায় এবার থেকে লিখে রাখবে কেউ যদি কোনও বই পড়তে নেয়। ইন্দ্র বলে, "দাদা, এটা আমাদের ঘরোয়া লাইব্রেরি। ঠিক আর্যসমিতির লাইব্রেরির মতো আমরা চালাব। কতলোক বই নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। সব বইগুলো নিয়ে আসতে হবে। আমি একটা লিস্ট করছি আমাদের বইয়ের কালেকশনের।"

আস্তে আস্তে সমরেশের দোকান থেকে নানাধরনের ফার্নিচার আসে। প্রথমে

সাদা সানমাইকার ডিনার টেবিল, সঙ্গে চারটে সুন্দর চেয়ার। তার পর বাবা-মার জন্য একটা ভাল খাট। মাঝের ঘরে একটা সোফা। মঞ্জুবীথি আধুনিক হয়ে উঠল, সমরেশের সাহায্যে আর অনির স্কলারশিপের টাকায়।

দেখতে দেখতে আকাশ স্কুলের পড়া শেষ করে ফেলল। অঙ্কে খুবই ভাল আকাশ। সবার ধারণা খুব ভাল রেজাল্ট করবে। ছোটকাল থেকেই যন্ত্রপাতি নিয়ে সময় কাটায় আকাশ। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে। স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট ভাল হল না আকাশের। ভর্তি হল আশুতোষ কলেজে। ভবানীপুর পাড়ায় প্রচুর সিনেমা হল। প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সেখানে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেয় রেস্তোরাঁয়। হিন্দি গানের সুর ভাঁজে। ক্ল্যাসিক গানের ওপর আকাশের ঝোঁক। মহম্মদ রফি আর মুকেশের অনেক গান মুখস্থ। খুব সুরেলা গলা আকাশের। হারমোনিয়াম বাজায় ওস্তাদদের মতো। ইন্দ্রর মতো আকাশ সপ্রতিভ নয়। ওর কিছু বন্ধুই জানে আকাশের গানের প্রতিভা। ইন্দ্রের মতো সবার মাঝে আকাশ গান করে না। আকাশ গায় নিজের খুশির জন্য। ইন্দ্র আনন্দ দেয় সবাইকে।

* * *

অনি ভোরবেলা কলেজে বেরিয়ে যায় সকাল সাতটার মধ্যে। সেই কাকভোরে ওদের প্রফেসর সুবীর ঘোষ চারজন ছাত্রকে নিয়ে আলোচনায় বসেন থিসিসের গবেষণা নিয়ে। য়ুনিভার্সিটি তখন ফাঁকা। অনি ছাড়া সুবীরবাবুর কাছে গবেষণা করছে অনির তিনজন ক্লাসমেট— চিন্ময় অশ্রু আর বারীন। চিন্ময় অনিদের সঙ্গে সেকেন্ড হয়েছে। খুবই ভাল ছাত্র। সুবীরবাবু ব্যবস্থা করেছেন ভোরের এই সেমিনার। জিওলজির বেয়ারা ভোরবেলা এসে ল্যাবরেটরির দরজা খুলে রাখে। চা বানিয়ে রাখে সবার জন্য। সুবীরবাবু গ্রানিট পাথরের ওপর বিভিন্ন জর্নাল থেকে লেখা পড়ে শোনান— জিজ্ঞেস করেন কঠিন কঠিন প্রশ্ন। একটা ছোট ইনটেলেকচুয়াল গ্রুপ তৈরি করেছেন ছাত্রদের নিয়ে। বন্ধুর মতো হয়ে গেছেন সুবীরবাবু। ওঁর চার ছাত্রকে দিয়ে ছোটনাগপুর গ্রানিটের ওপর নতুন ধরনের কাজ করাতে চান। ঠিক হল অনি যাবে শিমুলতলায়, অশ্রু যশিডি, বারীন দেওঘরে, আর চিন্ময় কাজ করবে মুরিতে। পুজোর ছুটিতে ওরা বেরিয়ে পড়বে যে যার ফিল্ডে। সুবীরবাবু কাজের শেষে সবার কাছে ঘুরে ঘুরে যাবেন কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না দেখবার জন্য। ছাত্রদের নিজেদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রথম সম্পূর্ণ একা থাকবে অনি। ভাবতেই আনন্দ লাগছে। এবার সত্যিকারের বড় হওয়ার পালা।

শিমুলতলায় শীতের সময় কলকাতা থেকে বহু লোক বেড়াতে যায়। ওদের সহপাঠী রথীন প্রতিবছরই ওদের বাড়ির সঙ্গে ওখানে যায় পুজোর ছুটিতে।

"কিছু ভাবিস না অনি। আমি তোর জন্য একটা বাড়ি দেখে রাখব। সঙ্গে একটা রান্না করার লোক থাকবে। কবে শিমুলতলা আসছিস— জানাস। আমি স্টেশনে থাকব।"

রথীনের কথায় অনি আশ্বস্ত হয়। যদিও এন সি সি ও জিওলজি ফিল্ডে অনি বহুবার ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বেড়িয়েছে। বিদেশে একা থাকার অভিজ্ঞতা স্বাবলম্বী হবার প্রথম সোপান। ১৯৬৩ সালের পুজোর সময়। অনির বয়স তখন কুড়ি হবে। নতুন যুবক। উইলস ফিল্টার হাতে। চৌরঙ্গি পাড়ায় ইংরেজি মুভি দেখে। ইভতেশঙ্কু আর পাবলো নেরুদার কবিতা পড়ে। তর্ক করে মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়, আর ঋত্বিক ঘটকের মুভি নিয়ে। সন্ধেটা কাটায় কফি হাউসে তর্কের তুফানে। এবার যাত্রা শিমুলতলা। "গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ। আমার মন ভুলায় রে।"

অনি, অশ্রু আর বারীন পুজোর ঠিক আগেই বেনারস এক্সপ্রেসে উঠল রাতের গাড়িতে। আনন্দশেখর স্টেশনে এসেছিলেন ছেলেকে ট্রেনে তুলে দিতে। ভোর ভোর ট্রেন পৌঁছল শিমুলতলায়। অনি স্টেশনে নেমে দেখে রথীন আর ওর বাড়ির সবাই এসেছে অনিকে নিয়ে যেতে। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে রথীন নিয়ে গেল অনির জন্য ভাড়া বাড়িতে। লালকুঠি নাম। বেশ সুন্দর দোতলা লাল বাড়ি। চারদিকে শীতের ফুলের বাগান। বাড়ির পেছনেই একটা বিরাট বাঁধানো চত্বর। তার শেষে একটা ছোটঘর— আউট হাউস। ছোট বারান্দা দিয়ে ঘেরা। অনির পক্ষে যথেষ্ট। রথীনের মা বললেন, "অনি, আমরা দিন সাতেক আছি শিমুলতলায়। জানি দিনের বেলায় তুমি ফিল্ডে বেরবে। কিন্তু প্রতি রাতে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। আমি একটা কাজের লোক ঠিক করে দিয়েছি। ভোরবেলা এসে তোমাকে চা ও ব্রেকফাস্ট করে দেবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে লাঞ্চ। আমরা চলে গেলে ও রাতের রান্নাও করে যাবে।"

ঘরে জিনিসপত্র রেখে একটা তালা দিয়ে অনি বেরিয়ে পড়ল রথীনের সঙ্গে শিমুলতলা দেখতে। প্রথমেই একটা মিষ্টির দোকানে নিয়ে গেল রথীন— নন্দকিশোরের দোকান। বলল, "দ্যাখ অনি, শিমুলতলার জল খেলে তোর প্রচণ্ড খিদে পাবে। ভীষণ স্বাস্থ্যকর জায়গা। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ল্যাংচা আর কচুরি। সঙ্গে ঘন দুধের চা।" ব্রেকফাস্ট খেয়ে দু' বন্ধু বেরিয়ে গেল জিওলজি করতে। রথীন অনিকে দেখাল দু' পাশে গ্রানিটের পাহাড়। নিয়ে গেল লাট্টুপাহাড়ে। নলডাঙার রাজার পোড়োবাড়িতে। বিরাট সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে রাজবাড়ি। কেউ থাকে না। পরিত্যক্ত, সব ভেঙে গেছে। নানারকম কারুকার্য দেয়ালে। দরজা দিয়ে দেখা যায় লাট্টু পাহাড়। সুন্দর জায়গায় রাজবাড়ি ছিল। অনির এইসব পাহাড়েই কাজ। রথীনকে জিজ্ঞেস করে অনি, "কীসের তৈরি এই লাট্টু পাহাড়?"

"মনে হচ্ছে পিওর কোয়ার্টজ ভেন। চল উঠে দেখি।" দু' বন্ধু পাহাড়ের চুড়োর ওপর উঠে শিমুলতলা দেখল। শরতের হালকা শীতে অপূর্ব লাগছিল ছোটনাগপুরের শৈলমালা।

অনেক ঘোরাঘুরির পর দু' বন্ধু লালকুঠিতে ফেরে। রথীন বলে, "উঠোনেই কুয়ো আছে। একটা দারোয়ান জল তুলে দেবে। তুই স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নে। বিকেলে তোকে নিয়ে আমাদের বাড়ি যাব। তখন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।"

অনি হোল্ডঅল খুলে বিছানা পেতে নেয় খাটে। তার পর বাইরে স্নান করে নেয়। ফাঁকা বাড়ি। কেউ কোথাও নেই। দারোয়ান দু' বালতি জল তুলে রেখেছে। স্নান করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। দু' চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। সারারাত ট্রেনে তিনবন্ধু গল্প করে কাটিয়েছে। আগের স্টেশন যশিডিতে অশ্রু আর বারীন নেমে গেছে। ঠিক হয়েছে অশ্রু থাকবে পাহাড়কুঠি বলে যশিডিতে একটা পুরনো বাড়িতে। আর বারীন থাকবে দেওঘরের গ্র্যান্ড হোটেলে। প্রতি শনিবার রাতে তিন বন্ধু এক জায়গায় দেখা করবে— কখনও শিমুলতলায়, কখনও যশিডি, কখনও বা দেওঘরে। তখন জমিয়ে আড্ডা, আর রিসার্চের ব্যাপারে কথা হবে। রোববার বিকেলে যে যার জায়গায় ফিরে যাবে।

"অনি, দরজা খোল। ঘুমচ্ছিস নাকি?"

রথীনের দরজায় ধাক্কা আর চিৎকারে অনির ঘুম ভেঙে যায়। বিকেল হয়ে গেছে। দরজা খুলে দেয় অনি।

"এই হচ্ছে তোর কুক, শিউপ্রসাদ। ওই তোকে রান্না করে দেবে। বাজারটা তুই নিজেই করিস। ভারি ভাল লাগবে। শিউপ্রসাদের হাঁটুর কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা। রাতে নাকি লোকটা পার্ট-টাইম ডাকাতি করে।" অনি ভাবে কুক-কাম-ব্যান্ডিট— ভালই হয়েছে।

"শিউপ্রসাদ থাকাতে তোর কোনও ভয় নেই। ওই তোর বডিগার্ড। এ ছাড়া একটা ফিল্ড গাইড ঠিক করে রেখেছি তোর জন্য। নাম সাদিক আলি। এখানকার পাহাড় পর্বত, নদীনালা ওর মুখস্থ। ওই তোর ব্যাকপ্যাক, হাতুড়ি, পাথর সব বইবে। এখানে পর পর কিছু খুন হয়ে গেছে। সঙ্গে একটা লোক থাকা ভাল।"

রথীনের সঙ্গে অনি বেরিয়ে পড়ে। শিমুলতলা স্টেশনটা ছিমছাম। স্টেশনের কাছেই রথীনরা বিরাট বাড়ি ভাড়া করে আছে। প্রচুর লোকজন। মাসিমা খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হল। ফেরার সময় ওঁদের দারোয়ানকে সঙ্গে দিলেন লালকুঠি পৌঁছে দিতে। সঙ্গে রথীন। হাতে বড় টর্চ।

ভোরবেলা অনি ছোট্ট ক'রে বাজার করে। শিউপ্রসাদ ঝটাঝট রান্না করে দেয় ব্রেকফাস্ট। সঙ্গে নেবার জন্য রুটি ও তরকারি। জলের বোতলগুলো ভর্তি করে

রাখে। এর মধ্যে সাদিক চলে আসে। ভোর আটটার মধ্যে ফিল্ডে বেরিয়ে পড়ে। হাতে ম্যাপ— শিমুলতলার। সাদিককে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করে— এই নদীটা কোথায়? এই গ্রামটা কোথায়? কম্পাস দিয়ে কোথায় আছে বুঝে নেয়। হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙে ছোট ছোট স্যাম্পল নেয়। গ্রানিট পাথরে নানা ধরনের কারুকার্য— ফোল্ডস, ফল্টস। ছবি তোলে— নোটবুকে ছবি আঁকে। ক্লাইনোমিটার দিয়ে মাপে পাথরের ঢেউয়ের মাপজোপ। বোঝার চেষ্টা করে কী কী মিনারেল দিয়ে তৈরি। নদী, নালা, পাথরে আর পাহাড়ে কাজ অনির। জিওলজিক্যাল ম্যাপ তৈরি হচ্ছে। পাথরের স্যাম্পল থেকে ল্যাবরেটরিতে তৈরি হবে থিন সেকশন্। মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখতে হবে ক্রিস্টালগুলো— কী চাপ আর কী তাপ দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই পাথরগুলো। একটা সপ্তাহে অনেক কাজ এগিয়ে এল অনির। সন্ধেবেলা কাটে রথীনদের বাড়িতে হইচই করে। দেখতে দেখতে রথীনরা চলে গেল কলকাতায়। অনিও এক ছুটির দিন ঘুরে এল যশিডি থেকে। অনি আবার কাজের মধ্যে ডুবে থাকে।

অনি একদিন ফিল্ড থেকে ফিরে দেখে লালকুঠি জমজমাট। কলকাতা থেকে এক পরিবার পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন। সাদিক আলি অনির বারান্দায় ব্যাকপ্যাক থেকে পাথরগুলো বের করে রাখে বাইরের শেলফে। অনি স্নান করে খাওয়াদাওয়া সেরে ম্যাপ নিয়ে বসে। পাথরগুলোতে নম্বর লাগায় ছোট ছোট সাদা পেন্টের ওপর কালো কালি দিয়ে। প্রতিদিনের মতো সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনি পাথরে নম্বর লিখছিল। সামনের ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে অনির কাছে আসে। সুপুরুষ, ফর্সা রং। অনির বাবার চেয়ে একটু ছোটই হবে।

"কী করছ তুমি?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন।

অনি নিজের পরিচয় দেয়। "আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওলজি নিয়ে এম এস্‌সি পড়ছি। ফিল্ডের কাজে শিমুলতলা এসেছি। ছোটনাগপুর গ্রানিটের ওপর আমার কাজ। কী করে পাথরগুলো হল, কত পুরনো ইত্যাদির ইতিহাস তৈরি করছি।"

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, "আমার নাম কেশব মুখার্জি। শ্যামবাজারের ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ম্যানেজার। সঙ্গে আছে আমার বউ ও শালী। আমাদের কোনও ছেলেপুলে নেই। প্রতি পুজোর সময় আমরা বেরিয়ে পড়ি ভারত ভ্রমণে।" এই বলে চিৎকার করলেন—

"সানু, এদিকে আয়— তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

এক ভদ্রমহিলা ছুটে এলেন লালকুঠি থেকে। কী অপরূপ দেখতে। অনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সানুর দিকে। ফরসা, লম্বা, চোখদুটোয় সারা পৃথিবীর দুষ্টুমি।

"সানু, এর নাম অনি— অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। যাদবপুরে এম এস্‌সি পড়ছে জিওলজি নিয়ে। হাবভাব থেকে মনে হয় পড়াশুনায় ভাল।"

তার পর অনির দিকে তাকিয়ে বলে—

"দেখো অনি, সানু আমার ফেবারিট শালী, কিন্তু ওর বিয়ে ঠিক। কলকাতায় ফিরেই ওর বিয়ে। একা একা আছ। ওর সঙ্গে কথা বলতে পার। সানু তোমার চেয়ে অনেক বড়। সানুদি বলে ডাকবে। সানুর সঙ্গে গল্প করো, গান শোনো— কোনও আপত্তি নেই। শুধু মনে রেখো ও এনগেজড। ভুল করেও প্রেমে পড়ো না। দুঃখ পাবে। এ ছাড়া আমাকে কাকাবাবু বলবে। কাকিমা বোধহয় তোমার জন্য রান্না করতে ব্যস্ত। সন্ধেবেলাটা তুমি কাজ থেকে ফিরলে আমরা তাস অথবা লুডো খেলব। তার পরে একসঙ্গে খাব।"

শুরু হয়ে গেল অনির সন্ধেবেলার রুটিন। কাকাবাবু নিজেই সেল্‌ফমেড গার্জিয়ান। সানু উত্তর কলকাতার বনেদি ঘরের মেয়ে। লরেটো থেকে ইংলিশে বি এ করেছে। এবার তৈরি বিয়ের জন্য। হইচই হাসি ঠাট্টা দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখল। খেলার সময় অনি আর সানু পার্টনার হত। কাকিমার স্নেহমাখা মুখ এখনও মনে পড়ে অনির। নিজের সন্তান না থাকাতে সব মায়া-মমতা অনির ওপর পড়েছিল। সন্ধেবেলা ফিরলেই সানু চলে আসে অনির বারান্দায়।

"কী জিওলজিস্ট। আজ কী নতুন আবিষ্কার করলে?" সাদিকের কাছ থেকে পাথরগুলো নিয়ে সাজিয়ে রাখে। ছোট তুলি নিয়ে সাদা পেইন্ট দিয়ে পাথরের ওপর গোলগোল বৃত্ত এঁকে রাখে। শুকিয়ে গেলে অনি যাতে নাম্বারগুলো লিখতে পারে। এর মধ্যে গরম গরম চা আর কচুরি। তার পর খেলার পর্ব। খেলতে খেলতে অনি মাঝে মাঝে সানুর দিকে তাকিয়ে থাকত। কী সুন্দর, কী সপ্রতিভ, কী স্বাভাবিক— কী প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এই মেয়েটি।

দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল। বিকেল বেলা অনি আর সানু বাইরের বারান্দায় বসে গল্প করছিল। এর মধ্যে অশ্রু আর বারীন হইচই করতে করতে ঢুকল। সানুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বারীন বলে— "বেশ জমিয়েই আছিস অনি।" কথাটা শুনে সানু উঠে চলে গেল। বারীন বলল— "শালা ভেবেছিলাম আউট হাউসে আছিস, যেখানে চাকরবাকর থাকে। এর মধ্যেই রাজকন্যা খুঁজে পেয়েছিস। ভাগ্যবানরা কপাল করে আসে। দেওঘরে শুধু দাঁতফোকলা বুড়িই দেখে গেলাম— তীর্থ করতে এসেছে, শিবের মন্দিরে মাথা কুটছে।" এই বলে বারীন পকেট থেকে ছোট্ট ব্রান্ডির বোতল বের করে। কাকাবাবু এর মধ্যে এসেছিলেন পরিচয় করতে। বারীনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "অনি, মনে হচ্ছে তুমি আজ সারা সন্ধে ব্যস্ত থাকবে বন্ধুদের নিয়ে। আজকে আমাদের রাতের প্রোগ্রাম ক্যানসেল।" ব'লে লালকুঠির দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অনি অশ্রু আর বারীনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। যেভাবে বারীন চিৎকার করছে অনির খারাপ লাগছে। "বেড়ে মাল তোর সানু। একটু মাইরি আলাপ করিয়ে

দিবি। টাঙ্গায় করে সবাই মিলে লাট্টু পাহাড় ঘুরে আসতে পারি। অনি, মনে হচ্ছে সিরিয়াস ব্যাপার।” এই বলে ব্রান্ডির বোতলটা শেষ করে ফেলে বারীন।

“ওরকম গাঁক গাঁক করছিস কেন বারীন, ওরা শুনতে পাবে? সব খুলে বলছি। তার আগে একটু চা বানিয়ে নিই।” এই বলে জনতায় কেটলিটা বসিয়ে দেয়।

চা আর বিস্কুট খেতে খেতে অনি বলে সানুর কথা, কাকাবাবুর কথা. কাকিমার কথা। কীভাবে সন্ধেটা কাটে ওদের সঙ্গে।

“দেখ, সানুর বিয়ে ঠিক। সামনের সপ্তাহে ওরা ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়। কিন্তু সত্যিই ভাল মেয়েটা। তোর কথায় কী ভাবল কে জানে? ভেবেছিলাম আজ সবাই মিলে ওখানে খাওয়াদাওয়া হবে। তাসখেলা হবে। তুই সব ভেস্তে দিলি। কাকাবাবু খুব কড়া লোক। তুই শালা এমন চিৎকার করলি— ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘরে যা আছে তাই খেতে হবে।” অনি একটা ডেকচিতে ভাত, আলু ও ডিম চাপিয়ে দেয়। এক শিশি ভাল ঘি, তার সঙ্গে লঙ্কা। রাতের খাওয়াটা হয়ে যাবে।

খাওয়াদাওয়া হলে তিনবন্ধু ম্যাপ নিয়ে বসল বারান্দায়। লালকুঠির দরজা বন্ধ। অনি ভাবছে সানু এখন কী করছে কে জানে। সবাই মিলে পাথরগুলো দেখল। বারীন সবাইকে একটু করে ব্রান্ডি দেয়। ঝকঝকে রাত। আকাশ ভরা তারার মেলা। বিরাট উঠোনটা ফাঁকা। ওরা জিওলজি নিয়ে তর্ক করে। যশিডি, দেওঘর আর শিমুলতলা নিয়ে ছোটনাগপুর গ্রানিটের একটা বিরাট ক্রসফোল্ড আছে। তিনটে ম্যাপ পরপর সাজিয়ে ওরা বুঝতে পারে। সুবীরবাবু এ ধরনের ফোল্ড নিয়ে আলোচনা করেছিলেন গ্রিনল্যান্ডের গ্রানিটের। তিনবন্ধু খুব উত্তেজিত। ফোল্ডের কোরকটা শিমুলতলা— হাত-পাগুলো ছড়িয়ে আছে যশিডি আর দেওঘরে— পাহাড়কুঠি আর ত্রিকূট পাহাড়ে। এখানকার পাহাড় দুশো কোটি বছর আগেকার। এর তুলনায় হিমালয়ের বয়েস নবীন— ছ'কোটি বছরের মতো। এ নিয়ে তিনবন্ধু আলোচনা করে হারিকেনের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত। সিগারেটের ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে যায়। ততক্ষণে লালকুঠির আলো নিভে গেছে। সানু বোধহয় গভীর ঘুমে। ঘুমেও নিশ্চয়ই ওকে সুন্দর দেখায়। অনি ভাবে নিজের মনে।

* * *

পরের দিন ভোরবেলা অনি বেরিয়ে পড়ে অশ্রু আর বারীনের সঙ্গে যশিডি আর দেওঘরের দিকে। নন্দকিশোরের দোকানে ওরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে সকালের ট্রেনেই যশিডি পৌঁছে গেল। একটা মাত্র স্টেশন। অশ্রুর বাড়ি স্টেশন থেকে দূরে নয়— পাহাড়কুঠি নাম। বাড়ির প্রাঙ্গণেই গ্রানিটের দারুণ ফোল্ড। সুন্দর ম্যাপ

করেছে অশ্রু। সুবীরবাবু গ্রিনল্যান্ডের গ্রানিটের যেসব ছবি দেখিয়েছিলেন— ঠিক সেই রকম দেখতে ফোল্ডগুলো। অশ্রুর বাড়ির চারিদিকে প্রচুর আতা গাছ। পাকা পাকা ফল। সারাদিন ওরা ফিল্ডে কাটাল। বিকেলবেলা ওরা দেওঘরে পৌঁছল বারীনের গ্র্যান্ড হোটেলে। বারীন নিয়ে গেল নন্দন পাহাড়ে। অদ্ভুত সুন্দর গ্রানিটের কারুকার্য। সন্ধেবেলা ওরা খেয়েদেয়ে টাঙ্গা করে এক জমজমাটি হিন্দি বই দেখতে গেল। ঠিক হল রাতটা বারীনের হোটেলেই কাটাবে। ভোরের ট্রেনে শিমুলতলা ফিরে আসবে অনি।

সিনেমা দেখে ফিরতেই হোটেলের ম্যানেজার চিৎকার করে বললেন, "বারীনবাবু, আপনাদের বাবা কলকাতা থেকে দেখা করতে এসেছিলেন, আপনাদের দেখা না পেয়ে রাগ করে বেনারসের দিকে রওনা দিয়েছেন।"

অশ্রু শুনেই বলল, "আমার বাবা অসুস্থ, একা একা দেওঘরে আমার জন্য কখনওই আসবে না।"

বারীন বলল, "আমার বাবা হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। প্রচণ্ড রাগী। প্রথম কথা আমার জন্য কখনওই কাজ ফেলে আসবে না। যদি বা আসে এর মধ্যে পুলিশ লাগিয়ে দেবে আমাদের খোঁজার জন্য।"

সব শুনে অনির মনে হল আনন্দশেখরই এসেছেন অনিকে দেখতে— সারপ্রাইজ ভিজিট। অনি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল— "ভদ্রলোকের কী নাম? দেখতে কেমন?"

ম্যানেজার কাঁচুমাচু করে বলল, "নাম তো ভদ্রলোক বলেননি— তবে প্রথমে তিনি শিমুলতলা, তার পর যশিডি, সবশেষে দেওঘরে এসে ছেলেকে দেখতে না পেয়ে বেনারসের দিকে রওনা দিয়েছেন। বলেছেন, যাবার আগে যশিডিতে আর-একবার খোঁজ করে যাবেন— পাহাড়কুঠিতে।"

"অনি, তোর বাবাই এসেছে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়— যদি ওঁকে ধরতে পারি।" অশ্রু বলে।

তাড়াতাড়ি তিনবন্ধু রওনা দিল পাহাড়কুঠিতে। ওখানেই পৌঁছতে অশ্রুর রাঁধুনি বলে উঠল, "আপনারা কোথায় থাকেন? কোথায় আড্ডা মারেন? আপনাদের বাবা কত খোঁজ করলেন আপনাদের জন্য। কত করে বললাম, দুটো খেয়ে বিশ্রাম করুন— ওরা নিশ্চয়ই চলে আসবে। কিছুতেই কথা শুনলেন না। এক কাপ চা খেয়ে চলে গেলেন কাশীর দিকে। আপনারা যদি টাঙ্গা করে এইমাত্র রওনা দিয়ে যান— ওনাকে স্টেশনে ধরতে পারবেন। আধঘণ্টা পরেই ট্রেন।"

অশ্রু রান্নার ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করল, "কিছু রান্না হয়েছে?"

"না বাবু, আপনারা এলে গরম গরম ডিমের ডালনা, ডাল আর বেগুনভাজা খাওয়াব ভেবেছি। ডিমগুলো সেদ্ধ করে রেখেছি। বেগুনগুলো হলুদ মাখিয়ে রেখেছি।"

অশ্রু বলল, "সেদ্ধ ডিম আর বেগুনগুলো একটা ঠোঙায় তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। বেগুন ভাজতে হবে না। আমরা এক্ষুনি ছুটব স্টেশনের দিকে।"

ওরা তিনজন একটা টাঙ্গা নিয়ে স্টেশনের দিকে চলে এল। বারীন গেল তিনটে শিমুলতলার টিকিট কাটতে। অশ্রু আর অনি ছুটল প্ল্যাটফর্মের দিকে। ট্রেন আসছে দূরে। হুইস্‌ল বাজিয়ে। ওরা প্ল্যাটফর্মে খুঁজছে আনন্দশেখরকে। সামনের দিকে একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আনন্দশেখর একা একা। অনি ছুটে গিয়ে আনন্দশেখরের কাছে গিয়ে বলে, "বাবা, তুমি এরকম না জানিয়ে চলে এসেছ কেন? দেওঘরে শুনেই আমরা যশিডি ফিরি অশ্রুর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে ওর রাঁধুনির কাছে শুনলাম তুমি নাকি কাশী যাচ্ছ। একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলে স্টেশনে গিয়ে আমি নিয়ে আসতাম। এরকম দুর্ভোগ হত না।"

অভিমানে আনন্দশেখরের গলা ধরে এসেছে। "লালকুঠিতে তোমার কাকাবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি গতকাল সারাদিন আড্ডা মেরেছ— অশ্রু আর বারীনের সঙ্গে। সিগারেট খাও— ড্রিঙ্ক করো। সিনেমা দেখো। অনেক দুঃখে আমি কাশী রওনা দিচ্ছি। ভেবেছিলাম আমার ছেলে বড় সায়েন্টিস্ট হবে। অনি— আমি বড়ই ডিসাপয়েন্টেড। তোমাকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন— মনে হচ্ছে সব ভেঙে যাচ্ছে।"

অনি বুঝল— বারীন কাকাবাবুকে যথেষ্ট রাগিয়ে দিয়েছে। অনেক বুঝিয়ে আনন্দশেখরকে ঠান্ডা করে। বাড়ির সবাই কেমন আছে— ভাইবোনেরা পুজোয় কী করছে ইত্যাদি খবর খুঁটিয়ে নিচ্ছে। অশ্রু, বারীন দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, "মেসোমশাই আজকে রাতটা শিমুলতলায় থেকে যান। কাল রাতের ট্রেনে কাশী যাবেন।"

"ভেবে দেখি।" আনন্দশেখর এখন অনেক স্বাভাবিক। শিমুলতলায় ট্রেন থামল। রাত এগারোটা বেজে গেছে। চারিদিক শুনশান। চুপচাপ। সবাই মিলে হাঁটছে লালকুঠির দিকে।

"তোমার ফিল্ড কেমন হচ্ছে?"

"ভালই। আমরা একটা দারুণ কাজ করছি।" অশ্রু বলে।

"বিরাট একটা ফোল্ড আমরা আবিষ্কার করেছি। এর আগে কত জিওলজিস্ট এখানে কাজ করেছে— কেউ বুঝতে পারেনি। সুবীরবাবু দারুণ খুশি হবেন আমাদের কাজ দেখে। খুব খাটতে হয়। আমরা ছুটির দিন দেখাসাক্ষাৎ করি। নোট মেলাই। কারণ আমাদের কাজটা টিমওয়ার্ক। ছাড়াছাড়ি হলে খেই হারিয়ে ফেলব।"

কথা বলতে বলতে ওরা লালকুঠি পৌঁছে যায়। বড় বাড়িতে অন্ধকার— কাকাবাবুরা সব ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনি দরজা খুলে বিছানাটা পরিষ্কার করে বাবাকে বলল "সারাদিন হাঁটাহাঁটিতে তুমি ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম নাও। আমি ঝট করে একটু রান্নাটা করে ফেলি। সবাই মিলে খাওয়া যাবে।"

আনন্দশেখর টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সারাদিন ছেলেকে খুঁজে পেতে কম হয়রানি হয়নি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। এর মধ্যে অশ্রু জনতার পলতে জ্বালিয়ে বেগুন ভাজতে শুরু করেছে। বারীন ডিমগুলো ছাড়িয়ে রেখেছে একটা প্লেটে। অনি একটা ডেকচিতে চালগুলো ধুয়ে রাখল। মাপ মতো জল দিল। যাতে একটু পরেই ভাতটা রান্না করা যায়।

আনন্দশেখর একটু পরেই বিছানায় উঠে বসেন। "বাঃ! তোমরা তো বেশ রান্না শিখে গেছ। জীবনে স্বাবলম্বী হওয়া খুব ভাল। কখন কী পরিবেশের মধ্যে পড়বে জান না তো। সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজি শিখে রাখা দরকার।"

বারীন ফিসফিস করে বলে, "মেসোমশাইয়ের রাগ এখন জল। আমার বাবা হলে সারারাত জ্ঞান দিতেন।"

হঠাৎ আনন্দশেখর বলে ওঠেন, "ইউরেকা। তোমাদের রান্না আমি দূর থেকে লক্ষ্য করছি। হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এল। মনে হয় না এর আগে কেউ ভেবেছে।"

আনন্দশেখরের বিজ্ঞানী মন জেগে উঠল, ভাত রান্না দেখে। "দ্যাখ অনি, তোর মা বছরের পর বছর রান্নাঘরে কাটিয়েছে। সারাজীবন হয়তো কুড়ি হাজার বার ভাত রান্না করেছে। কিন্তু যেহেতু সায়েন্সে ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, চিরকালই হাঁড়িতে ভাত রেখেছে। ভাত সেদ্ধ হলে ঢাকনিটা হাঁড়ির মুখে দিয়ে কাত করে ফ্যান ঢেলেছে। সারা ভারতেই এই প্রথা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। তোদের বড় কেটলিটা দেখে মনে হচ্ছে ভাত রান্নায় আমরা একটা মেজর ব্রেক থ্রু করতে পারি যাতে ভবিষ্যতে হাজার হাজার ভারতীয় মহিলার কিছু কষ্টের লাঘব হয়। মন দিয়ে আইডিয়াটা শোন। তার পর এক্সপেরিমেন্ট। ডেকচির বদলে আমরা কেটলি ব্যবহার করব। প্রথমে চাল আর জল কেটলিতে দিয়ে সেদ্ধ করব ভাত। তার পর ভাত সেদ্ধ হলে আমরা কেটলিটা কাত করব। ফ্যান বেরিয়ে যাবে স্পাউট দিয়ে। ভাত পড়ে থাকবে কেটলিতে। এলিমেন্টারি কেমিস্ট্রি।"

আনন্দশেখরের কথাটা অনেকটা শার্লক হোমসের মতো শোনাল। বারীন বলে ওঠে, "মেসোমশাই, আইডিয়াটা দারুণ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কেউ এর আগে ভেবে দেখেনি। আমরাই একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি।"

আনন্দশেখর গর্বের সঙ্গে বলেন, "বিজ্ঞানে একেই বলে সেরেন্ডিপিটি— হঠাৎ আবিষ্কার।" এই বলে আনন্দশেখর লুঙ্গিটা বাঁধতে বাঁধতে স্টোভের কাছে চলে আসেন। অশ্রু ও বারীন জায়গা করে দেয় আনন্দশেখরকে। অনি বাবার ইজিচেয়ারের হাতলের গল্প ভুলতে পারেনি। কৌতূহলী হয়ে দেখছে বাবার কাণ্ডকারখানা। যেমন কথা তেমনি কাজ। কেটলির মধ্যে চাল আর জল দিয়ে বারীন বসিয়ে দেয়। আনন্দশেখর বাইরে এসে দাঁড়ান। "একটু হাতমুখে জল দিয়ে আসি।" অনি বাবাকে কুয়োর পাড়ে নিয়ে যায়। অনি আর আনন্দশেখর পাইচারি

করেন বাড়ির সামনের খোলা জায়গায়। ভাত হলে বারীন ডাকবে বলেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাজ কেমন হচ্ছে জিজ্ঞেস করেন আনন্দশেখর।

বেশ-কিছু পরে বারীন বাইরে এসে জানাল ভাত সেদ্ধ হয়ে গেছে। "বাইরে কেটলিটা নিয়ে এসো" আনন্দশেখর আদেশ করেন অ্যাসিস্টেন্টকে। কেটলিটা বাইরে নিয়ে আসা হল। আনন্দশেখর এবার ডেমন্‌স্ট্রেশন দেবেন, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কী করে সহজেই ভাত রান্না করা যায়। তিনবন্ধু আগ্রহে দেখছে। আনন্দশেখর কেটলিটা কাত করেছেন। কিন্তু কই ফ্যান তো বের হচ্ছে না কেটলির নল দিয়ে। তবে কি জল কম? এক্সপেরিমেন্টে ভুল? অনেক কসরত করার পর হেরে গেলেন আনন্দশেখর। বললেন, "'কেটলি থেকে ভাতটা ডেকচিতে ট্রান্সফার করো। তার পর বেশি হিট দিয়ে মাড়টাকে ভেপোরাইজ করে দিলেই চলবে। ঝুরঝুরে ভাত পড়ে থাকবে।"

বারীন আনন্দশেখরের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট। হাতা দিয়ে ভাত ট্রান্সফার করা হল ডেকচিতে। তার পর আবার জনতার ওপর। পুরো ফ্যানাভাত হয়ে গেছে। কোনও ধোঁয়া উঠছে না। ভাত গলে গলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ডেকচির দিকে তাকিয়ে আনন্দশেখর বললেন, "বুঝলে— এক্সপেরিমেন্টটা ঠিক হয়নি ঠিকমতো অ্যাপারেটাস নেই বলে। খিদের মুখে গলা ভাতই ভাল লাগবে ডিম সেদ্ধ আর বেগুন ভাজা দিয়ে। বুঝলে, রান্নাবান্নাটা মেয়েদের ব্যাপার। ওটা ওদের জীনে আছে। লাখ লাখ বছরের ইনস্টিংক্ট— ওরাই জানে কী করে রান্না করতে হয়। রান্না করাটা একটা আর্টের ব্যাপার। এর মধ্যে সায়েন্স না ঢোকালেই ভাল।"

পরের দিন ভোরে সবাই উঠে শিমুলতলা দেখতে বের হল। নন্দকিশোরের দোকানে ব্রেকফাস্ট খেয়ে অশ্রু আর বারীন সকালের ট্রেনেই ফিরে গেল কাজে। দুপুরে ফিরে আনন্দশেখর একটু বিশ্রাম নিলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে বাবাকে তুলে দিয়ে ঘরে ফিরে আসে অনি।

অনেকদিন পরে মাঝের উঠোনে হারিকেন জ্বালিয়ে লুডো খেলা চলছে কাকাবাবু, সানু ও কাকিমা। অনিকে দেখেই চিৎকার করে ওঠেন কাকাবাবু, "তোমার বাবা ও বন্ধুরা ছিল বলে সকালে বিরক্ত করিনি। তোমার বারীন বন্ধুটা কিন্তু সুবিধের নয়। আমি রাগের মাথায় তোমার বাবাকে বলে দিয়েছি যে ও মদ খায়। যা হোক, আমাদের একজন লোক দরকার। বসে পড়ো খেলতে।"

আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সানু জোরে জোরে হাসছে আর মজার কথা বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত খেলা চলল। কাকিমা জোরজার করে খাইয়ে দিলেন অনিকে।

মাঝে একদিন অনির প্রফেসর সুবীরবাবু কলকাতা থেকে শিমুলতলায় এলেন অনির কাজকর্ম দেখতে। খুব খুশি তিনি। এর পর যাবেন যশিডি ও দেওঘরে অশ্রু ও বারীনের কাছে। দুর্গাপুজো হয়ে গেছে। শিমুলতলায় এখন অনেক টুরিস্ট

কলকাতা থেকে— হাওয়া পরিবর্তনে। সকালে বিকেলে ওরা হাঁটে। রঙিন সোয়েটার আর শাল জড়িয়ে। অনিকে নিয়ে কৌতূহল অনেকের। ছোটজায়গা শিমুলতলা। কোথাও-না-কোথাও অনির সঙ্গে দেখা হয়। পাথর ভেঙে কী খুঁজছে ছেলেটা? সোনারুপো না হীরা মানিক? সদ্য যুবতীরা ফিসফিস করে অনিকে নিয়ে। অনি অকারণে বেশি করে মনোযোগ দেয় পাথরের ইতিকথা বুঝতে। না দেখার ভান করে কলকাতার শৌখিন মেয়েদের কৌতূহল বাড়াবার জন্য।

একদিন ভোরবেলা অনি ফিল্ডে যাবার জন্য প্রস্তুত। কাকাবাবু এসে বললেন, "গুড মর্নিং। শোনো অনি, কালকে আমরা ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়। তোমায় মিস করব খুব। ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই দেখা করবে আমাদের বাড়িতে। শোনো, আজকে অনেকে মিলে আমরা পিকনিক করছি নীলাবরণ ঝরনার কাছে। তুমি বিকেল চারটের মধ্যে চলে এসো। তার আগে খাওয়াদাওয়া শুরু হবে না মনে হয়। পিকনিকে এলে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে। কলকাতা থেকে অনেক লোক বেড়াতে এসেছে। সবাই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। আলাপ হলে ভালই লাগবে।"

সানু বলে উঠল, "অনি, চলে এসো প্লিজ। তুমি সব পাথর চিনিয়ে দেবে নীলাবরণের ঝরনার। খুব মজা হবে।"

দুপুর দুপুর কাজ থেকে বাড়ি ফিরল অনি। স্নান করে পরিষ্কার জামা কাপড় পরে রওনা দিল নীলাবরণের দিকে। মাইলখানেক দূর। শহর ছাড়িয়ে উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে। নীলাবরণ ঝরনার প্রতিটি পাথরের টিলা মুখস্থ অনির। ওখানে বহু ছবি তুলেছে কাজের। স্কেচ এঁকেছে প্রচুর। বাড়ি থেকে সোজা উত্তর দিকে বড় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এই নীলাবরণ।

নীলাবরণে পৌঁছে দেখে সবাই লাইন করে বসে আছে। রান্নাবান্না হয়ে গেছে। পরিবেশনের জন্য তৈরি। ওকে দেখে সবাই হইচই করে উঠল। সানু চিৎকার করে ওঠে: "পার্ফেক্ট টাইমিং অনি। তোমার জন্য একটা জায়গা রেখেছি। বসে পড়ো।"

খাওয়াদাওয়া ভাল হল। হইচই চিৎকার। নানাধরনের খাবার। পিকনিকের মজাই আলাদা। শেষ হল নন্দকিশোরের দই আর ল্যাংচা দিয়ে। শেষে মিষ্টি পান। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে সানু বলে, "অ্যাই জিওলজিস্ট, আমাকে একটু পাথরের গল্প করো-না। বুঝিয়ে দাও-না সহজ করে পাথরগুলো কী করে এখানে এলো— কত এদের বয়স। আমার চোখে তো সবই এক লাগে। কী করো ওই পাথর দিয়ে— আমায় বুঝিয়ে দাও।"

একটা হালকা ধানী রঙের শাড়ি পরেছে সানু। পায়ে কালো চটি। কানে ছোট দুল। একটা ছোট টিপ। অনি তাকিয়ে থাকে সানুর দিকে। "ছাত্রী পেয়েছি যখন বুঝিয়ে দিচ্ছি পাথরের মর্মকথা।"

ভাল শ্রোতা পেয়ে সানুকে নিয়ে অনি ঝরনার কাছে যায়। সাবধানে হাত ধরে নামায়। ছোট ঝরনা তিরতির করে গ্রানিটের পাথরের মধ্য দিয়ে নেমে চলেছে। নীচে ছোট্ট একটা ডোবা, স্বচ্ছ পরিষ্কার জল। অনি সানুকে বোঝায়: গ্রানিট হচ্ছে মহাদেশের পাথর— যেমন সমুদ্রের পাথর বেসাল্ট। গ্রানিটে সাধারণত তিন-চারটে মিনারেল থাকে। একে বলে কোয়ার্টজ, একে বলে ফেল্ডস্পার, আর কালো কালো চিকচিক করছে— এদের বলে হর্নব্লেন্ড। লক্ষ্য করে দেখো এই গ্রানিটের ফেল্ডস্পারগুলো খুব বড়, সাদা, মা দুগ্‌গার চোখের মতো। এই বিশেষ পাথরের নাম অগেন্ নাইস্। কোটি কোটি বছর আগে এখানকার পুরনো পাথরের মধ্যে লাভা ঢুকে আস্তে আস্তে রূপান্তর ঘটিয়েছে। একটা চকোলেট বারের মধ্যে গরম দুধ ঢেলে দিলে যেমন চকোলেটটা ছোট ছোট খণ্ড হয়ে যায়— তেমনি পুরনো পাথরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে গরম লাভার সংস্পর্শে। সুন্দর সুন্দর ফোল্ড বা পাথরের আলপনা চিনিয়ে দেয় সানুকে।

সানু হাসছে। "জান অনি, আমরা কতদিন এই নীলাবরণে তিনজনে মিলে ঘুরতে ঘুরতে এসেছি, আজ তোমার চোখ দিয়ে এই পাথরের ভেতরটা দেখতে পেলাম। থ্যাঙ্ক ইউ। তোমার সঙ্গে আমিও কোটি কোটি বছর আগে চলে গেছি— লাভার লীলাখেলা দেখছি। গ্রানিটের আলপনা বুঝছি। থ্যাঙ্ক ইউ জিওলজিস্ট।"

হঠাৎ অনির চোখে পড়ে জলের মধ্যে একটা লালস্কার্ট-পরা কিশোরী, হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। রাজস্থানী ঘাঘরা— কালো সুতো দিয়ে সূক্ষ্ম কাজ— চারিদিকে ছোট ছোট আয়না বসানো। রুপোর ঝুমকো কানে। সানু বলে, "মেয়েটা কী মিষ্টি দেখতে। কত গান গাইল তোমার আসার আগে। কী গো জিওলজিস্ট, আলাপ করবে নাকি? আমরা তো চললাম। তোমায় খুব মিস করব অনি। এসো— সর্বাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। গোখেল স্কুলে পড়ে। ভীষণ স্মার্ট। সারাদিন কাজের পরে ওর গান শুনবে। আমি দূরে বসে তোমার কথা ভাবব।" সানুর হাত ধরে অনি জলের ভেতর নেমে এল। ছোট ছোট মাছ— সর্বাণী খুব চেষ্টা করছে মাছ ধরতে। অনির দেখে হাসি পেল। অনি বলে ওঠে—

"খালি হাতে কেউ মাছ ধরতে পারে না। তার চেয়ে তুমি আমাদের একটু গান শোনাও।"

অনির কথা শুনে সর্বাণী তাকায় ওর দিকে। "চেষ্টা করতে দোষ কী?"

কী সুন্দর চোখ দুটো— গভীর কালো স্বপ্ন জড়ানো। আঁট করে চুল বাঁধা। হাসি হাসি মুখ।

"একটা গান শোনাও-না।"

"আমাদের বাড়িতে যদি আসো, অনেক গান শোনাব" এই বলে ছুটতে ছুটতে হরিণের মতো পাহাড়ে উঠে কোথায় মিলে গেল।

“মেয়েটা কী দস্যি। কেমন তরতর করে পাহাড়ে উঠে গেল। ভয়ডর নেই। আমার তো হাঁটু খুলে যাবে ওরকম ভাবে উঠতে।”

আস্তে আস্তে অনি আর সানু ফিরে যায় পিকনিকের জায়গায়। সর্বাণী কিছু ছেলের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিচ্ছে। কে আগে পৌঁছতে পারে। সবাই যে যার বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি। গোধূলির আলো নেমেছে শিমুলতলার বুকে। জিনিসপত্র গুছিয়ে সব রওনা দেয়। কারও হাতে বাসনকোসন, কারও হাতে খাবার, বসার চাদর। অনি আস্তে আস্তে হাঁটছে কাকাবাবু, কাকিমা ও সানুর সঙ্গে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় সর্বাণী। ছোট ছোট দল, একই পথে হেঁটে চলেছে শিমুলতলার শহরের দিকে। আস্তে আস্তে লালকুঠি পৌঁছোয়। অনি সর্বাণীকে বলে, “এই বাড়ির পেছন দিকটায় আমি থাকি।”

“খুব সুন্দর তোমাদের বাড়িটা। কত ফুল ফুটে আছে।” সর্বাণী বলে। অনি বলে, “এসোই-না ভেতরে— অনেক ফুল তুলে দেব।”

গেট খুলে সবাই ঢোকে। সানু আর সর্বাণী দাঁড়িয়ে। কাকাবাবু কাকিমা ভেতরে ঢুকে গেছেন। অনি আর সর্বাণী দাঁড়িয়ে। অনি পকেট থেকে সুইস নাইফটা বের করে দুটো গোলাপ কেটে নিয়ে আসে। একটা দেয় সর্বাণীকে, একটা সানুকে। সানু চুলের মধ্যে গুঁজে রাখে গোলাপটা।

“অনি, রাত হচ্ছে, তুমি সর্বাণীকে পৌঁছে দিয়ে এসো। ও যাদের সঙ্গে এসেছিল, ওদের পাড়াপড়শি, ওরা এগিয়ে গেছে।”

“চলো, সর্বাণী তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই।” বলে ওরা দুজনে হাঁটতে থাকে।

“সানুদি তোমার কেউ হয়? না এখানে আলাপ?”

“এখানেই আলাপ। কালকে ওরা কলকাতা ফিরে যাচ্ছে। এক সপ্তাহ পরে ওর বিয়ে।”

ওরা দুজনে হাঁটতে থাকে।

“খুব সুন্দর দেখতে সানুদিকে— তাই না?”

“তুমিও তো খুব সুন্দর”—অনি বলে।

“সারাদিনটা খুব মজা হল। আমরা তো সেই দুপুর বারোটা থেকে হইচই করছি। তুমি এত দেরি করে এলে কেন?”

“জান না, সারাদিন আমার কাজ ছিল।”

“কী কাজ করো তুমি? এখানে তো কোনও অফিস নেই।”

অনি বলে, “আমি পাথর ভাঙি। এই যে পাহাড়গুলো দেখছ কোটি কোটি বছর আগে হয়েছিল। আমি ওদের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছি।”

“এইজন্য সানুদি তোমায় জিওলজিস্ট ডাকে?”

“সে তুমিও ডাকতে পারো।”

"আমায় এই পাহাড়ে নিয়ে যাবে? আমি তোমার সঙ্গে ঘুরতে পারি।"

"নিশ্চয়ই।"

আস্তে আস্তে স্টেশনের কাছে পৌঁছে যায়।

"তোমার বাড়িতে কে কে আছে সর্বাণী? কাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছ এই শিমুলতলায়?"

"মা, মাসি, মামা আর কাজল বলে আমাদের একটা কাজের লোক। মামা এর মধ্যেই কলকাতা ফিরে গেছেন। আমরা এখন চারজন মেয়ে বাড়িতে।"

"তোমার বাবা?"

"আমার বাবা নেই। বাবাকে মনে নেই ঠিকমতো। আমার জন্মের পরই বাবা মারা যান অ্যাক্সিডেন্টে। মা আর মাসি দুজনেই টেলিফোন ভবনে কাজ করে। আমি, মা, আর কাজল ভবানীপুরের রূপনারায়ণ নন্দন লেনে একটা দোতলা ফ্ল্যাটে থাকি। গোখেল স্কুল কাছেই। হেঁটে চলে যাই। মা সকাল সকাল অফিসে চলে যায়। কাজলকে নিয়েই আমি থাকি। ও আমার বন্ধুর মতো।"

অনি তাকায় সর্বাণীর দিকে। কী সুন্দর গুছিয়ে বলে কথা। কথাগুলো স্পষ্ট। যেন রেডিয়োতে কেউ খবর পড়ছে। কোনও জড়তা নেই। কী সপ্রতিভ, প্রাণবন্ত মেয়েটা।

"সানু বলছিল তুমি নাকি দারুণ গান করো। কোথায় গান শেখ?"

"গীতবিতানে গান শিখি— হাজরার মোড়ে ইন্দ্ররায় রোডের কাছে।"

"ঠিক ওখানেই আমার এক বন্ধু থাকে প্রশান্ত। খুব ভাল গান গায়। প্রশান্তর কাছে গেলে গীতবিতানে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

"নিশ্চয়ই। কেন, আমাদের বাড়িতে আসবে না?"

ওরা গল্প করতে করতে বাড়ি এসে গেল। সর্বাণী বলে, "সামনের একতলা সাদা বাড়িতে আমরা থাকি। ভেতরে চলো। মা আর মাসির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

"আজ নয়। কালকে আমার ভোরেই কাজ। এমনিতেই পিকনিকে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া কাকাবাবুরা কাল ভোরেই চলে যাবেন।"

দরজার সামনেই সর্বাণীর মা ও মাসি দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনি নিজের পরিচয় দিয়ে বিদায় নিল।

"পৌঁছে দিলেম আপনার মেয়েকে। খাওয়াটা পাওনা রইল।"

লালকুঠিতে ফিরে অনি কাজ নিয়ে বসে পড়ে। রাতে খাবারের পাট নেই। পিকনিকের খাবারে পেট ভর্তি। সানুরা নিশ্চয়ই জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। কাল ভোরেই ট্রেন। ফিল্ডে যাবার আগে নিশ্চয়ই দেখা করে যাবে। এতদিনে অনি ওদের অনেক কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিল। আবার কলকাতার ভিড়ে কোথায় হারিয়ে যাবে। হয়তো কোনওদিনই দেখা হবে না সানুর সঙ্গে।

ভোরবেলা অনি ফিল্ডে যাবার জন্য তৈরি। কাকিমা-কাকাবাবুকে প্রণাম করে অনি। কাকিমা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে। সানু বলে, "চলো তোমার পাথরগুলো একবার শেষবারের মতো দেখে আসি। আমার সাদা পেইন্টের চাকতিগুলো রইল তোমার পাথরের গায়ে। শিমুলতলার দিনগুলো চিরদিন মনে থাকবে। আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করে গেলাম অনি। জানি কাজ ছেড়ে কোনওদিন আসতে পারবে না। সত্যি বলছি অনি। তুমি যেন আমার কতকালের চেনা— কত আপনজন।"

সানুর টসটস করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। অনিরও দুঃখ হচ্ছিল খুব। মনে জোর করে বলে, "কিছু ভেবো না সানু। কোথাও-না-কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বিয়েতে অনেক শুভেচ্ছা রইল। সুখী হও, স্বামী-সোহাগিনী হও।"

* * *

বেশ-কিছু দিন হল সানুরা চলে গেছে। লালকুঠি আবার নিস্তব্ধ ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে। আশেপাশে কেউ নেই। সন্ধেবেলা ফিরে স্নান করে অনি কাজ করতে বসে। শিউপ্রসাদ সকালবেলায় রান্না করে যায়। রাতের খাবার বাইরের বারান্দায় তাকে ঢাকা দিয়ে রাখে। সেই ঠান্ডা খাবার অনি খায় সন্ধেবেলা। কাজ প্রায় শেষ হবার মুখে। সানুর এর মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে। চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল মেয়েটা। স্মৃতিটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই কোনওদিন অনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না। সানু যেন খুব সুখী হয় মনে মনে ভাবে।

হঠাৎ একদিন শিমুলতলার বাজারে দেখা হল সর্বাণীর সঙ্গে। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। কাজের লোকটার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেছে। কোনও কারণে অ্যালার্মটা বাজেনি। অনি সাধারণত খুব ভোরে ওঠে। তাড়াতাড়ি বাজারে ছুটল। হাতের কাছে যা পেল একটা ফুলকপি, আলু, শাকসবজি, একটু মাছ, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা। হঠাৎ দেখে পাশেই সর্বাণী মা-মাসির সঙ্গে বাজার করছে।

"মা, এই সেই জিওলজিস্ট। নীলাবরণের পিকনিকে দেখা হয়েছিল। সেদিন কিছুতেই আমাদের বাড়িতে এল না কাজ আছে বলে।"

মা বলেন, "সর্বাণী তোমার কথা খুব বলছিল। আজ সন্ধেবেলা কাজের পরে আমাদের বাড়িতে চলে এসো। আমাদের ওখানে খাবে। তার পর গান হবে।" অনি রাজি হয়ে গেল। পরের দিন অশ্রু আর বারীনের আসার কথা। কাজ নিয়ে ওরা ব্যস্ত থাকবে।

"নিশ্চয়ই আসব সন্ধেবেলা, তখন দেখা হবে।" বলে অনি বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল।

সারাদিন কাজ করে অনি সন্ধেবেলা সর্বাণীদের বাড়ি গেল। যাবার সময়

নন্দকিশোরের দোকান থেকে কিছু ল্যাংচা কিনে নিয়ে গেল। সর্বাণী বাইরে ছিল বারান্দায়। অনিকে দেখে এগিয়ে যায়।

অনি বাড়ির ভেতর ঢোকে। আলাপ হল সর্বাণীর মা ও মাসির সঙ্গে। মা'র নাম পূর্ণিমা, মাসির নাম গৌরী। এ ছাড়া অল্পবয়সি কাজের মেয়ে কাজল। খুব চটপটে।

পূর্ণিমা রান্নাঘরে চলে গেলেন। হারিকেনের আলোয় সর্বাণীকে দেখতে খুব ভাল লাগছে। গৌরী অনিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির সব কথা জিজ্ঞেস করছেন। কোথায় বাড়ি, ভাইবোন ক'জন, বাবা কী করেন ইত্যাদি। পূর্ণিমা ও গৌরী ডালহৌসি পাড়ায় টেলিফোন ভবনে কাজ করেন। দুজনেই ম্যাট্রিক পাস করে চাকরিতে ঢুকেছেন বহু বছর হল। পূর্ব বাংলার জমিজমা বাড়িঘর সব হারিয়ে হাজার হাজার শরণার্থীদের মতো ওঁরাও কলকাতা এসেছিলেন নতুন জীবন শুরু করার জন্য। ছোট ছোট ভাইবোন, বাবা মা— সবাইকে নিয়ে ওঠেন শ্রীরামপুরে একটা চালাঘরে। অনি কলোনির কথা ভাবে। গৌরীর বাবা ফরিদপুরের নামকরা কবিরাজ ছিলেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত। সর্বহারা হয়ে শ্রীরামপুরে উঠেছেন। খুব অল্পবয়সে পূর্ণিমা আর গৌরী টেলিফোন ভবনে ঢুকেছেন সংসারের হাল ধরতে। ভাইবোনেরা এখনও স্কুল কলেজে পড়ে। কী সর্বনাশা এই পার্টিশন। ধর্মের নামে বাংলা চিরকালের জন্য দু'ভাগ হয়ে গেল। সর্বহারা হয়ে গেল লাখ লাখ লোক। নতুন করে সংগ্রামী জীবন শুরু করে নতুন পরিবেশে।

গৌরী বলেন, "জানো অনি, আমার দিদি আমাদের সবাইকে আগলে রেখেছে। ওর নিজের জীবনটা সুখের নয়। একমাত্র মেয়ে সর্বাণীকে নিয়েই ওর স্বপ্ন। অফিস আর মেয়েকে নিয়েই সময় কাটায়। টেলিফোন ভবনের সুপারভাইজার। অনেক দায়িত্ব। ভবানীপুরে মেয়েকে নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। ছুটি হলেই সর্বাণীকে নিয়ে চলে আসে শ্রীরামপুরে। মামা মাসির কাছে যত আবদার সর্বাণীর। এইখানে সবার মাঝে হইহই করে ছুটির দিনে তরতর করে গাছে ওঠে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুকুরে সাঁতার কাটে। অন্যদিনগুলো আবার রুটিনমাফিক— গোখেল স্কুল, গীতবিতান, ফাঁকা বাড়ি, বারান্দার ব্যালকনি দিয়ে রাস্তার লোকজন দেখে— অপেক্ষা করে মা কখন ফিরবে অফিস থেকে সন্ধেবেলা। তার পর রান্নাবান্না করবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে পড়াশুনার কথা। শুনতে চাইবে গান। মা-মেয়ের সংসার এইভাবেই কাটে। ভাগ্যিস কাজল আছে ওদের মাঝে। কাজল দোকান বাজার করে। সঙ্গ দেয় সর্বাণীকে ফাঁকা বাড়িতে। দিদি স্বপ্ন দেখে সর্বাণীকে নিয়ে।"

এর মধ্যে গরম গরম চা আর সরু নিমকি নিয়ে ঢুকলেন পূর্ণিমা। সবাই গোল হয়ে খাটে বসে। পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে অনি ভাবছে— এ যেন ঋত্বিক ঘটকের কোন এক সিনেমার চরিত্র। "সর্বাণী, এবার তোমার গান গাইবার পালা"— গৌরী

বলে ওঠেন। খালি গলায় একটার পর একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইল সর্বাণী। অপূর্ব গলা। উদাত্ত কণ্ঠস্বর, মনে হচ্ছে যেন সুচিত্রা মিত্রের গান শুনছে, কাছে বসে। অনি গানবাজনার বাড়িতে বড় হয়েছে। কিন্তু এত সুন্দর গান কখনও শোনেনি। হঠাৎ সর্বাণী বলে উঠল—"গৌরী মাসি এবার তোমার কবিতার পালা। জান, আমার এই মাসি— টেলিফোন ভবনে নাটক আর মিছিল করে খুব পপুলার। ডালহৌসি পাড়ায় লালঝান্ডা নিয়ে আমার এই মাসিকে দেখতে পাবে—'আমাদের দাবি মানতে হবে'।"— সর্বাণী বলে। সবাই হেসে ওঠে।

গৌরী 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' আবৃত্তি করলেন। এবার পালা অনির। অনি সম্প্রতি দ্বিজেন মুখার্জির কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখছিল। অনি কোনওমতে একটা গান গাইল: 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে।' এর পর খাওয়াদাওয়া হল। তার পর একটা জমজমাটি ভূতের গল্প বলে অনি বিদায় নিল। পূর্ণিমা আর গৌরী মনে করিয়ে দিলেন, "তোমার বন্ধুদের নিয়ে কাল রাতে চলে এসো— এ বাড়িতে তোমাদের নেমন্তন্ন রইল— তিন জিওলজিস্টের।"

পরের দিন বিকেল বিকেল অশ্রু আর বারীন এসে হাজির। অনি ফিল্ড থেকে সবে ফিরেছে। বারীন দেওঘরের বিখ্যাত প্যাঁড়া নিয়ে হাজির। চা খেতে খেতে ম্যাপ নিয়ে বসল সবাই। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল তিন বন্ধুর ছোটনাগপুর গ্রানিটের ইতিবৃত্ত নিয়ে। পর পর ঘটনাগুলো ওরা সাজিয়ে রাখছে। অনি মনে করিয়ে দিল সন্ধে হয়ে গেছে। এবার সর্বাণীদের বাড়ি যেতে হবে— রাতের নেমন্তন্ন। ঠিক হল বারীন প্যাঁড়া নিয়ে যাবে— অনি নিয়ে যাবে নন্দকিশোরের ল্যাংচা সর্বাণীদের বাড়িতে। কিছু আতা এনেছে অশ্রু পাহাড়কুঠি থেকে। এসব দিয়েই মিষ্টিমুখ হয়ে যাবে।

শিমুলতলার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই তিন বন্ধু পৌঁছল সর্বাণীদের বাড়িতে। অনি সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অশ্রু আর বারীনকে। অনি পথেই বলে রেখেছিল সর্বাণীর গানের কথা। চা পর্ব শেষ হলেই বারীন সর্বাণীকে গান গাইতে বলল। পরপর গান গাইল সর্বাণী। কারও মুখে কোনও কথা নেই। সবাই অভিভূত। অশ্রু শোনাল জীবনানন্দ দাশের কবিতা। বেশ ভাল আবৃত্তি করে অশ্রু। অনি ও বারীন গাইল গান। প্রচুর রান্না করেছিল গৌরী আর পূর্ণিমা। তিন বন্ধু খুব জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করল। বারীন মজার মজার গল্প করছিল। খাবার পর বারীনই বলে উঠল, "পূর্ণিমাদি, সামনের রোববার ভোর-ভোর আপনারা অনির সঙ্গে চলে আসুন দেওঘরে। সামনে ত্রিকূট পাহাড়। সবাই মিলে পিকনিক করা যাবে। পাহাড়ের পথঘাট আমার চেনা। খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে, দারুণ মজা হবে।"

ঠিক হল পূর্ণিমা আর গৌরী টিফিন ক্যারিয়ারে করে লুচি আর মাংস নিয়ে যাবে। অনি নেবে শিমুলতলার ল্যাংচা— বারীন নেবে দেওঘরের প্যাঁড়া। অশ্রু

আনবে পাহাড়কুঠি থেকে পাকা আতা ফল। পিকনিকের মেনু তৈরি।

দেখতে দেখতে রোববার এসে গেল। কথা ছিল স্টেশনে ছ'টার আগেই সবাই পৌঁছে যাবে। অনি পৌঁছে দেখে কেউ নেই। ভোরবেলা। প্ল্যাটফর্ম শুনশান। ট্রেন আসার সময় হয়ে গেল। হঠাৎ সর্বাণী ছুটতে ছুটতে হাজির। বলল, 'মা আর মাসি এক্ষুনি আসছে। রান্না করতে করতে দেরি হয়ে গেল।" এর মধ্যে হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন আসছে। অনি ঠিক করে ফেলল, দুপুরের ট্রেনেই যাবে। ট্রেন থামতেই সর্বাণী সোজা ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বলল, "আমার মা আর মাসি ছুটে ছুটে আসছে। আমরা যশিডি যাব। প্লিজ একটু দাঁড়াবেন।" সর্বাণীর কথা শুনে ড্রাইভার হেসে বলল, "কোনও চিন্তা নেই। তোমার মা-মাসির জন্য মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে পারি।" অনি সর্বাণীর স্মার্টনেস দেখে আশ্চর্য। এরকম মিষ্টি করে কেউ যে ট্রেন থামিয়ে রাখতে পারে ওর ধারণা ছিল না। এর মধ্যে পূর্ণিমা, গৌরী ও কাজল এসে হাজির। ওরা সবাই হাঁপাচ্ছে। সবাই মিলে প্রথম কামরায় উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

যশিডিতে অশ্রু ওদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ট্রেন থেকে নেমে ওরা ছোট ট্রেনে দেওঘরের দিকে সবাই মিলে রওনা দিল। বারীন ছিল দেওঘর স্টেশনে। সবাই মিলে খাবারদাবার নিয়ে একটা বড় টাঙ্গা করে ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে রওনা দিল। গ্রানিটের বিরাট পাহাড় আকাশ ছুঁয়ে আছে। টাঙ্গা থেকে নেমে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে সবাই ওপরে রওনা দিল। পাহাড়ের মাঝ বরাবর শিবমন্দিরের কাছেই একটা সুন্দর পিকনিক স্পট। চাদর বিছানো হল। পূর্ণিমা, গৌরী ও কাজল খাবারদাবার তৈরি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। অনি, সর্বাণী, বারীন ও অশ্রু ঠিক করল এর মধ্যে পাহাড়ের চুড়োয় ঘুরে আসবে। তিন বন্ধুর হাতে ক্যামেরা। সর্বাণী গান গাইতে গাইতে সবার আগে উঠছে। "আমার সোনার হরিণ চাই।" পাথর ছেড়ে সবাই সর্বাণীর ছবি তুলছে। পথে পথে আমলকী ছড়ানো। ওরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে পকেট ভর্তি করছে।

ঘণ্টাখানেক পরে ওরা পাহাড় থেকে নেমে দেখে রান্নাবান্না তৈরি করে রেখেছেন পূর্ণিমা আর গৌরী। খুব হইচই করে পিকনিক হল। তার পর গান, আবৃত্তি ও গল্প। পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে গেছে। ওরা পাহাড় থেকে নেমে দেখে টাঙ্গাওয়ালা অপেক্ষা করছে। ওরা স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। সর্বাণী উদাত্ত গলায় গাইছে—"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া—" সঙ্গে গলা দিয়েছে অনি ও বারীন। যে পথ দিয়ে ভোরে সবাই এসেছিল— সেই পথ দিয়ে ফিরল সবাই শিমুলতলায়। রাত তখন দশটা। সর্বাণীদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অনি যখন লালকুঠিতে পৌঁছল শিমুলতলার সবাই তখন ঘুমে।

* * *

অনির পাথরের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। কিছু ছবি তোলা বাকি। কিছু পাথরের স্কেচ। অনি সর্বাণীকে নিয়ে ফিল্ডে যায় ছবি তোলার জন্য। সন্ধেবেলা নেমন্তন্ন থাকে সর্বাণীদের বাড়িতে। এবার বাড়ি ফেরার পালা। একসপ্তাহের মধ্যে সবাই কলকাতা ফিরে যাবে। ঠিক হল একই ট্রেনে সবাই ফিরবে শিমুলতলা থেকে। রাতের ট্রেন। দুপুর দুপুর অশ্রু আর বারীন সব গোছগাছ করে শিমুলতলা পৌঁছে গেছে। বারীনই সবার জন্য একই কামরায় পরপর স্লিপার রিজার্ভ করে রাখল।

কলকাতা ফিরে যাবার ঠিক আগের দিন অনি সর্বাণীকে নিয়ে গেল লাট্টু পাহাড়ের কোলে নলডাঙার রাজবাড়িতে। ভাবছে এ পাহাড়ে কত সময় কেটেছে ফোল্ডের কোরকটা খুঁজে পেতে। লাট্টু পাহাড়ের কিছু ছবি তুলতে হবে। সর্বাণী আজ ফিল্ড অ্যাসিস্টেন্ট। অনি পরিত্যক্ত রাজবাড়িটা ঘুরে দেখায় সর্বাণীকে। অনেক লোক দেখতে এসেছে রাজবাড়িটা— কলকাতার টুরিস্ট। রাজবাড়ির চারপাশে সার সার দেবদারু গাছ। একসময় কতই না জমজমাট ছিল রাজবাড়ি। আজ কেউ নেই দেখাশোনা করার। সব ভেঙেচুরে গেছে। অনি সর্বাণীর হাত ধরে হাঁটে। দেয়ালে কারুকার্য দেখায়। ওরা সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসে। শীতের আমেজ। একটু দূরেই একটা দেবদারু গাছের নীচে দাঁড়ায়। সর্বাণীকে দু'চোখ দিয়ে দেখে। ক্যামেরায় ছবি তোলে সর্বাণীর। একটা হলুদ স্কার্টে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে সর্বাণীকে। কী গভীর কালো চোখ।

"কী দেখছ অনিদা।"

"তোমাকে দেখছি। কী সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তটা ধরে রাখতে।"

অনি হঠাৎ পকেট থেকে সুইস নাইফটা বের করে দেবদারু গাছের ওপর লিখে রাখে— 'অনি + সর্বাণী— .

সর্বাণীর দিকে তাকিয়ে বলে 'বহু বছর পরে হঠাৎ যদি কোনওদিন এখানে আস বেড়াতে, হঠাৎ এই গাছে আমার নাম দেখে মনে পড়বে শিমুলতলার এক জিওলজিস্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ১৯৬৩ সালে। তখন তুমি হয়তো গিন্নিবান্নি হয়ে গেছ। হয়তো তিন-চারটে বাচ্চা, বিরাট গোঁফওয়ালা তাগড়াই স্বামী। এই গাছ দেখে কৈশোরের এই ছোট্ট ঘটনা মনে পড়বে। কোথায় হারিয়ে গেল অনিদা। কী হল অনিদার। কত লোকই তো আসে যায়। তোমায় নিয়ে একদিন এই রাজবাড়িতে এসেছিলাম তার সাক্ষ্য হয়ে রইল।"

গুনগুন করে গান ধরে অনি—'এই কথাটি মনে রেখো।'

সর্বাণী চোখ বড় বড় করে বলে, "ইস, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করলেই কি হারিয়ে যাওয়া যায়? আমি তোমায় কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেব না।"

"সত্যি বলছ, সর্বাণী।"

"সত্যি, সত্যি, সত্যি।"

সূর্য অস্ত গেছে। চারিদিকে গোধূলির কনে-দেখা-আলোতে সর্বাণীকে দেখছে অনি। কী সুন্দরই দেখতে। শেষ সূর্যের আলো সর্বাণীর মুখে। অনি একটার পর একটা ছবি তুলছে সর্বাণীর।

পাখিরা সব বাড়ি ফিরছে। বিরাট পাখির ঝাঁক মাথার ওপরে। অনি সর্বাণীর হাত ধরে অন্ধকারে শিমুলতলার মেঠো পথে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে—

"আকাশে উড়িছে বকপাঁতি,
বেদনা আমার তারি সাথি।"

সর্বাণীকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

"অনি, একটু চা খেয়ে যাও।" গৌরী বলে।

"অনেক কাজ আছে। সব-কিছু গোছাতে হবে। আপনারা সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখুন। দুপুরে তো আমরা সবাই আসছি লাঞ্চে। সন্ধেবেলা ট্রেন। এবার যেন স্টেশনে আসতে দেরি না হয়।"

সর্বাণীর কথা ভাবতে ভাবতে অনি লালকুঠিতে ফিরল। একটা বড় কাঠের বাক্সে পাথরগুলো প্যাকিং করে সব গুছিয়ে রাখল। যাতে ট্রেনের ঝাঁকানিতে পাথরগুলো ভেঙে না যায়। থেকে থেকেই সর্বাণীর কথা মনে পড়ছে। আকাশটা অন্ধকার হয়ে আছে। সামনে লালকুঠির বড় বাড়ি চুপচাপ। হাওয়ায় হারিকেনের আলোটা দপদপ করছে।

হঠাৎ সানুর কথা শুনতে পেল। মনে হল যেন লাল বেনারসী পরে চুপিচুপি কাছে এসে বলছে, "কী জিওলজিস্ট পছন্দ হয়েছে সর্বাণীকে?"

সারা শরীর শিরশির করে উঠল। নিশ্চয়ই মনের ভুল। অনি চারিদিক তাকিয়ে দেখে। কেউ কোথাও নেই।

অনির মনে হল সর্বাণীর সঙ্গে ও সারাজীবনের অঙ্গীকার করে আছে। হঠাৎ মনে হল সানুর সঙ্গে দেখা হলে বলবে, 'ঠিকই বলেছ সানু। সর্বাণীকে আমি সত্যিই ভালবাসি।'

পরের দিন দুপুর দুপুর অশ্রু আর বারীন লালকুঠিতে এসে হাজির। ওরা মালপত্র স্টেশনমাস্টারের জিম্মায় রেখে এসেছে। সবাই মিলে হাত লাগিয়ে অনির জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল। এবার বাড়ি ফেরার পালা। দেখতে দেখতে দুমাস কেটে গেল। শিমুলতলায় এসে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হল। ওরা তিনজনেই রিসার্চের ব্যাপারে খুশি। খুব সুন্দর কাজ দাঁড়িয়ে যাবে। কলকাতায় গিয়ে অনেক কাজ। পাথরগুলো থিন সেকশন করতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখতে হবে কী দিয়ে তৈরি পাথরগুলো। তার পর ছবি তুলতে

হবে, ম্যাপ তৈরি করতে হবে, লিখতে হবে— টাইপ করতে হবে থিসিস। ওরা একটা টাঙ্গা ডেকে অনির জিনিসপত্র স্টেশনে রেখে সর্বাণীদের বাড়ি গেল। অনি মনে মনে ভাবে হয়তো কোনওদিনই আর শিমুলতলায় আসা হবে না। লালকুঠির স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যাবে। তবুও নীলাবরণের ঝরনার নীচে যে লাল ঘাগড়া পরা ছোট্ট মেয়েটাকে দেখেছিল তাকে কোনওদিনই ভুলতে পারবে না।

পূর্ণিমা আর গৌরী অনেক রকমের রান্না করে রেখেছিলেন। সবাই মিলে হইচই করতে করতে খাওয়া হল। সবাই ভাবছে শিমুলতলার স্মৃতি আবছা হয়ে যাবে। কলকাতার ভিড়ে আর কাজের মাঝে। অনি চুপ করে ভাবে কী করে কার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। জীবনের মোড় পাল্টে যায়। এর জন্য কোনও প্রস্তুতি লাগে না। কোনও প্ল্যান থাকে না। সত্যিই তো— কাকাবাবুর আমন্ত্রণে অনি যদি পিকনিকে না যেত— কোনওদিনই সর্বাণীর সঙ্গে দেখা হত না।

সব গোছগাছ করে ওরা সবাই শিমুলতলা স্টেশনে এসে পৌঁছয়। ট্রেন আসার সময় এখনও হয়নি। অনি সর্বাণীকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষে চলে আসে গল্প করতে করতে। জিজ্ঞেস করে, "নীলাবরণের কথা তোমার মনে থাকবে সর্বাণী? যদি কোনওদিন ভুলে যাও সাক্ষী রইল নলডাঙার রাজার বাড়ির ইউক্যালিপটাস গাছটা। তোমার আমার নাম লেখা রইবে বহুকাল। বহুদিন পরে কেউ শিমুলতলায় বেড়াতে এসে ভাববে— অনি আর সর্বাণীর কী হল? ওদের কি আর দেখা হয়েছিল? নাকি কলকাতার লাখ লাখ ভিড়ের মাঝে ওরাও হারিয়ে গেছে?"

সর্বাণী অনিকে বলে—"তুমি আমার শিমুলতলার আবিষ্কার। তুমি একান্ত আমারই। তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জানি কলকাতায় ফিরে কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রতি শনিবার বিকেলে গীতবিতানে এসে নীচে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি ফিরব। এটা সারাজীবনের চুক্তি।"

অনি বলে, "শুধু এইটুকু কাজ। তোমার জন্য আমি রূপসাগরে ডুব দিয়ে মুক্তো নিয়ে আসতে পারি। পাহাড়ের চুড়ো থেকে আনতে পারি চুনি আর পান্না। গভীর জঙ্গল থেকে নিয়ে আসতে পারি অর্কিড। শনিবারের বিকেলে গীতবিতানে দেখা করা তো তুচ্ছ, দেবী!"

সর্বাণী হেসে বলে, "আর কাব্য করতে হবে না। তাড়াতাড়ি চলো। ওরা সব ভাবছে, কী হল আমাদের। ট্রেন এসে গেল। এবার ট্রেন চলে গেলে আর থামাতে পারব না।"

সত্যি হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন আসছে। অনি আর সর্বাণী তাড়াতাড়ি পা চালায়। বারীন সবার জন্য রিজার্ভেশন করে রেখেছিল। ট্রেনে খুব ভিড়ও ছিল না। সবার জন্যই স্লিপার পাওয়া গেছে। জিনিসপত্র তোলা হল। ট্রেন ছেড়ে দিলে বারীন

তাদের ম্যাজিক দেখাল অনেক। অনি একটা ভয়ংকর ভূতের গল্প বলে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিল। আস্তে আস্তে রাত বাড়ে। সবার চোখে ঘুম জড়িয়ে। যে যার বাঙ্কে ঘুমিয়ে পড়ে।

পূর্ণিমা জানলার দিকে মুখ করে বসে আছেন। উলটো দিকে অনি। দু'জনের চোখে ঘুম নেই। ওপরের বাঙ্কে সর্বাণী ঘুমিয়ে। অনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর ভাবছে। ছোট্ট মেয়েটা কী স্বপ্ন দেখছে কে জানে? অনির চেয়ে বেশ ছোট সর্বাণী। বছর আটেক তো হবেই। এখনও স্কুলে পড়ে। ও কি সত্যিই ভালবাসে অনিকে? এখনও কিশোরী সর্বাণী। ছোট্ট ফুলের কুঁড়ি। ফুল ফোটার এখনও সময় হয়নি। ও অপেক্ষা করবে সর্বাণীর জন্য। এর জন্য নিজেকে তৈরি করা দরকার। ওকে বিদেশে যেতেই হবে গবেষণার জন্য, আনন্দশেখর যে সুযোগ পাননি। এর মধ্যে সর্বাণী বড় হয়ে যাবে। ও সর্বাণীকে 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' করবে। সর্বাণীর কথা ভাবতে ভাবতে অনি কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোরবেলা 'চা গরম' আর 'পুরি পুরি' শব্দে সবার ঘুম ভেঙে যায়। আস্তে আস্তে সবাই উঠে পড়ে। গরম গরম চা কচুরি খেয়ে গল্প শুরু হল আবার। সন্ধেবেলা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল সবাই। এক-একজন এক-এক দিকে যাবে। আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরল। অনি বেহালা পৌঁছল রাত করে। ওকে দেখে বাড়ির সবাই হইচই করে ওঠে। সবাই শিমুলতলার গল্প শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনি বাড়ির জন্য এক হাঁড়ি নন্দকিশোরের ল্যাংচা নিয়ে এসেছিল। গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল।

পরের দিন রোববার। দুপুরবেলা অনি মাসতুতো ভাই অভীকের সঙ্গে দেখা করতে যায় বড়বাড়ি, বড়িশায়। দু' বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে অক্সফোর্ড মিশনের মাঠে এসে বসে। অনি অভীককে শিমুলতলার সব গল্প করে, সর্বাণীর কথা বলে। কাব্যি ক'রে বলে, "এতদিন পরে আমি শুধু সহমর্মিণীই পাইনি সহধর্মিণীও পেয়েছি।" অভীক কিছুদিন আগে একটা ভাল চাকরি পেয়েছে। 'দাস অ্যান্ড জিমারম্যান'-এ। সেল্‌স-এর কাজ, প্রায়ই দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজে যেতে হচ্ছে। বম্বে থেকে বিরাট এক চিঠি লিখেছিল অনিকে শিমুলতলায়— অক্টাভিয়া নামে এক গোয়ানিজ মেয়ের প্রেমে পড়েছে। অভীক শুধু অনির মাসতুতো ভাই নয়— অভীক অনির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অভীক শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাল সেতার বাজায়। অনির সব কথা শুনে অভীক বলে— "আমাকে এক্ষুনি সর্বাণীকে দেখা দরকার। চ' একটা ট্যাক্সি করে ঝট করে ঘুরে আসি। তুই কাকে বিয়ে করবি আমার সেটা জানতে হবে। দেখি অক্টাভিয়া না সর্বাণী ভাল।"

একটা ট্যাক্সি ধরে দু' বন্ধু চলল ভবানীপুরে। অনির কাছে সর্বাণীর ঠিকানা ছিল। রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাড়িটা খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। দোতলার

দরজায় কড়া নাড়তে সর্বাণীই দরজা খুলে দেয়। অনিকে দেখে চিৎকার করে ওঠে, "তা হলে, সত্যি আমাদের ভুলে যাওনি!" পূর্ণিমা রান্না করছিলেন। উঠে এলেন। অনি অভীককে পরিচয় করিয়ে দিল। একটাই ঘর। বেশ বড়সড়। ঘরের মাঝেই বিরাট বিছানা পাতা। সাদা ধবধবে বিছানার চাদর। একটা স্টিলের আলমারি, ছোট টেবিলচেয়ার। এখানে বসেই নিশ্চয় সর্বাণী পড়াশুনা করে। ঘরের কোণে একটা তানপুরা। তার পাশে হারমোনিয়াম আর তবলা। একটা ছোট্ট রান্নাঘর। বাইরে ব্যালকনি। সেখান থেকে রাস্তার লোক দেখা যায়। মা-মেয়ের ছোট্ট সংসার। এ ছাড়া কাজের লোক কাজল আছে সারাদিন। স্কুল থেকে ফিরে সর্বাণীকে যাতে একা থাকতে না হয়। কাজলই সঙ্গ দেয় সর্বাণীকে, চোখে চোখে রাখে সব সময়।

অভীক বলে, "অনি আমার ছোটবেলার বন্ধু। জিগরি দোস্ত। ওর মতো ছেলে হয় না।" অনি বলে, "অভীক, তোকে এখানে ওকালতি করার জন্য ডাকিনি।"

অভীক বলে, "পূর্ণিমাদি, একটু গরম গরম চা খাওয়ান। সর্বাণীর গান শুনব বলে এসেছি।"

"প্রথম দিন এলে শুধু চা কি চলে? চা-এর সঙ্গে টাও আসছে। সর্বাণী তোমাদের নিশ্চয়ই গান শোনাবে।" পূর্ণিমা বলেন।

সর্বাণী হারমোনিয়ম নিয়ে খাটের ওপর বসে গান শুরু করল। পরপর গান গেয়ে চলে। অভীক তারিফ করে "বা কী অপূর্ব। এ যে দেবদত্ত গলা। পূর্ণিমাদি, অনি আসুক আর নাই আসুক— আমি কিন্তু সর্বাণীর গান শুনতে প্রায়ই আসব।"

"নিশ্চয়ই আসবে অভীক। সঙ্গে অনিকে ধরে এনো।" অনি বলে, "আমার পরীক্ষা এসে গেছে। রেজাল্ট খারাপ হলে বাবা ঠ্যাঙাবে। তবে আমাকে প্রায়ই ভবানীপুরের এক প্রেসে আসতে হবে সন্ধেবেলা। আমি আমাদের জিওলজি ডিপার্টমেন্টের বাৎসরিক জার্নাল 'বসুধা'র সম্পাদক। লেখাগুলো এখন প্রেসে। প্রুফ দেখা হয়ে গেলে আমি একবার ঘুরে যাব। এ ছাড়া সর্বাণীর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। গীতবিতান থেকে ওকে বাড়ি নিয়ে আসব প্রতি শনিবার।"

অভীক আর অনি ফিরল বেশ রাত করে। অভীক বলল, "অনি, সর্বাণীর সঙ্গে তোর মানাবে ভাল। তুই পড়াশুনা নিয়ে সারাজীবন ব্যস্ত থাকবি। সর্বাণী কল্যাণী ও বুদ্ধিমতী, তোর সংসারের জন্য কিছু ভাবতে হবে না। ওই তোর ঘর সুন্দর করে তুলবে। দু'জনে দু'জনের সম্পূরক, মেড ফর ইচ আদার, কনগ্রাচুলেশন্স— ব্রাদার।"

ক্যাপ্টেন সবাইকে সিট বেল্ট বাঁধতে নির্দেশ দিচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। সন্ধের সময় সব শহরই সুন্দরী আকাশ থেকে। আলোর মালায় সুসজ্জিতা ব্যাঙ্কক। আস্তে আস্তে প্লেনটা রানওয়েতে নামল। জিনিসপত্র নিয়ে ইমিগ্রেশন কাস্টমসের গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে এল অনি। এয়ারপোর্টের গায়েই এই হোটেল। চারতলায় উঠে একটা করিডর দিয়ে যাওয়া যায়। বাইরে বের হবার দরকার নেই। কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের মতো খুব আভিজাত্য এই হোটেলের। সুন্দর ব্যবস্থা। চাবি নিয়ে ঘর খুলল। জানলা দিয়ে ব্যাঙ্ককের রাস্তাঘাট দেখা যাচ্ছে। চারিদিক অর্কিড দিয়ে সাজানো এই হোটেল। কলকাতা এমন কেন সুন্দর হয় না, অনি ভাবে।

সারা রাত ঘুম হয়নি পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। বিছানায় শুয়ে পড়ে অনি। মিনিট পনেরো হয়তো ঘুমিয়েছিল। গভীর ঘুম। স্বপ্ন দেখছে ইন্দ্রকে। কার্লসবাদ ক্যাভার্ন থেকে ফিরছে ওরা গান গাইতে গাইতে। হঠাৎ ইন্দ্র বলে ওঠে— 'দাদা, তুই আমাদের বাড়ির ইতিহাস লিখে ফ্যাল। সবই তো হারিয়ে যায়। প্লিজ, লেখ দাদা। তোর ওপর দায়িত্ব দিলাম।'

ধড়ফড় করে অনি উঠে বসে। কী স্পষ্টই ইন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছিল স্বপ্নের ঘোরে। কোথায় ইন্দ্র মিলিয়ে গেল। উঠে বসে অনি। হাতঘড়িতে দেখে আটটা বেজে গেছে। মানুষের কী মন অনি ভাবে। ইন্দ্রর কথা ভাবতে গিয়ে নিজের কথা ভাবছে সারাদিন ধরে। ও যখন কলেজে পড়ে, ইন্দ্র তখনও ছোট— স্কুলের শেষের দিকে। গানবাজনায় ইন্দ্রর খুব নামডাক। কিন্তু ইন্দ্রর প্রতিভা খোলে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়। বেশ-কিছু বছর পরে।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল অনি। এতটা পথের ধকল, চিন্তা, ভাবনা, দুঃখ। ইন্দ্রর ওপর রাগ, অভিমান সব জমে আছে। জীবনের শেষদিকে ইন্দ্র কেমন যেন উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল, অনেকটা ঋত্বিক ঘটকের মতো, যেন খুব তাড়াতাড়ি আত্মহনন করার জন্য মেতে উঠেছিল। একি জীবনে স্বীকৃতি না পাবার জন্য? চারিদিক থেকে একটার পর একটা বাধা, বঞ্চনা। মাঝে মাঝে ফোনে বলত ইন্দ্র— 'দাদা, কলকাতা শহরে আর থাকা যায় না। এখানকার মানুষরা এত নিচু, সবসময় পেছনে ছুরি মারছে।' দলাদলি, নোংরামিতে ইন্দ্র হাঁপিয়ে উঠেছিল শেষদিকে। মদ, গাঁজা খেয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করত। এত দুঃখের মধ্যেও ইন্দ্র হাসত প্রাণ কাঁপিয়ে, হাসাত মজার গল্প দিয়ে। জীবনের গভীর মর্মকথা ওর স্যাটায়ারে, ওর গানে ফুটে উঠত। প্রচণ্ড ফ্রাস্ট্রেশন ছিল ইন্দ্রের শেষদিকে।

হোটেলের ডাইনিং রুমে এল অনি। খুব কম লোক এখন। বিরাট কাচের জানলার পাশে একটা কৃত্রিম ঝরনা দিয়ে অনেক জল পড়ছে। চারিদিকে গাছপালা আর নানারকমের ফুলে ভর্তি। নানা রঙের মাছ বাঁধানো পুলটায়। এদিক-ওদিক

দু'-একটা ব্যাঙ লাফাচ্ছে। লাল আর সবুজ পাখি বসে আছে গাছে গাছে ঝরনার পাশে। বাফে ডিনার। কত রকমের খাবার। অনি প্লেটে খাবার সাজিয়ে বসে। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে। কী অপূর্ব সুন্দর। মনে হচ্ছে যেন কোনও ট্রপিকাল ফরেস্টের মধ্যে বসে আছে। সিলকের ড্রেস পরা এক থাই সুন্দরী টেবিলে একগুচ্ছ অর্কিড আর ইটালিয়ান ওয়াইনের একটা বোতল রেখে বলল, "কমপ্লিমেন্টস ফ্রম দি ম্যানেজার।" অনির রেড ওয়াইন খুব পছন্দ, বিশেষ করে ডিনারের সময়। ওয়াইন খেতে খেতে পুরনো দিনের কথা ভাবছে অনি। প্রবাসী জীবনে পুরনো দিনের কথা ভাবার অবসর হয়নি। শুধু কাজ আর কাজ। এগিয়ে চলো— চরৈবেতি। এই মন্ত্র পাশ্চাত্য জীবনের জয়গান। ওরা বলে, অতীত হারিয়ে গেছে। কোনওদিনই ফিরে আসবে না। পুরনো দিনের কথা ভেবে লাভ কী? আমরা বলি, "রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।" পাশ্চাত্য জীবনে নস্টালজিয়ার স্থান নেই।

১৯৬৪ সাল। কলেজ জীবনের শেষ বছরটা কী হয়েছিল ভাবার চেষ্টা করছে। ভাবছে মঞ্জুবীথির বাড়ির কথা। খুব গমগম করত সেই সময়। দিনরাত লোকজন আসা-যাওয়া করছে। দিদি বি এ পাস করে বসে আছে। অনি দিদিকে আলিয়াস ফ্রাঁসে ভর্তি করে দিয়েছে পার্ক স্ট্রিটে, স্কলারশিপের টাকায়। দিদির তবু সময়টা কাটে। দিদি ওখানে ফ্রেঞ্চ শিখছে, বিদেশি রান্না শিখছে। দিদির বিয়ের জন্য বাবা উঠেপড়ে লেগেছেন। একটার পর একটা সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে। পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ হয় না। খুব অপমান লাগে দিদির। তবু পার্ক স্ট্রিটে বন্ধুবান্ধবদের মাঝে সময় কাটে। ঘর থেকে বের হবার একটা আনন্দ আছে। মাঝে মাঝে ইউ এস আই এস লাইব্রেরিতে যায় কেয়া।

আকাশ গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ পেয়ে আশুতোষ কলেজ ছেড়ে দিল। ও খুব ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ে গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপে। ফেরে রাত করে। হাতের কাজ, যন্ত্রপাতি চিরকালই আকাশের ভাল লাগে। ইচ্ছে ছিল যাদবপুরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। সেটা হল না। একদিক থেকে ভালই হল। আকাশের দিনরাত বই পড়তে ভাল লাগে না। গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং। জাহাজের ইঞ্জিনগুলো কী করে সচল রাখতে হয় শিখছে। চার বছর পরে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়বে দেশ-দেশান্তরে। বন্দরে বন্দরে জাহাজ ভিড়বে। আকাশের খুব রোম্যান্টিক লাগে এইসব কথা ভাবতে। সারা পৃথিবী ঘুরে দেখতে চায় আকাশ। ভালই লাগে গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপে। সন্ধেবেলা পুরনো আড্ডাটা জমে ওঠে। ইন্দ্রের ক্লাসের বন্ধু অসীম এর মধ্যেই ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে নাম করেছে। আকাশ মাঝে মাঝে অসীমের দোকানে যায়, ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি সারাতে সাহায্য করে, রেডিয়ো, ফ্যান, টোস্টার ইত্যাদি। বই পড়ার চেয়ে হাতের কাজ অনেক ভাল লাগে আকাশের।

রোববার দিন বাড়িতে ছোটখাটো জলসা বসে মঞ্জুবীথিতে। একেই বলে পরম্পরা। আনন্দশেখর ভাবেন নিজের যৌবনের কথা। পানিহাটিতে চাকরি করার সময় এরকমভাবে গানের আসর বসত নিজের বাড়িতে। আকাশ আর ইন্দ্রকে দেখে পুরনো দিনের কথা ভাবেন। আকাশ ওস্তাদদের মতো হারমোনিয়াম বাজায়। খুব সুন্দর গলা আকাশের। বেশ-কিছু হিন্দি সিনেমার ক্ল্যাসিকাল গান রপ্ত করেছে, মুকেশ, মহম্মদ রফি আর তালাত মামুদের। তবলায় সংগত দেয় ইন্দ্র। তার পর ইন্দ্রই শুরু করে গান গিটার নিয়ে। আশেপাশের বন্ধুবান্ধব ভিড় করে। সবাইকে মাতিয়ে রাখে ইন্দ্র ওর গান দিয়ে। দুপুরের খাওয়া হয় বেশ দেরি করে— বিকেল বিকেল।

মঞ্জুবীথির দোতলায় এক নতুন ভাড়াটে এল। অনি আশ্চর্য হয়ে দেখে ওর সহপাঠী সমরজিৎ এই নতুন ভাড়াটে। সমরজিৎ অনির সঙ্গেই জিওলজি নিয়ে এম এস্‌সি পড়ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমরজিতের বড়দাদা ক্যাডবেরির সেল্‌স ম্যানেজার। অ্যাস্ট্রোনট নীল আর্মস্ট্রং-এর মতো দেখতে, খুবই সুপুরুষ। অনিদের বাড়িতে প্রায়ই নানা ধরনের ক্যাডবেরি চকোলেটের উপহার আসে দোতলা থেকে। ছুটির দিন বিকেলে অনি আর কেয়ার ডাক আসে ওপর থেকে, "আফটারনুন টি"। সমরজিতের বাবা এককালে পূর্ব বাংলার কোনও এক জায়গায় জমিদার ছিলেন। ভিটেমাটি সব হারিয়েও শৌখিন মেজাজটা হারাননি। খুব জমিয়ে সবাইকে নিয়ে গল্প করেন, বিরাট ব্যালকনিতে বসে। চারিদিকে টবে ফুল দিয়ে দারুণ সাজিয়েছে সমরজিতের বড়বউদি। সবাই যোগ দেয় টি পার্টিতে। মাঝে মাঝে অনি ও সমরজিৎ একসঙ্গে পড়াশুনা করে। ওরা একই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে কলেজে। মঞ্জুবীথি বেশ জমজমাটি ছিল সেই সময়। অনি ব্যাঙ্ককের হোটেলে বসে পুরনো দিনের কথা ভাবছে। সাজাবার চেষ্টা করছে মঞ্জুবীথির বাড়িতে ঘটনার সংকলন।

অনির ফোটোগ্রাফার হিসেবে আত্মীয়স্বজনের মাঝে নাম ছিল। অনেকের বিয়েতে ও ছবি তুলে দিয়েছে। অনি ভীষণ ব্যস্ত থিসিস নিয়ে। শুধু শনিবারের বিকেলটা ফাঁকা রেখেছে সর্বাণীর জন্য। ক্যামেরা ঝুলিয়ে গীতবিতানে যায়। কলকাতার নানা জায়গায় সর্বাণীকে নিয়ে ছবি তোলে। বেশিরভাগই পোর্ট্রেট। জিওলজি ডিপার্টমেন্টের ডার্করুমে পাহাড়ের ছবির সঙ্গে এনলার্জ করে সর্বাণীর ছবি। বন্ধুরা দেখে তারিফ করে। কম্পোজিশন দেখে মুগ্ধ হয়। "বেশ ফোটোজেনিক মুখ সর্বাণীর।"

একদিন ছুটির দিন সর্বাণী ও পূর্ণিমাকে নিয়ে অনি মঞ্জুবীথিতে এল। সর্বাণীর কথা সবাই শুনেছিল অনির মুখে। সর্বাণীকে দেখে সবাই খুশি। ইন্দ্রর সঙ্গে সর্বাণীর খুব জমে গেল। একই বয়েস হবে। অনি পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। ইন্দ্র মাঝে মাঝে ভবানীপুরে গিয়ে সর্বাণীদের সঙ্গে হইচই করে আসে। সর্বাণীর বেডিয়ো

প্রোগ্রামে ইন্দ্রই নিয়ে যায় আকাশবাণীতে। ইন্দ্রই সর্বাণীদের সঙ্গে এক ছুটির দিন ঘুরে এল শ্রীরামপুরে। মাঝে মাঝে ইন্দ্রই সর্বাণীকে নিয়ে আসে মঞ্জুবীথিতে ছুটির দিনে। সর্বাণীর গানের সঙ্গে আনন্দশেখর বেহালা বাজান। ইন্দ্র তবলাটা নিয়ে বসে। দেখতে দেখতে অনির সব ভাই সর্বাণীর খুব ভক্ত হয়ে গেল।

অনি যখন পরীক্ষার প্রস্তুতি করছে, হঠাৎ ওদের বাড়িতে এসে হাজির আনন্দশেখরের গ্রাম সম্পর্কের জ্যাঠামশাই। অনেক খোঁজ করে আনন্দশেখরের ঠিকানা জোগাড় করে এসেছেন। এই জ্যাঠামশাই অল্প বয়সে আনন্দশেখর ও যতিশেখরকে দেখাশোনা করেছিলেন শিকারপুরে যখন বিধুশেখর সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন গম্ভীরানন্দের কাছে। আনন্দশেখর সেই ঋণ ভুলতে পারেননি। জীবনের শেষ ক'টা বছর জ্যাঠামশাই আনন্দশেখরের কাছে থাকতে চান। চিরকুমার এই জ্যাঠামশাই। পুজোআর্চা করেন। চিরকালই যজমানি করেছেন। ভীষণ খুঁতখুঁতে। ব্রাহ্মণ ছাড়া কারও হাতে জল খাবেন না। দুর্বাসার মতো রাগ। রেগে গেলে প্রচণ্ড গালিগালাজ করেন। অনিরা সবাই দাদু বলে ডাকা শুরু করল গ্রামের জ্যাঠামশাইকে। ঠিক হল দাদু অনির ঘরে শোবে। আকাশ ও ইন্দ্র চলে গেল মাঝের ঘরে। দাদু চোখের ছানি থাকাতে আবছা আবছা দেখেন।

ইন্দ্র দাদুকে রাগিয়ে খুব মজা পায়। বন্ধুদের নিয়ে দাদুর কাছে আসে। বলে, "দাদু একে চিনতে পার?"

"কে— বল্‌ই-না?"

"বলতে পারলে না?"

তোমাদের গ্রামের মৌলবির ছেলে মহম্মদ, আমার খুব বন্ধু। দারুণ গোরুর মাংস রান্না করে। আজ আমরা সবাই মুরগি রান্না করব।"

"ওরে পোড়া কপাল। মোছলমানরে ঘরে ঢোকাইছ।" চিৎকার করে ওঠে দাদু, "ছোট বউ— বাড়ি থিকা এই ম্লেচ্ছদের তাড়াও। তা না হইলে আমি এই বাড়িতে জলস্পর্শ করব না।"

হেমছায়া ছুটে এসে ইন্দ্রকে বকাবকি করেন দাদুকে রাগাবার জন্য। আশ্বাস দেন জ্যাঠামশাইকে, "ইন্দ্র মিথ্যা কথা বলছে আপনাকে। মহম্মদ বলে কোনও ছেলে এখানে নেই। এ বাড়িতে গোরু বা মুরগির মাংস রান্না হয় না।"

অনি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। মাঝে মাঝে সমরজিৎ ও অন্যান্য বন্ধুরা আসে আলোচনা করতে। বাড়ি থেকে ও একদম বের হয় না কাজ ছাড়া। বইয়ের মধ্যে সর্বাণীর একটা ছবি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তুলেছিল অনি। মাঝে মাঝে ছবিটা দেখে। সন্ধেবেলা একা একা হাঁটতে যায় পর্ণশ্রীর মাঠে। লেকটার পাশে শুয়ে থাকে যতক্ষণ না একটা-দুটো তারা ফোটে আকাশে। সর্বাণীকে চিঠি লিখেছে এই একমাস ও নির্বাসনে আছে। মাঝে মাঝে থিসিসটা টাইপ করাতে যায় হাজরার

মোড়ে এক টাইপিস্টের কাছে। কতদিন ভাবে একবার ঘুরে আসে সর্বাণীর কাছ থেকে। নিজেকে দুর্বল করবে না অনি। এটা জীবনমরণের পরীক্ষা। সর্বাণীর জন্য ওকে বড় হতেই হবে। সর্বাণীই ওর জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। সর্বাণী লিখেছে, "পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে, সেদিন দেখতে চাই।" চিঠির লাইনটা বারবার পড়ে আর ভাবে সর্বাণীর কথা।

যেদিন পরীক্ষা শেষ হল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। কলকাতা ভেসে গেছে আষাঢ়ের বর্ষণে। অনি এইদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে বহুদিন। সর্বাণীর জন্য একটা বইয়ের দোকান থেকে কিছু কবিতার বই কিনল। কিনল একটা বড় জুঁইয়ের মালা, একগুচ্ছ স্বর্ণচাঁপা ফুল আর ক্যাডবেরি। রূপনারায়ণে যখন পৌঁছল সন্ধে হয়ে গেছে। সর্বাণীই দরজা খুলে দিল। এতদিন পরে সর্বাণীকে দেখে জড়িয়ে ধরে অনি। হঠাৎ মনে হল অনির সর্বাণী অনেক বড় হয়ে গেছে।

একটু পরেই পূর্ণিমা ঢোকেন। অফিস থেকে ফিরেছেন। "কখন এলে অনি? কেমন পরীক্ষা হল?"

সর্বাণী তখন চুলের বেণীতে জুঁইফুলের মালা জড়িয়ে রেখেছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে সর্বাণীকে। পূর্ণিমা বৃষ্টিতে পুরো ভিজে গেছেন। বললেন, "তোমরা গল্প করো, আমি একটু গা ধুয়ে আসছি।" এই বলে চলে গেলেন।

সর্বাণী বলে, "আমার দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?" অনি বলে, "আমার জিনিস আমি দেখব না? দু' চোখ ভরে দেখব যতক্ষণ না চোখ বন্ধ হয়ে যায়।"

সর্বাণী বলে, "আহা রে। আঁধার ঘরে এসেছে মোর অন্ধকারের রাজা।"

"এ যে তৃপ্তি মিত্রের মতো শোনাচ্ছে। অদ্ভুত যোগাযোগ। কাল দুপুরেই নিউ এম্পায়ারে দুটো টিকিট কেটেছি বহুরূপীর রক্তকরবীর। আশা করি তোমার মা আপত্তি করবেন না আমি যদি তোমায় নিয়ে যাই।"

সর্বাণী বলে, "ভাল ছেলের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। অন্য লোক হলে মা কখনওই একা একা ছাড়তেন না। তবে তোমার কথা আলাদা। মা বলে, অনির মতো নাকি ছেলেই হয় না। নিজের জায়গাটা বেশ ভালভাবেই গুছিয়ে রেখেছ।"

এর মধ্যে পূর্ণিমা এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে এসেছেন। অনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে, "আজ কোনও কথা নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান শুনব। সর্বাণী, তৈরি হও গানের জন্য।"

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। সর্বাণী একটার পর একটা বর্ষার গান গাইল। শেষ করল, "বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল"। অনি ঘড়ি দেখল। এবার উঠতে হবে। পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে বলে, "কাল দুপুরে আমি সর্বাণীকে নিয়ে নিউ এম্পায়ারে একটা নাটক দেখতে যাব। সন্ধের আগেই পৌঁছে দেব বাড়িতে। আপনার অনুমতি চাই।"

পূর্ণিমা বলেন, "তোমার সঙ্গে সর্বাণী নাটক দেখতে যাবে তাতে আপত্তি

থাকবে কেন? তবে ছুটির একদিন অশ্রু, বারীন সবাইকে নিয়ে আমরা পিকনিক করতে যাব ব্যান্ডেলের চার্চে। শ্রীরামপুর থেকে আমার ভাই-বোনও আসবে। গৌরীকেও আসতে বলব। শিমুলতলার মতো লাগবে।"

১৯৬৪ সালের শেষ বর্ষণ হয়ে গেছে। এবার শরতের পালা। এম এস্‌সি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে। অনির সকাল থেকে জ্বর। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। হঠাৎ বরুণ এসে খবর দিল সন্ধের দিকে, "কী রে অনি, কলেজ যাসনি? আজকে রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। এবারও তুই ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিস।" হেমছায়া শুনে দৌড়ে আসেন। বলেন, "বরুণ, দু'বারই তুমি ভাল খবরটা বাড়ি বয়ে নিয়ে এলে। তোমার জন্য ভাল মিষ্টি আসছে। যেয়ো না কিন্তু। অনি তো দিনদুয়েক জ্বরে শুয়ে আছে।"

অনি খবরটা শুনে উঠে বসে। সারাটা সকাল চিন্তা করছিল পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য। মনে হল জ্বর ছেড়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তেই সর্বাণীকে খবরটা জানায়। ইন্দ্র ঘরে ঢুকেই খবরটা শোনে। অনির কাছে এসে বলে, "কী রে দাদা, সর্বাণীকে নিয়ে আসব? সারা রাত খুব হইচই হবে।" অনির সম্মতি পেয়ে ইন্দ্র বেরিয়ে যায় সর্বাণীকে নিয়ে আসার জন্য।

বরুণের সঙ্গে কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে। এবার নতুন জীবন শুরু। আর পরীক্ষার পড়া পড়তে হবে না, ক্লাসে গিয়ে নোট নিতে হবে না। চাকরির বাজার দারুণ ভাল। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় প্রচুর জিওলজিস্ট নেবে, গেজেটেড অফিসার। দারুণ মাইনে, প্রচুর সুখ-সুবিধে। তবে সারা ভারতে ঘুরতে হবে— বদলির চাকরি। জি এস আই-এর হেড কোয়ার্টার কলকাতা হওয়াতে চাকরি-বাকরির খোঁজখবর নেওয়া আরও সুবিধে। বেশিরভাগ বন্ধুই জি এস আই-তে যোগদান করবে ঠিক করেছে। আনন্দশেখরের ইচ্ছে অনি গবেষণা করুক। ডক্টরেট করুক। এখনও কিছু বছর চাকরি আছে আনন্দশেখরের। আনন্দশেখর নিজে ডক্টরেটের কাজ শেষ করতে পারেননি। অনিকে ঘিরেই অসমাপ্ত স্বপ্ন সফল করাতে চান। আনন্দশেখর চান না অনি জি এস আই-এ যোগ দেয়। নিজের ব্যর্থতা মনে পড়ে। অনিকে বলে, "কাল তুই যাদবপুরে গিয়ে তোর প্রফেসর সুবীরবাবুর সঙ্গে দেখা কর। ওঁর কাছে ডক্টরেট করে বিদেশে চলে যাস গবেষণার জন্য। আমি যা করতে পারিনি, তুই তাই পারবি। এ ছাড়া শান্তি পালিতের সঙ্গে একবার দেখা করিস। তোকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে শান্তি। তোর রেজাল্টের কথা শুনে খুব খুশি হবে।"

পরের দিন কলেজে গিয়ে দেখে সহপাঠীরা সবাই এসে গেছে। অনিকে সবাই অভিনন্দন জানাল পরীক্ষায় প্রথম হবার জন্য। সুবীরবাবু তখনও ডিপার্টমেন্টে আসেননি। আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স কলেজের উলটোদিকেই কালটিভেশন অব

সায়েন্স। অনি ডক্টর শান্তিরঞ্জন পালিতের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কলেজের গণ্ডি শেষ করে কী করবে, এই নিয়ে একটা আলোচনা করতে চায় তাঁর সঙ্গে।

যাদবপুরে পড়ার সময় প্রফেসর পালিত প্রায়ই অনিকে ডেকে পাঠাতেন লাঞ্চ খাবার জন্য। খুব দুঃখ নিজের ছেলেরা কেউই বিজ্ঞানের দিকে যায়নি। এইজন্য তিনি অনিকে খুব ভালবাসেন। অনির রেজাল্ট শুনে খুব খুশি। বেয়ারাকে মিষ্টি আনতে বললেন কাকাবাবু। বললেন, "দ্যাখো অনি, আনন্দশেখর চিরকাল আদর্শের পেছনে ছুটে নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করেছে। আজ আনন্দশেখরকে দেখে কষ্ট লাগে। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট ছিল তোমার বাবা, আর আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো— বিজ্ঞানে বিশ্বজোড়া খ্যাতি আমার। লক্ষ্মী ও সরস্বতী— দু'জনেই আমায় কৃপা করেছেন। অনি, তোমাকে প্রাগম্যাটিক হতে হবে। ভাগ্যের কী পরিহাস। আমার ছেলেদুটো কেউ পড়াশুনা করল না। তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে। এদিক দিয়ে আনন্দশেখর আমাকে হারিয়ে দিয়েছে স্বীকার করি। প্রাচুর্য মানুষকে অক্ষম করে, দারিদ্র্য মানুষকে পঙ্গু করে। আনন্দশেখর তোমাকে ঠিকমতো বড় করতে পেরেছে যেটা আমি পারিনি আমার ছেলেদের ক্ষেত্রে।

"অনি, তোমার জন্য আমার কিছু করতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমার ছেলের মতো। আমি তোমাকে তোমার ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য সাহায্য করতে চাই। কারণ তোমার মধ্যে আমি অনেক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। জানই তো সি এস আই আর ল্যাবরেটরিগুলোর সিলেকশন কমিটিতে আমি আছি। তোমাদের লাইনে দু'জন ডিরেক্টরের সিলেকশন কমিটিতে আমি ছিলাম। ওদের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা। একজন হচ্ছে ডক্টর হরিনারায়ণ, হায়দ্রাবাদে ন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর। আর একজন ডক্টর কৃষ্ণ— দেরাদুনের পেট্রোলিয়াম রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর। দু'জনকে আমি ফোন করে দিচ্ছি। দু' জায়গায় তোমার ভাল চাকরি হবার সম্ভাবনা বেশ ওপরের দিকে। দুটো ইন্সটিটিউটেই ফরেন কোলাবরেশন আছে। তোমার বিদেশ যাবার সম্ভাবনা নিশ্চিত। প্রচুর মাইনে পাবে। এখন দেশ স্বাধীন। তোমাদের মতো বিজ্ঞানীদের দরকার। আনন্দশেখরের মতো ভুল আর কোরো না।"

অনির ডক্টর পালিতের সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। ওর সামনে তিনটে পথ এখন খোলা। এক হচ্ছে ডক্টর পালিতের কথা শুনে দেরাদুন অথবা হায়দ্রাবাদে যাওয়া। দ্বিতীয় হচ্ছে অন্যান্য সহপাঠীদের মতো জিওলজিক্যাল সার্ভেতে ঢোকা। তৃতীয় হচ্ছে, যাদবপুরে সুবীরবাবুর কাছে ডক্টরেট করা। ডক্টর পালিতের কথা শুনে মনে হচ্ছে এবার কলকাতা ছাড়ার সময় এসেছে। অনির অবশ্য এ ব্যাপারে আপত্তি নেই। ভারতের যে-কোনও জায়গায় ও থাকতে রাজি। তবে আনন্দশেখরের মতামতের ওপর নির্ভর করছে ওর ভবিষ্যৎ, সেটা বুঝতে পারে অনি।

অনি জিওলজি ডিপার্টমেন্টে ফিরে এল। তখনও সহপাঠীদের ভিড়। চিন্ময়

বলে ওঠে, "অনি, সুবীরবাবু এইমাত্র এসেছেন। তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। একবার দেখা করে আয়।"

অনি সুবীরবাবুর ঘরে ঢোকে। খুব খুশি প্রিয় ছাত্রের সাফল্যের জন্য। খুব লাজুক ধরনের সুবীরবাবু। কথায় উচ্ছ্বাস কম।

"অনি এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে তোমাদের বন্ধুরা, বেশির ভাগই জিওলজিক্যাল সার্ভে-তে জয়েন করছে। তুমি কিছু ঠিক করেছ এই ব্যাপারে? মনে রেখো, জীবনে দুটো মূল্যবান সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। প্রথমত, কে তোমার বউ হবে, সারাজীবন কাকে নিয়ে ঘর করবে। দ্বিতীয়ত, তোমার নিজের প্রফেশন। তুমি কী করতে চাও সারাজীবন। অ্যাকাডেমিক্স না সরকারি চাকরি। অ্যাকাডেমিক্স-এ সৃষ্টির আনন্দ, সরকারি চাকরিতে সমাজে প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইউ আর দি ক্যাপ্টেন অফ ইয়োর শিপ।"

অনি ডক্টর পালিতের সঙ্গে কী কথা হয়েছে সুবীরবাবুকে বলল। "স্যার, মনে হচ্ছে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে দেরাদুনে, অথবা ন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইন্সটিটিউট হায়দ্রাবাদে চাকরি হবার সম্ভাবনা। দুটোই নাকি উঁচু দিকের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্ট, অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর লেভেলের। আপনার কী মনে হয় এই দুটো চাকরি নিয়ে?"

সুবীরবাবু শুনে বললেন, "ডক্টর পালিত যদি তোমায় আশ্বাস দিয়ে থাকেন, ধরেই রাখো চাকরি দুটো তোমার হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি কী চাও? সমাজে প্রতিষ্ঠা, গাড়ি, বাড়ি? নাকি আমার মতো কোনও য়ুনিভার্সিটিতে পড়াতে চাও ডক্টরেট করার পর? তোমার যা টেম্পারামেন্ট, আমার তো মনে হয় দ্বিতীয় পথটাই তোমার পক্ষে ভাল।"

অনি বুঝতে পারে সুবীরবাবুর মনের কথা। বলে, "স্যার, আমারও ইচ্ছে আপনার কাছে ডক্টরেট করি। তার পর বিদেশে চলে যাই।"

"শোনো অনি, আমার ভবিষ্যৎ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিশ্চিত। মনে হচ্ছে আমি এখানে আটকে গেছি। নতুন কিছু করার ইচ্ছে, কিন্তু হয়ে উঠছে না। এ-ব্যাপারে আমি ডিপার্টমেন্টকে দোষ দিই না, য়ুনিভার্সিটিকে দোষ দিই না। আমি এই পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছি। দেশবিদেশে কত নতুন ধরনের কাজ হচ্ছে। বিশেষ করে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করার আমার খুব ইচ্ছে। এখানে সে ধরনের ল্যাবরেটরি নেই। গত সপ্তাহে আমি বরানগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা দারুণ জিওলজি ডিপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে। ওখানে ছাত্র পড়াবার দায়িত্ব নেই। রিসার্চ করার দারুণ সুযোগ। দেশ-বিদেশের নামী-দামি বিজ্ঞানীরা সবসময় আসছেন। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। ইংল্যান্ড থেকে এক নামকরা প্যালিওন্টলজিস্ট এসেছেন আই এস আই-এ। নাম

ডক্টর প্যামেলা রবিনসন। আমি ডক্টর রবিনসনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম যদি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে পারি। জানই তো আমি প্যালিওন্টলজির কিছুই জানি না। তবুও এই বয়সে নতুন করে শেখার জন্য রাজি। ডক্টর রবিনসন আমাকে সুইডেনে র‍্যামবার্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। বললেন, এই বয়সে নতুন করে প্যালিওন্টলজি শেখার কোনও মানে হয় না। কিন্তু তিনি সদ্য য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা একজন ছাত্রকে চান, যাকে নতুন করে শেখাতে পারবেন। জানই তো এদেশে ভার্টিব্রেট প্যালিওন্টলজির চলন নেই। উনি আই এস আই-তে প্যালিওন্টলজির একটা রিসার্চ ডিভিশন খুলতে চান আন্তর্জাতিক মানের। তোমার কথা শুনে খুব আগ্রহী। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরই নাকি ওঁর দরকার। তুমি ডক্টর রবিনসনের কাছে ডক্টরেট করো এটা আমার ইচ্ছে। ডক্টর রবিনসন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সুতরাং তোমার কাজ কিছুটা আই এস আই কিছুটা লন্ডনে হবে। কাল-পরশু একবার বরানগরে চলে যাও ডক্টর রবিনসনের সঙ্গে দেখা করতে। খুব ভাল লাগবে কথা বলে। আমার বয়স যদি তোমার মতো হত, আমি নিজেই ডক্টর রবিনসনের কাছে কাজ শুরু করতাম, কোনওদিক না ভেবে। এরকম সুযোগ কলকাতায় বসে সচরাচর মেলে না অনি। এটা লাইফটাইম অপরচুনিটি। ভেবে দেখো ভাল করে। আই এস আই-এর জিওলজি ডিভিশনের হেড হচ্ছেন আমাদের থেকে বয়সে কিছু বড় বিমলেন্দু রায়চৌধুরী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বরাবরই ফার্স্ট হয়েছেন বিমলদা। সন্তোষের রাজার বাড়ির ছেলে। বহুদিন আমেরিকায় ছিলেন। ক্যালটেকের ডক্টরেট। মহলানবিশ ওঁকে আমেরিকা থেকে ধরে এনেছেন। খুব ভাল লাগবে বিমলদাকে। আমেরিকার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ধাঁচে জিওলজি ডিপার্টমেন্ট তৈরি করছেন আই এস আই-তে। বিমলদাও তোমার কথা শুনে খুব খুশি। আমার মনে হয় আই এস আই-এর পরিবেশ তোমার খুব ভাল লাগবে।"

দিন দুয়েক পরে অনি মনের জোর করে রওনা দেয় আই এস আই-এর দিকে। বেলঘরিয়া কলোনিতে থাকার সময় বাসে করে অনেকবার এই বাড়িটা দেখেছে বি টি রোডের ওপর, ডানলপ ব্রিজের কাছে। এর ভেতরে কী হয় ওর কোনও ধারণাই ছিল না। ও জানত প্রফেসর মহলানবিশের কথা। ও জানত আই এস আই-এ স্ট্যাটিসটিক্স ও ম্যাথেমেটিক্স-এ বিশ্বজোড়া নাম। কিন্তু এর ভেতরে যে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণা হয়, এ ধারণা ওর ছিল না। আই এস আই-এর ভেতরে যে জিওলজি ডিপার্টমেন্ট আছে অনি জানতই না।

অনি খুঁজে পেতে জিওলজি ডিপার্টমেন্টে চলে আসে। দোতলায় জিওলজি অফিস। অফিসের ভেতরে ঢুকেই আলাপ হল ডিপার্টমেন্টের বড়বাবুর সঙ্গে। সবাই ডাকে আমিনবাবু। মণীশচন্দ্র দে আমিন। গভীর মনোযোগে কী একটা টাইপ করছিলেন। কথায় বাঙাল টান।

"কী চাই আপনার?"

অনি নিজের পরিচয় দেয়। বলে, "প্যামেলা রবিনসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি আমার কথা শুনেছেন আমার প্রফেসরের কাছে। আমাকে দেখা করতে বলেছেন।"

"বলবেন তো, মেমসাহেবের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আপনি এখানে বসুন। আমি দেখে আসছি উনি ব্যস্ত আছেন কি না।"

একটু পরে আমিনবাবু বলেন, "মেমসাহেব আপনাকে ডাকছেন। আমার সঙ্গে আসেন। ওনার অফিসে আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

অনি এর আগে কখনও কোনও সাহেব-মেমদের সঙ্গে কথা বলেনি। খুব ভাল লাগল ডক্টর রবিনসনের সঙ্গে কথা বলে। মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা। হেমছায়ার বয়সি হবেন। নীল চোখ। নীল ফুল ফুল একটা স্কার্ট, চেন স্মোকার। কাঁধের ওপর সোনালি চুল এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে কথা বলছেন যাতে অনির বুঝতে কোনও অসুবিধে না হয় ব্রিটিশ ইংলিশ।

"ডক্টর গোষ টক্‌ড হাইলি অ্যাবাউট ইউ। লেট মি শো ইউ হোয়াট উই আর ডুইং হিয়ার। লেটস গো টু দি মিউজিয়ম। ডাউনস্টেয়ার।"

ডক্টর রবিনসন অনিকে ঘুরে ঘুরে সব দেখান জিওলজি মিউজিয়মে। অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী উপত্যকার থেকে যে বিরাট বিরাট ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন, দেখাচ্ছেন। অনির কোনও ধারণাই ছিল না যে ভারতে ডাইনোসর পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ওরা ক্লাসে কিছুই পড়েনি। নানা ধরনের ফিল্ড ফোটো। কীভাবে ডাইনোসর ঘোরাঘুরি করছে। এই আবিষ্কার নিয়ে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে গেছে। বিরাট করে লন্ডন টাইমস-এর খবর। অনি কলকাতায় বসে কিছুই খবর রাখে না। এসব খবর যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছয়নি এখনও।

ডক্টর রবিনসন অনিকে বললেন, "প্যালিওন্টলজিতে ভারত এখনও অনেক পিছিয়ে। অথচ কত ফসিল মাটির তলায় লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। অনির্বাণ, আমি চাই তুমি ফার্স্টরেট প্যালিওন্টলজিস্ট হও। ভারতের এই সম্পদ পৃথিবীর সামনে তুলে ধরো।"

খুব ভাল লাগল ডক্টর রবিনসনের সঙ্গে কথা বলে। ফেরার পথে বাসের জানলার পাশে বসে বসে ভাবছে কী করবে। একদিকে আই এস আই-এর পরিবেশ খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু নতুন করে আবার শুরু করতে হবে। এতদিন পাথর নিয়ে গবেষণা করেছে। ফসিলে ওর সামান্য অভিজ্ঞতা। প্রচুর পড়াশুনা করতে হবে। যোগ দিতে হবে রিসার্চ স্কলার হিসেবে। মাইনে মাত্র চারশো টাকা। বন্ধুবান্ধবেরা যারা জি এস আই-তে যোগ দিচ্ছে, তারা মাইনে পাবে দু' হাজারের ওপর। তার পর নানারকম সুযোগ-সুবিধে ফার্স্টক্লাস গেজেটেড অফিসারের। উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। সবাই ডিরেক্টর হয়ে যাবে জীবনের শেষে। অনি দেখতে

পাচ্ছে কল্পনায়— চিন্ময় ডিরেক্টর-জেনারেল হয়ে গেছে জি এস আই-এ। অনি তখন হয়তো আই এস আই-এর এক ছাপোষা অধ্যাপক। কী করবে বুঝতে পারছে না ভবিষ্যৎ নিয়ে।

এর মধ্যে মাসখানেক কেটে গেছে। দেরাদুন, হায়দ্রাবাদ দুটো জায়গা থেকেই অনির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাজির। সত্যিই লোভনীয় চাকরি। অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টরের পজিশন। জি এস আই-এর চাকরির চেয়ে অনেক ভাল। প্রচুর মাইনে। অয়েল কোম্পানির ওপর অনির একটু দুর্বলতা। মনে মনে ঠিক করল দেরাদুনে যাবে ও এন জি সি-র রিসার্চ উইং-এ। এ ব্যাপারে আনন্দশেখরের ইচ্ছে নেই। আনন্দশেখরের ইচ্ছে অনি ডক্টরেট ক'রে এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবে, গবেষণা করবে। সরকারি বুরোক্র্যাসির মধ্যে অনি সারাজীবন কাটাবে এটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

অনি এখনও ঠিক করতে পারছে না কী করবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শোনে একটা সামান্য কেরানির চাকরির জন্য কী কষ্ট। সারা পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার বেকার বসে আছে, যে-কোনও চাকরির জন্য তারা তৈরি। চারিদিকে অশান্তি এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে। চারিদিকে ধর্মঘট লেগেই আছে। কেমন একটা নৈরাশ্য চারিদিকে। অনির সেইসব নিয়ে ভাবনা নেই। ইন্টারভিউ না দিয়েই ওর চাকরি হয়ে গেছে। ওদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আশার আলো। স্বাধীন ভারতের নতুন প্রজন্মের কর্মী এরা। বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা হতে চলেছে এরা।

অনির ভবিষ্যৎ ঠিক হল আকস্মিকভাবে এক সন্ধেবেলা। পুজো হয়ে গেছে। কিছু বন্ধুবান্ধব মিলে এলিট সিনেমা থেকে বেরিয়ে একটা পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়েছে সিগারেট কিনবে বলে। হঠাৎ স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের একটা জিপ থামল দোকানের সামনে। ভেতরে ডক্টর বিমলেন্দু রায়চৌধুরী— জিওলজি ডিপার্টমেন্টের হেড।

"অনির্বাণ, তোমার সময় আছে? পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখা হয়ে ভালই হল। তোমার কথাই আমরা ভাবছিলাম। চলে এসো আমার গাড়িতে।"

আই এস আই-এ ইন্টারভিউ দেবার সময় ডক্টর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তখনই বলেছিলেন, "আমাকে বিমলদা বোলো। এখানে কোনও ফর্মালিটি নেই।"

"কেমন আছ অনির্বাণ? তুমি আর আই এস আই-তে এলে না? চলো আমার বাড়ি, রাসবিহারীর মোড়েই। কফি খেতে খেতে আলোচনা করা যাবে।" এই বলে উইলস্-এর প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন। লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিলেন অনির সিগারেটটা। প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে পৌঁছে বিমলদা আলাপ করিয়ে দিলেন ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে। সুধা বউদিও বিজ্ঞানের ছাত্রী। সুধা বউদি

বললেন, "তোমরা একটু বোসো, আমি তোমাদের কফি নিয়ে আসি।"

বিমলদা নিজের কথা বলেন। বহুদিন আমেরিকায় ছিলেন। বছর পনেরো। ক্যালিফোর্নিয়ার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালটেক থেকে ডক্টরেট করেছেন। ওখানেই পড়াতেন। প্রফেসর মহলানবিশের অনুরোধে দেশে ফিরেছেন। কী দারুণ কথা বলেন বিমলদা। যেমন ইংরেজি, তেমনি বাংলা। অনি জীবনে এত স্মার্ট লোক দেখেনি। কেমন যেন আন্তরিকতার টান। অনিকে যেন কতদিন ধরে চেনেন, জানেন। খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নিলেন। অনির মনে হল, মন খুলে বিমলদার সঙ্গে সব কথা বলা যায়। আভিজাত্যের সঙ্গে আন্তরিকতার এমন সমন্বয় অনি কখনও দেখেনি। অনির মনে হল বিমলদার মতো লোকের সঙ্গে সারাজীবন ও কাজ করতে পারে।

কফি খেতে খেতে বিমলদা জিজ্ঞেস করলেন—"অনি, আই এস আই-এ কবে জয়েন করছ? পামেলা তোমার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড।"

অনি ইতস্তত করে। দেরাদুন আর হায়দ্রাবাদের নতুন চাকরির কথা বলে। "ইচ্ছে আছে দেরাদুনে জয়েন করব, ও এন জি সি-তে।"

হা হা করে হেসে ওঠেন বিমলদা। "এইজন্য তুমি আই এস আই-এ আসনি? আমি এই দুটো সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুরে এসেছি। বিরাট বাড়ি উঠেছে। এখনও ফাঁকা। ওরা প্রচুর নতুন লোক নেবে তাও জানি। তুমি যে ডেপুটি ডিরেক্টরের পজিশন পেয়েছ, খুবই ভাল কথা। প্রচুর মাইনে পাবে। কিন্তু প্রথম পাঁচ বছর বিজ্ঞানের সঙ্গে তোমার কোনও যোগাযোগ থাকবে না। হিল্লিদিল্লি করবে। মিনিস্ট্রি অব মাইনসের সেক্রেটারিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। বেসিক্যালি তুমি একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে। বিজ্ঞানে নতুন কিছু করার নেশাটা চিরকালের জন্য ভোঁতা হয়ে যাবে। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়—এর চেয়ে দুঃখের কী হতে পারে। এই ফর্মেটিভ বয়সে কিছু ক্রিয়েটিভ করো। পামেলার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছ, এ সুযোগ নষ্ট কোরো না। আমি তো সারা পৃথিবী ঘুরে দেখলাম। আই এস আই একটা বিজ্ঞানের দারুণ ইন্সটিটিউট হবে। জিওলজি ডিপার্টমেন্টটা গড়ার দায়িত্ব আমার। অনির্বাণ, তোমার মতো ছেলেদের আমার দরকার।"

বিমলদার কথায় অনি চমকে গেল। এ যেন পি সি রায় আনন্দশেখরকে বলছেন দেশ গড়ার আহ্বানে সাড়া দিতে।

"কালকেই চলে এসো আই এস আই-তে। কিছুদিনের মধ্যেই পামেলা লন্ডনে ফিরে যাচ্ছেন। যাবার আগে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। একা একা যদি আসতে না চাও, তোমার বন্ধু অশ্রুকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারো। অশ্রুকেও আমরা অফার দিয়েছি। ও আমার কাছে ডক্টরেট করবে। ওর কাছ থেকে কিছু ফাইনাল রেসপন্স পাইনি। আমি কিন্তু তোমাদের কাল সকাল দশটায় আশা করছি।"

বিমলদার কাছ থেকে বেরিয়ে অনি অশ্রুর বাড়ি গেল। অশ্রু তখনও বাড়ি ফেরেনি। ওর দিদিকে বলল, "অশ্রু যেন ঠিক দশটার মধ্যে কাল আই এস আই যায়। ওরা নিশ্চয়ই এখনও চৌরঙ্গি পাড়ার কফি হাউসে আড্ডা মারছে।"

পরের দিন অনি আর অশ্রু আই এস আই-এ উপস্থিত। অনি চারিদিক তাকিয়ে দেখছে। ঠিক শান্তিনিকেতনের মতো পরিবেশ। লাল সুরকির রাস্তা। দু' পাশে গাছপালা। ক্যাম্পাসের ভেতরে গোটা তিনেক পদ্মপুকুর। গেটের ওপর বোগেনভিলিয়া। বেঁটে বেঁটে নারকেল গাছ পুকুরের পাশে। চারিদিকে অনেকরকম ফুল ফুটে আছে। কী শান্ত পরিবেশ, এখানে কলকাতার ভিড় নেই। বেশ-কিছু বিদেশি বিজ্ঞানী হাওয়াই চটি পরে হাঁটছে, কথা বলছে। বিরাট আম্রকুঞ্জ। সেখানেই কনভোকেশন হয়। জিওলজি বিল্ডিংটা পশ্চিমদিকে। তার সামনেই গোপাললাল ঠাকুর রোড। সেখান থেকে বরানগর স্টেশনটা কাছে। ওখানে একটা বাস টার্মিনাস। সেখান থেকে সোজা এসপ্লানেডে যাওয়া যায়। অফিস ঘরে এসে দেখে অশ্রু সেখানে ব'সে। আমিনবাবু বলেন, "ডক্টর রায়চৌধুরী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। চলুন আপনাদের নিয়ে যাই ওনার অফিসে।"

আমিনবাবুর অফিসের মধ্য দিয়েই বিমলদার অফিসে যেতে হয়।

"আরে, অনি আর অশ্রু, তোমরা এসে গেছ। ওয়েলকাম টু আই এস আই। চলো, তোমাদের ডিপার্টমেন্টটা ঘুরিয়ে দেখাই। সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

সরু করিডর চলে গেছে। দু'পাশে অফিস ঘর। সাদা কাচের দরজায় প্রত্যেকের নাম লেখা। অনি দরজার ওপর নিজের নাম লেখা দেখে চমকে যায়। বিমলদা চাবি দিয়ে দরজা খোলেন। "অনির্বাণ, এটা তোমার অফিস।" ফার্নিচার দিয়ে সাজানো অফিসঘর দেখে অনি চমকে যায়। যাদবপুরে সুবীরবাবুর অফিসও এত বড় নয়। পাশের ঘরটা হচ্ছে অশ্রুর। ওরও দরজায় ওর নাম লেখা। বিমলদা কি সত্যিই ধরে নিয়েছেন ওরা আই এস আই-তে জয়েন করছে?

সব ফ্যাকাল্টির সঙ্গে বিমলদা আলাপ করিয়ে দিলেন। সোহনলাল জৈন, তপন রায়চৌধুরী, সুপ্রিয় সেনগুপ্ত, সুগত সেনগুপ্ত, শুভেন্দু বক্সী, টি এস কুট্টি। এ ছাড়া আর্টিস্ট ধ্রুব রায়, ফসিল প্রিপারেটর প্রণব মজুমদার, আর তার সহকারী ধয়া প্রধান। টেকনিসিয়ান ধীরাজ রুদ্র। ছোট্ট ডিপার্টমেন্ট। রিসার্চই এখানে প্রধান।

সবাইকে নিয়ে বিমলদা চায়ের ঘরে গেলেন। মিউজিয়মের ব্যালকনিতে চায়ের ঘর। বেশ আড্ডা দেবার জায়গা। দেবরাজ হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের কুক। দুপুরে সবার জন্য অফিস কোয়ার্টার থেকে রান্না করে নিয়ে আসে। গরম গরম ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ বা মাংস। সবাই সকাল আটটার সময় অফিসে চলে আসে। দুপুরের খাবার ওখানেই। যাতে আই এস আই ক্যান্টিনে সময় নষ্ট না হয়, তাই এই ব্যবস্থা। বিদেশে নাকি লাঞ্চের সময় অনেক ডিসকাশন হয়। অনি লক্ষ করল এখানে সবাই

ইংরেজিতে কথা বলে, বিশেষ করে ফ্যাকাল্টিরা। অনিকেও ইংরেজি বলা প্র্যাকটিস করতে হবে। সবাই কাজ করে এখানে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত। তার পর ফেরার সময় আই এস আই-এর বাস আছে অথবা সরকারি বাস, ট্রেন, যদি আগে পরে যেতে হয়।

সবার সঙ্গে আলাপ হবার পর বিমলদা অনি আর অশ্রুকে ওদের ঘরের চাবি দিলেন। বললেন, "অনি, ঠিক বারোটার সময় পামেলা তোমার ঘরে আসবেন, কোথাও যেয়ো না।"

অনি চাবি দিয়ে ওর অফিস খোলে। দরজায় নিজের নাম দেখে গর্ব লাগছে। অশ্রুও ঢুকেছে অনির সঙ্গে। অনি নিজের অফিস দেখে মুগ্ধ। টেবিল, চেয়ার, স্টিলের আলমারি— চারিপাশ জুড়ে কাঠের ক্যাবিনেট। সব ফাঁকা। স্পেসিমেন রাখার জন্য। বিরাট জানলা গোটা তিনেক, দেয়াল জুড়ে। বাইরে কৃষ্ণচূড়ার ডাল কাছে এসে পড়ছে। একটা সিঙ্ক। ভেতরে জলের ব্যবস্থা, ওপরে পাখা ঘুরছে। লাইব্রেরি, বিমলদার আর পামেলার অফিস এয়ারকন্ডিশন্ড।

অশ্রু একটা সিগারেট ধরায়। অনিকে একটা দেয়।

"কী রে— কী বুঝছিস?"

"আমার তো ভালই লাগছে এই পরিবেশটা।"

"অনি, আগের থেকেই কমিট করিস না কিছু। আমি ভাবছি জি এস আই-এ জয়েন করব। আমার রিসার্চ করার কোনও ইচ্ছে নেই। বন্ধুবান্ধবেরা সব গেজেটেড অফিসার হবে, সারা ভারত ঘুরে বেড়াবে, আর আমি বরানগরে বসে মাইক্রোস্কোপ-এ চোখ লাগিয়ে বসে আছি, ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছি, আর সন্ধেবেলায় রেস্টুরেন্টে চা আর ডিমের মামলেট খাচ্ছি, এ ভাই আমার পোষাবে না। আমার বাংলোর সামনে সরকারি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে, বাবুর্চি খানসামা রান্না করছে আমার জন্য যতদিন না বউ পাই— এটাই আমার ইচ্ছে।"

একটু পরেই পামেলা দরজায় নক করে ঘরে ঢোকেন। অশ্রু, অনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

"ইউ মাস্ট বি অশ্রু"— পামেলা অশ্রুর দিকে হাত বাড়ায় হ্যান্ডশেক করার জন্য।

"এক্সকিউজ আস্। আমি একটু অনিকে নিয়ে বের হচ্ছি।"

অনি পামেলার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে ক্যাম্পাস দেখতে।

"অনির্বাণ, আই অ্যাম সো গ্ল্যাড টু হিয়ার দ্যাট ইউ উইল জয়েন দি জিওলজি ডিপার্টমেন্ট। ইন্ডিয়া নীডস সায়েন্টিস্ট লাইক ইউ, ব্রাইট, ইয়ং ব্রিলিয়ান্ট অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং। ইউ কুড বি এ টপ নচ প্যালিওন্টলজিস্ট ইফ ইউ গেট প্রপার ট্রেনিং। আই উইল টীচ ইউ নাট্স অ্যান্ড বোল্টস অব প্যালিওন্টলজি।"

জিওলজি বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ওরা আম্রকুঞ্জের ভেতর দিকে হাঁটছে। পামেলার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

"আই উইল ইন্ট্রোডিউস ইউ টু প্রফেসর মহলানবিশ, সেক্রেটারি অ্যান্ড ফাউন্ডার অব দিস স্ট্যাটিসক্যাল ইন্সটিটিউট। হি ইজ এক্সপেক্টিং আস ফর লাঞ্চ। প্রফেসর মহলানবিশ ইজ এ গ্রেট ম্যান অ্যান্ড এ গুড ফ্রেন্ড অব জওহরলাল নেহরু।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা ছাইরঙা বিরাট বাড়ির সামনে এসে পড়ে। এখানে সব-কিছুতেই শান্তিনিকেতনের ছাপ। নামলেখা "আম্রপালী"। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে এই বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। কবিরই নাম দেওয়া এই বাড়িটা। বাড়ির একতলাটা মিউজিয়মের মতো। দেয়ালে কত ফোটোগ্রাফ। মহলানবিশ আর পণ্ডিত নেহরু, মহলানবিশ আর সত্যেন বোস, মহলানবিশ আর হো চি মিন, মহলানবিশ আর চৌ এন লাই, অনি ঘুরে ঘুরে দেখে। বিরাট রবীন্দ্রনাথের আঁকা স্কেচ আর 'বসন্ত' রচনার পাণ্ডুলিপি। পাশে বড় রবীন্দ্রনাথের ছবি। প্রশান্তচন্দ্র ও রানীর বিয়ের ছবি, মাঝে রবীন্দ্রনাথ। অনির খুব ভাল লাগছে এই আশ্রমিক পরিবেশ। পামেলার সঙ্গে দোতলায় উঠে এল অনি। এখানেও বিরাট একটা রবীন্দ্রনাথের ছবি। ছবির দু'পাশে লম্বা পেতলের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। সুন্দর প্রদীপদানি। দেয়ালের নীচটা শেতলপাটি দিয়ে মোড়া। টেবিলের ওপর একটা বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি। সামনেই বিরাট ব্যালকনি। বাইরে দাঁড়ালে আর-একটা ছায়াঘেরা পদ্মপুকুর দেখা যায়। চারিদিকে টবে জিনিয়া, বেলফুল আর ডালিয়ার ভিড়। নীচ থেকে বোগেনভিলিয়ার ঝাড় দোতলায় এসে ফুলের পসরা সাজিয়েছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। নারকেল আর সুপারির সারি। কী অপূর্বই লাগছে অনির। এই শান্ত, আশ্রমিক পরিবেশ।

"লেটস্ গো ইনসাইড।" পামেলা বলেন।

পামেলার কথায় অনি সম্বিত পেল। বিরাট ডাইনিং রুমে ওরা পাশাপাশি বসে। চেয়ারে অনেকে বসে আছেন। মাঝখানেই বিশ্ববিখ্যাত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তাঁর পাশেই ওঁর স্ত্রী রানী। ছিপছিপে চেহারা প্রশান্তর। চোখে সোনার চশমা। অনেকটা যতিশেখরের মতো দেখতে। কালো চুল। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বয়সের একটুকুও ছাপ নেই। রানীকে দেখতে অনেকটা ওর বড়মাসি বনলতার মতন। চারিদিকে অনেক দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী। হঠাৎ মহলানবিশ বাংলায় অনিকে বলে ওঠেন, "পামেলা তোমার কথা বলছিলেন। তোমার মতো ভাল ছেলে পেয়ে বহুদিন পরে ও খুব খুশি। তোমাকে খুব ভাল করে প্যালিওন্টলজিতে ট্রেনিং দিতে চায়। তুমি ওর সঙ্গে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করবে। আমি চাই দেশে ফিরে তুমি ইন্ডিয়ার বেস্ট প্যালিওন্টলজিস্ট হও।"

ব্যাঙ্ককের রাতে ওয়াইন খেতে খেতে অনির পঁচিশ বছর আগেকার কথা মনে

পড়ছে। সেই আম্রপালীতে লাঞ্চ খাবার কথা। সেদিনের সবাই কোথায় হারিয়ে গেছে। বিমলদা মারা গেলেন কানাডায় ফিরে। তার পর প্রশান্তচন্দ্র, তার পর রানী মহলানবিশ। সবার শেষে পামেলা রবিনসন। লন্ডনে থাকাকালীন অনি তাঁদের খুব আপনজন হয়ে যায়।

লাঞ্চের টেবিলে মহলানবিশ একটার পর একটা গল্প বলে চলেছেন। অনিদের টেবিলে আছেন মহলানবিশের উত্তরসূরি— ডক্টর সি আর রাও, আই এস আই-এর ডিরেক্টর। উঁচু দরের স্ট্যাটিসটিশিয়ান, সারা পৃথিবীজোড়া খ্যাতি ডক্টর রাও-এর। উলটোদিকেই বসে আছেন প্রফেসর সিন্‌জ। বেশ কিছুদিন আগে ক্রোমাটোগ্রাফিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর পাশে বসেছেন প্রফেসর কলমোগরভ। নামকরা রাশিয়ান স্ট্যাটিসটিশিয়ান, আরও কত লোক। অনির সবাইকে মনে নেই। একটা গল্পের কথা অনির এখনও মনে পড়ে, মহলানবিশের মুখে শোনা। ছাত্র অবস্থায় প্রশান্ত কেমব্রিজে পড়ার সময় এক সন্ধের সময় ম্যাথেম্যাটিশিয়ান রামানুজমের ঘরে গিয়ে দেখেন শীতে কাঁপছেন। প্রফেসার হার্ডির কাছে রামানুজমের গল্প শুনেছেন। কী দুর্দান্ত প্রতিভা অঙ্কে। রামানুজম কোনওদিন কলেজে পড়েননি। হার্ডিই রামানুজমকে নিয়ে এসেছেন কেমব্রিজে। মহলানবিশের বয়সি হবেন রামানুজম। কিন্তু বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিছানায় কম্বলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে অঙ্ক করছেন। চারিদিকে বরফ পড়ছে। ঘরের ভেতর এত ঠান্ডা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান মহলানবিশ। ঘরের ভেতরে যে একটা হিটার আছে গরম করার জন্য রামানুজম জানতেন না। মহলানবিশই হিটারটা চালিয়ে দিলেন। বছরের পর বছর এই শীতে কষ্ট পেয়েছেন রামানুজম। কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলেননি। এর পরে দেশে ফিরেই বছর খানেকের মধ্যে রামানুজম মারা যান মাদ্রাজে। রেখে গেলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভার ছাপ গণিতশাস্ত্রে। এখনও লোকেরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় রামানুজমের অঙ্কের ফর্মুলার তাৎপর্য ভেবে।

প্রশান্ত মহলানবিশ গল্প করে চলেন— রবীন্দ্রনাথের কথা, শান্তিনিকেতনের কথা, নেহরুর কথা। অনি মুগ্ধ হয়ে গল্প শুনছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভার নেহরু সম্পূর্ণ মহলানবিশের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে মুসোলিনীর প্রপাগান্ডার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন প্রশান্ত ও রথী ঠাকুর। গল্প বললেন সত্যেন বোসের। কীভাবে মেঘনাদ সাহা ও সত্যেনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন আইনস্টাইন-এর পেপারগুলো জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই বই প্রথম প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধ লিখেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র নিজেই। আই এস আই-এর প্রেসিডেন্ট করেছেন সত্যেন বোসকে। দু'জনের মধ্যে বহুদিনের হৃদ্যতা।

এর মধ্যে ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ইংরেজ ভদ্রলোক ঢুকলেন।

"সরি প্রশান্ত, আই অ্যাম লেট ফর লাঞ্চ।"

পামেলা আস্তে আস্তে অনিকে বলেন, "এঁর নাম জে বি এস হলডেন। খুব নামকরা বিজ্ঞানী। উনি আমারও প্রফেসর ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ছেড়ে এখন পুরোপুরি ভারতীয়। অনির রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র কথা মনে পড়ল। হলডেন এখন আই এস আই-এর অধ্যাপক, শীঘ্র ভুবনেশ্বরে চলে যাবেন। হলডেন আর ওঁর বউ হেলেন ওখানে একটা ইন্সটিটিউট খুলছেন জেনেটিক্স-এ। প্রফেসর হলডেন ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য। শিবসংহিতা মুখস্থ। পামেলার মতো হলডেনও ভারতীয়দের নিয়ে একটা বিজ্ঞানের ইন্সটিটিউট খোলার চেষ্টা করছেন।

লাঞ্চের পর পামেলা মহলানবিশের কাছে এসে বললেন, "প্রশান্ত, আই উইল টেক অনির্বাণ টু জিওলজি ইউনিট। থ্যাঙ্কস ফর দি লাঞ্চ। আই ক্যান টেল ফ্রম হিজ ফেস দ্যাট অনির্বাণ এনজয়েড ইয়োর অ্যানিকডোট্স।"

প্রফেসর মহলানবিশ অনির হাত ধরে বলেন, "খুব ভাল লাগল তোমাকে দেখে। আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি আই এস আই-এ জয়েন করেছ বলে। আমার হাতে গড়া এই ইন্সটিটিউট। তোমার মতো ইয়ং ট্যালেন্টেড ছেলে-মেয়েদের দিয়ে আমার ইন্সটিটিউট আরও বড় করতে চাই। আমার এখন অনেক বয়স হল। বাহাত্তর পেরিয়ে গেছে। আমরা তো অনেক করলাম। এবার তোমাদের পালা। স্বাধীন ভারতে তোমাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক। তোমাদের ওপর আমাদের অনেক আশা ভরসা। নতুন ভারত গড়তে বেশ-কিছু সত্যেন বোস, বেশ-কিছু রামানুজম, বেশ-কিছু মেঘনাদ সাহা দরকার। বিজ্ঞানই অন্ধকার দূর করতে পারে। ভারত বিরাট দেশ, সমস্যা অনেক। চারিদিক অশান্ত। ভাষার সংঘাত, ধর্মের সংঘাত, বিদেশি আক্রমণ, খরা, বন্যা, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব— সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে ভারত যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, যদি না তোমরা হাল ধরো। আন্দোলন করে কিছু হবে না। কর্মী দরকার। যারা রাস্তা বানাবে, ছাত্র তৈরি করবে, ড্যাম বানাবে, ফ্যাক্টরি বানাবে, হসপিটাল তৈরি করবে, রোগ, কুসংস্কার দূর করবে, হাজার হাজার লোকের সেখানে চাকরি হবে, গ্রামেগঞ্জে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, ইলেকট্রিসিটি হবে। মাঠে মাঠে ফসল। তোমাদের ওপর অনেক দায়িত্ব অনির্বাণ।"

অনি বলে, "আমার খুব ভাল লাগছে এখানকার পরিবেশ। ঠিক করেছি আমি কাজ শুরু করব সামনের মাস থেকে।"

পামেলা অনিকে জিওলজি ইউনিটে পৌঁছে দিয়ে যান। আম্রপালী থেকে ফিরে এসে অনি দেখে অশ্রু আমিনবাবুর সঙ্গে গল্প করছে। অশ্রু বলে, "চল ফিরে যাই। মেট্রোতে একটা সিনেমা দেখে আসি।" এর মধ্যে বিমলদা এসে উপস্থিত। অনিকে দেখে বলে ওঠেন, "কেমন লাগল প্রফেসর মহলানবিশকে?"

"খুব ভাল লাগল। মনে হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ এখানে বাঁধা পড়ে গেছে।"

বিমলদা বলেন, "সি ইউ সুন, অনি। অশ্রু, তুমিও অনির সঙ্গে চলে এসো আই এস আই-তে। দু' বন্ধু ভাল করে রিসার্চ করবে এই নতুন পরিবেশে।"

অশ্রু আর অনি বি টি রোডে আসতেই একটা ফাঁকা বাস পেয়ে উঠে পড়ে। দু'জনে পাশাপাশি দুটো সিট পেয়ে যায়। অনি আম্রপালীর সব গল্প বলে। অশ্রু শুনে বলে, "শালা, তোকে দিয়ে আমাকে টোপ ফেলছে। তোকে ওদের দরকার। ভাবছে আমি এখানে এলে তোর আর বাইরের দিকে যাবার ইচ্ছে থাকবে না। আমি এক্সট্রা, ফাউ। সিরিয়াসলি বলছি অনি, ভেবে দ্যাখ, আমাদের বন্ধুরা জি এস আই-এ জয়েন করছে গেজেটেড অফিসার হয়ে। দু' হাজারের ওপর মাইনে, প্রমোশন, এ ছাড়া কতরকমের বেনিফিট। আমরা সেখানে রিসার্চ স্কলার হিসেবে যোগ দেব চারশো টাকায়। ডক্টরেট হতে প্রায় ছ' বছর লাগবে। তার পর প্রথম চাকরি। লেকচারার হিসেবে। এর মধ্যে আমাদের সহপাঠীরা প্রমোশন পেয়ে ডিরেক্টর হয়ে গেছে। এখানে জয়েন করার কোনও মানে হয় না।"

অনি বলে, "প্রথম কয়েকটা বছর আমাদের কষ্ট করতে হবে ঠিকই, কিন্তু এরকম রিসার্চ করার সুযোগ ভারতে আর কোথাও আছে কি? এখানে ফ্যাকাল্টি হলেও খুব একটা পড়াবার দায়িত্ব নেই। য়ুনিভার্সিটিতে পড়াতে অনেক সময় লাগে, রিসার্চ করার সময় কম। এরকম ফুল-টাইম রিসার্চ করার সুযোগ কোথায় পাবি এই ভারতবর্ষে?"

অশ্রু কিছুতেই অনির সঙ্গে একমত হতে পারছে না। ও সারাজীবন আই এস আই-এ কাটাতে নারাজ। মেট্রো সিনেমার কাছে দোতলা একটা রেস্তোরাঁয় দু' বন্ধু বসে। বহুদিন এখানে ওরা আড্ডা মেরেছে। অশ্রু খুব উত্তেজিত। অনিকে বোঝাতে হবে। চিরকালই অনি ইমোশন্যাল। কেমন যেন একটা স্বপ্নের জগতে ও থাকে। বাইরের জগৎটা অনেক কঠিন, অনেক নিষ্ঠুর। অনি মানতে চায় না। জীবনে ও দেনাপাওনা করতে নারাজ।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে অশ্রু অনিকে বলে, "দ্যাখ অনি, এই ভুলটা করিস না। জিওলজিস্ট বলে আমাদের এখন কত সুযোগ সুবিধে। যে-কোনও জায়গায় ভাল চাকরি পেতে পারি। এ সুযোগ তো চিরকাল থাকবে না। আই এস আই-এ তুই কী দেখলি যে ওখানে যাবি বলে মন ঠিক করে আছিস?"

অনি বলে, "তুই তো আম্রপালীতে যাসনি, বুঝবি না। সারাজীবন যাঁদের লেখা বইয়ে পড়ে এলাম, তাঁদের চোখে দেখে, কথা শুনে মনটা ভরে গেছে। টাকাপয়সা দিয়ে কী হবে।' শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর পড়িসনি?—

মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।"

অশ্রু রেগে বলে, "বুঝলি অনি, বেসিক্যালি তুই তোর বাবার মতো। শুনেছি

মেসোমশাই পি সি রায়ের কথা শুনে আই সি আই-এর চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য চিরকাল তোরা ছোটবেলা দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছিস। কোনও দরকার ছিল এই বোকা আদর্শের? এটা এক ধরনের দুঃখবিলাস। তুই মহলানবিশের কথা শুনে দেরাদুন বা হায়দ্রাবাদের চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছিস। এরকম সুযোগ কেউ হারায়? তোর মতো চাকরি পেলে আমি এই মুহূর্তেই চলে যেতাম। তোরা সত্যিই বোকা, আদর্শবাদী। তোরা স্বপ্ন দেখিস পৃথিবীটাকে নতুন করে সাজাবার। ইডিয়সি রান্‌স ইন দি ফ্যামিলি।"

অনি উইলস্-এর সিগারেটে জোর টান দিয়ে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' থেকে প্রিয় ছত্রটা মুখস্থ বলে:

"মিনিসাহেব, আমি ইডিয়টই বটে!... জগতে আমার মতো মূর্খরাই তো জীবনকে করেছে বিচিত্র; সুখেদুঃখে অনন্ত মিশ্রিত।... হৃদয় নিংড়ানো অশ্রুধারায় সংসারকে করেছে রসঘন, পৃথিবীকে করেছে কমনীয়।... জগতে বুদ্ধিমানেরা করবে চাকরি, বিবাহ, ব্যাঙ্কে জমাবে টাকা, স্যাকরার দোকানে গড়াবে গয়না; স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা নিয়ে নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করবে স্বচ্ছন্দ, সচ্ছলতায়।"

দুর্বল যুক্তি। অশ্রু বুঝল অনি ঠিক করে ফেলেছে ও আই এস আই-তে জয়েন করবে। অনির সঙ্গে আর দেখা হবে না ভাবতেও খারাপ লাগছে। ও ঠিক করেছে জি এস আই-এ জয়েন করবে। অন্যান্য বন্ধুদের মতো চাকরি নিয়ে চলে যাবে শ্রীনগরে বা চণ্ডীগড়ে। অনি পড়ে থাকুক বরানগরে। কলকাতার ভিড়ে কিছুদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়বে অনি। তখন আপশোস ছাড়া উপায় নেই। কেমন যেন সুর কেটে গেছে। সেদিন আর সিনেমা দেখা হল না। দু' বন্ধু বাসে উঠে দু'দিকে চলে গেল।

১১

অনি চারিদিক তাকিয়ে দেখে। ব্যাঙ্ককের ডাইনিং হল একদম ফাঁকা। রাত বারোটা বেজে গেছে। ও একাই বসে ডাইনিং হলে জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে। তিরতির করে ঝরনার জলের শব্দ আসছে। রেড ওয়াইন খেতে খেতে পুরনো দিনের কথা ভাবছে। নিজের জীবনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় পুরনো ঘটনাগুলো সাজানো যায়। অনি ভাবছে মঞ্জুবীথির কথা। ভাই-বোনদের কথা। সর্বাণীর কথা। ওরা তখন সব কী করত? নিজের জীবনের ক্যালেন্ডারের স্মরণীয় ঘটনা ভাবছে।

প্রায় এক বছর হয়ে গেছে অনি আই এস আই জয়েন করেছে। অশ্রুও থেকে গেল আই এস আই-এ। মনে পড়ছে ইন্দ্রর কথা। ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি। ইন্দ্রকে নিয়ে অনি গেছে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করাতে। ইন্দ্রর মাথাটা

চিরকালই পরিষ্কার। প্রচণ্ড ফাঁকিবাজ পড়াশুনার ব্যাপারে। গান-বাজনা, আড্ডাতে বেশি সময় কাটে ইন্দ্রর। তবু ভালভাবে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করল ইন্দ্র। আনন্দশেখরের ইচ্ছে ইন্দ্র ডাক্তারি পড়ুক। ফিজিওলজি অনার্স নিয়ে ইন্দ্র ভর্তি হল প্রেসিডেন্সি কলেজে। অনি ইন্দ্রকে নিয়ে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় নিয়ে যায়। মেডিক্যাল কলেজ ঘুরিয়ে দেখায়। সবশেষে নিয়ে আসে কফি হাউসে। ইন্দ্র তখন গান-বাজনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। কফি খেতে খেতে অনি ইন্দ্রকে বলে—

"দ্যাখ ইন্দ্র, আমার ডাক্তারি পড়া হল না মামাবাবুর জন্য। তুই একটা ডাকাবুকো ছেলে। তোর ভয়ডর নেই। ঝট করে সাপ ধরিস, ব্যাঙ ধরিস। বাবার ইচ্ছে তুই একজন নামকরা সার্জন হবি। বাড়িতে একজন ডাক্তারের দরকার।"

ইন্দ্র হেসে বলে, "দাদা, তোদের সব গতানুগতিক চিন্তাধারা। নতুন কিছু ভাবার চেষ্টা কর। তোদের মতে সবাইকে হয় ডাক্তার নয় ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। এ ছাড়া তোরা অন্য কিছু ভাবতে পারিস না। এমন হতে পারে আমি পড়াশুনা ছেড়ে গানবাজনা করব অথবা ঋত্বিক ঘটকের মতো ফিল্ম ডিরেক্টর হব। পড়াশুনাটা আমার লাইন নয়।"

"বাবার কাছে বলে দেখিস, কেমন সাহস আছে তোর। পড়াশুনা ছেড়ে দিলে বাবা ঠ্যাঙাবে।"

"আই ডোন্ট কেয়ার। আমাকে দিয়ে তোরা খুব একটা আশা করিস না। আমি ভাবতেও পারি না আমার চেম্বারের পাশে লেখা থাকবে— 'এখানে মলমূত্র পরীক্ষা হয়।' অসম্ভব। বুঝলি দাদা, আমি একটা নতুন ধরনের ব্যান্ড তৈরি করব, বীটল্‌স রোলিং স্টোন— এদের মতো। বাংলা প্যানপেনে গান ভাল লাগে না— 'সমাধি'পরে মোর জ্বেলে দিয়ো।' বাংলায় শুধু হাফসোল খাওয়া গান।" ইন্দ্রর কথাবার্তা এইরকম। অনি কফি হাউসের সেইদিনের কথা ভাবে। ইন্দ্র ইচ্ছে করলে খুব ভাল ডাক্তার হতে পারত। কিন্তু ইন্দ্র হতে চায়নি ডাক্তার। ওর ভাল লাগত বোহেমিয়ান বাউন্ডুলে জীবন। প্রেসিডেন্সি কলেজ শেষ করে ইন্দ্র নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ইন্দ্র যে প্রাণে বেঁচে থাকবে সেই দুর্যোগময় কয়েকটা বছর— সেটাই বিরাট পাওয়া বাড়ির লোকজনের কাছে।

১৯৬৫ সালের আরও কিছু কথা অনির মনে পড়ে। মনে পড়ে ওর দিদি কেয়ার বিয়ের কথা। কেয়ার বিয়ের জন্য আনন্দশেখর উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁর চাকরির বেশিদিন নেই। কেয়ার বিয়ে হয়ে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্তি। অন্য ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে ভালভাবেই পড়ছে। কেয়া বি এ পাস করে বাড়িতে বসে আছে কিছু বছব। একটার পর একটা বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। কিন্তু কিছুতেই পাত্রপক্ষের পছন্দ হচ্ছে না কেয়াকে। অনি অনেক সময় ভাবী পাত্রদের নিয়ে রেস্টুরেন্টে ভাল খাবার খাইয়েছে, কথা বলে রাজি করাবার চেষ্টা করছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। অনির বিরক্ত লেগে গেছে সম্বন্ধ করে বিয়ের

গতানুগতিক নিয়মকানুন। কেয়ার অবস্থা আরও খারাপ। এ যেন বাজারে সওদা করতে এসেছে পাত্রপক্ষ। আলু পটল কেনার মতো। একটা বিয়ে মোটামুটি ঠিক হলেও শেষ মুহূর্তে ভেঙে গেল প্রচুর যৌতুকের জন্য। আনন্দশেখরের সমস্ত জমানো রিটায়ারমেন্টের টাকা দিয়েও সেই যৌতুক মেটানো সম্ভব নয়। পাত্র সামান্যই চাকরি করে কিন্তু দাবি-দাওয়া প্রচুর। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হতেন হেমছায়া। আনন্দশেখর আশ্বাস দিয়ে বলেন, "কিছু ভেবো না হেম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেয়ার খুব ভাল বিয়ে হবে।"

হলও তাই আকস্মিকভাবে। একদিন চৌরঙ্গি পাড়ায় কেয়ার এক কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল অনির। বেশ-কিছুদিন হল বিয়ে হয়েছে মিমিদির। ঝলমলে শাড়ি পরা, হাতে কাগজের বড় ব্যাগ। কিছু কেনাকাটা করেছে।

"মিমিদি, কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?"

"আরে অনি, কেমন আছিস? তোর কথা মাঝে মাঝে কেয়া বলত। উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইউ। হাতে সময় আছে? বহুদিন কেয়ার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যাব যাব করে আর যাওয়া হয়নি তোদের বাড়ি। আমরা বম্বেতে চলে যাচ্ছি সামনের মাসে। কিছু কেনাকাটা করতে এ পাড়ায় এসেছিলাম। চল একটু রেস্টুরেন্টে বসি। ফ্লুরিতে যাবি?"

দু'জনে মিলে রেস্টুরেন্টে ঢোকে। প্যাটিস আর কফির অর্ডার দেয় মিমিদি।

"মেসোমশাই, মাসিমা কেমন আছেন রে?"

"ভালই। তবে দিদির বিয়ের জন্য খুব চিন্তিত। ভাল কথা মিমিদি, তোমার তো কত বন্ধুবান্ধব আছে, হাই সোসাইটিতে মেশো। দিদির একটা বিয়ের সম্বন্ধ দেখে দাও-না? একটার পর একটা সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে, দিদি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড। মা-বাবা চিন্তিত।"

"আমাকে একটু ভাবতে দে। তোরা তো আবার বামুন। জাতফাতের ব্যাপার আছে, তাই না?"

মিমিদি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, "আমাদের পাশেই এক ভদ্রমহিলা ডাক্তার থাকেন বাটানগরে। ভদ্রমহিলা তাঁর ভাইয়ের জন্য একটা ভাল ঘরের পাত্রী খুঁজছেন। ওঁরা খুবই বনেদি ঘরের। ভবানীপুরের আশুতোষ মুখার্জির কীরকম আত্মীয়। পূর্ণ সিনেমার কাছে বিরাট বাড়ি। পাত্র ইন্ডিয়ান নেভিতে ছিল। তার পর মার্চেন্ট নেভিতে জয়েন করে সারা পৃথিবী ঘুরছে। এখন দেশে ফিরেছে। তোরা যদি সত্যি ইন্টারেস্টেড থাকিস আমাকে ফোন করিস বাড়িতে। এই আমার ফোন নাম্বারটা।" ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কাগজে ফোন নাম্বার লিখে দিল মিমিদি।

"অনি, তুই মাসিমা-মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আমাকে কালকের মধ্যেই জানা। আমিও এর মধ্যে পাত্র সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছি। আমাকে কালকের মধ্যেই জানাবি। তেমন হলে আমি তোদের বাড়িতে গিয়ে কেয়ার সঙ্গে কথা বলব।"

অনি সন্ধেবেলা মা ও দিদির কাছে মিমিদির প্রস্তাব জানায়। কেয়াকে ম্লান দেখায়। বলে, "অনি, তোদের সবাইকে আমি ট্রাবল দিচ্ছি। কী করব বল। আমি তো মা'র রূপ নিয়ে জন্মাইনি যে কেউ একবার দেখেই পটে যাবে। আমার বিয়ে হতে সময় লাগবে রে।" হেমছায়া ও আনন্দশেখর মিমিদির প্রস্তাবে রাজি। কলকাতার বনেদি ঘটি পরিবারের সঙ্গে বরিশালের বাঙালদের বিবাহ সম্বন্ধে নতুনত্ব আছে। হেমছায়া বলেন, "মিমিকে তাড়াতাড়ি একটা ফোন করে দে অনি। বিয়ে আর চাকরির ব্যাপারে কার ভাগ্য কোথায় আছে কে জানে?"

অনি মিমিদিকে ফোন করে। মিমিদি এর মধ্যে অনেক খবর নিয়েছে।

"শোন অনি, কালকে তোদের বাড়িতে আসছি দুপুরবেলা। ওখানেই খাব। কেয়ার সঙ্গে অনেক কথা আছে। যদি পারিস তুই আই এস আই থেকে বিকেল বিকেল ফিরিস। তোরও একটা মতামত দরকার।"

পরের দিন বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখে কেয়া আর মিমিদি খুব কথা বলছে। অনিকে দেখে মিমিদি বলে—

"শোন অনি, সামনের রোববার হবু পাত্র সন্দীপ আর তার ডাক্তার দিদি সুস্মিতা দেখতে আসবে কেয়াকে। সন্দীপের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব তোর।" কেয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, "খুব স্বাভাবিক থাকবি কেয়া। সন্দীপের মা নেই। বাবা বিরাট অ্যাডভোকেট। সন্দীপ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। ওরা অনেক ভাই-বোন— দু' ভাই বিদেশে। ওদের মা মারা গেছেন বছর দশেক হল। ভবানীপুরে বিরাট বাড়ি। সন্দীপের বাবা সব ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি করে দিয়েছেন পাশাপাশি। সারা পৃথিবী ঘুরে সন্দীপ এখন ঘর বাঁধতে চায় কলকাতায়। টাকা-পয়সা দাবি-দাওয়া কিচ্ছু নেই। সন্দীপের পছন্দ হলেই এই বিয়ে হয়ে যাবে। তোদের সব কথা খুলে বলেছি। ওরা খুব উৎসাহ দেখিয়েছে। মনে হয় বিয়েটা হয়ে যেতে পারে। কেয়া, একটা কথা বলি, কিছু জিজ্ঞেস করলে তুই ক্যাট্‌ক্যাট্ করে উত্তর দিস না। সুন্দর করে কথা বলিস। ওদের জমিদারি আছে সুন্দরবনে। আমরা একবার পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। দারুণ জায়গা।"

রোববারের বিকেলে সন্দীপ আর সুস্মিতা দেখতে এসেছেন কেয়াকে। সুস্মিতাই একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর চালিয়ে এসেছেন। সুস্মিতার স্বামী বাটা কোম্পানির ম্যানেজার। সুস্মিতা বাটানগরে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন। ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা সুস্মিতার। খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে আপন করে নিলেন। সন্দীপ মজার মজার গল্প করছেন দেশ-বিদেশের। হেমছায়াকে দেখে খুব ভাল লাগছে— সন্দীপের নিজের মায়ের মতো নাকি দেখতে। ইন্দ্র গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিল। কেয়া একটু গম্ভীর। অনি কেয়ার কাছে ফিসফিস করে বলে—

"এই দিদি, স্বাভাবিক থাক।" মিমিদির কথা মনে করিয়ে দেয়। হেমছায়ার গান শুনে সুস্মিতা ও সন্দীপ মুগ্ধ। সবশেষে কেয়ার পালা। সন্দীপের অনুরোধে কেয়া

একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইল। সঙ্গে বেসুরো গলায় সন্দীপও গাইল কেয়ার সঙ্গে। গানের শেষে কেয়ার গানের তারিফ করল সন্দীপ।

রাত এগারোটার পর সুস্মিতা ও সন্দীপ বিদায় নিলেন। সুস্মিতা হেমছায়াকে ডেকে বললেন,

"মনে হচ্ছে আমার ভাইয়ের পছন্দ হয়েছে কেয়াকে। এখানেই বিয়ে হবে। আপনারা একটা শুভদিন দেখে রাখুন। আমরা তাড়াতাড়ি ভাইয়ের বিয়ে দিতে চাই।"

সুস্মিতা ও সন্দীপ চলে গেলে হইচই পড়ে গেল বাড়িতে। এত আনন্দ বাড়িতে বহুদিন দেখেনি অনি। সবার জন্য চা বানাতে বলেন আনন্দশেখর। "আমার মেয়ের এমন বড় ঘরে বিয়ে হবে কখনও ভাবিনি। কেয়া, কাছে আয়। পছন্দ হয়েছে সন্দীপকে?"

ইন্দ্র দিদিকে ঠাট্টা করে বলে, "কী রে দিদি, বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হলে আমাদের মতো গরিব ভাইদের একটু ক্যাশ কড়ি দিস। বড়ই টানাটানি চলছে রে।"

পরের দিন সুস্মিতা মিমিদিকে নিয়ে হাজির। সন্দীপের পছন্দ হয়েছে কেয়াকে। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চান ভাইয়ের। সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন সামনের রোববার ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িতে। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান সবাইকে। হেমছায়ার দিকে তাকিয়ে বলেন—

"মাসিমা, যদি আপত্তি না থাকে সামনের রোববার আমি আসব আপনাদের সবাইকে নিয়ে যেতে। বাবার সঙ্গে আলাপ হলে ভালই লাগবে আপনাদের। মা'র মৃত্যুর পর আমাদের বাড়িতে কোনও উৎসব হয়নি। কেয়া যদি আবার বাড়িতে আনন্দ ফিরিয়ে আনতে পারে।"

এত তাড়াতাড়ি কেয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে হেমছায়া ভাবতে পারেননি। রোববার বিকেলে সুস্মিতা সবাইকে নিয়ে গেলেন কালীঘাট রোডে পূর্ণ সিনেমার ঠিক পেছন দিকটায়। বিরাট চারতলা বাড়ি। সামনে বিদ্যাসাগরের মূর্তি। এলাহি ব্যবস্থা করেছেন সুস্মিতা। হেমছায়া ঘুরে ঘুরে চারতলা বাড়িটা দেখেন আর মনে মনে বাস্তুহারা কলোনির দরমার বাড়ির সঙ্গে তুলনা করেন। শ্বেতপাথরের মেঝে। চারিদিক খোলামেলা। বাইরের ব্যালকনি থেকে রাস্তা দেখা যায়। কত গাড়ি আসছে যাচ্ছে। ছাদ থেকে দেখা যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়ার ব্রিজ, টাটা সেন্টার। ঠিক কলকাতার বনেদি পাড়ার মাঝে বাড়িটা। সন্দীপের বাবা খুবই সজ্জন লোক। হাইকোর্টের নামকরা অ্যাটর্নি। দারুণ অমায়িক ব্যবহার। সুন্দরবনে বিরাট জমিদারি। সেখান থেকে আসে চাল, ভেড়ির মাছ। হেমছায়াকে অনুরোধ করলেন রবীন্দ্রসংগীত গাইতে। গানের পর অনিকে বললেন, "জান অনির্বাণ, সুখে-দুঃখে আমি রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্বের গানগুলি পড়ি। মনে হচ্ছে উপনিষদের কথা কবি গানে বেঁধেছেন। কী গভীর জীবনবোধ। গীতবিতানের এই প্রথম পর্বটা সবসময় কাছে রাখবে। এর তুলনা হয় না বিশ্বসাহিত্যে।"

সন্দীপের ছোট দু' ভাইয়ের সঙ্গে ইন্দ্র জমে গেছে। সবাই মিলে খুব হইচই করল। ইন্দ্র গান শোনাল সবাইকে। মজার মজার গল্প করে মাতিয়ে রাখল সবাইকে। প্রচুর খাওয়াদাওয়া হল।

খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেল কেয়ার ধুমধাম করে। আনন্দশেখর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সন্দীপের সঙ্গে শালাদের দারুণ খাতির হয়ে গেল। সবাইকে নিয়ে মাঝে মাঝে পার্ক স্ট্রিটের অভিজাত রেস্তোরাঁয় যায়। হেমছায়া ও আনন্দশেখর কেয়ার প্রাচুর্যে ও স্বাচ্ছন্দ্যে খুব খুশি। কেয়া যখন মঞ্জুবীথিতে আসে প্রচুর খাবার-দাবার নিয়ে আসে। মা'র জন্য নিত্যনতুন শাড়ি, খেয়ার জন্য স্কার্ট। ভাইদের দিত ক্যাশকড়ি।

দুর্গোপুজো শুরু হয়েছে। সপ্তমীর সন্ধেবেলা অনি বাইরে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ মঞ্জুবীথির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। অনি ছাড়া সব ভাইবোনেরা বেরিয়ে গেছে ঠাকুর দেখতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। দিদিকে দেখে অনি খুশি। ঝলমলে শাড়ি আর সোনার গয়নায় ভালই দেখাচ্ছে। কলোনির কথা মনে পড়ল অনির। কেমন রোগা আর লম্বা ছিল কেয়া। মনে পড়ল ছেঁড়া ফ্রক পরে অনিকে নিয়ে যাচ্ছে আম কুড়োতে কালবৈশাখীতে। সেই হাইল্যান্ডে বিস্কুট বেকারিটা। আজ যেন কেয়ার ঐশ্বর্য উপচে পড়ছে। অনেক জিনিসপত্র আর খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে কেয়া। অনি সব আস্তে আস্তে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে ভেতরে রাখল। হেমছায়া রান্নাঘরে পিসিমার সঙ্গে নানারকম মিষ্টি তৈরি করছিলেন বিজয়ার জন্য। প্রচুর লোক দেখা করতে আসে বিজয়ার দিন। কেয়াকে দেখে হেমছায়া বলে ওঠেন,

"কী রে কেয়া— সব ভাল তো? সন্দীপ কোথায়? ও আসেনি?"

"না মা, ও এখন আবাদে, সুন্দরবনে। ওখানে বিরাট করে পুজো হয়। তিনরাত ধরে যাত্রা হবে। আমি কাল ভোরেই চলে যাব ওখানে। পুজোর মধ্যে দেখা হবে না, তাই একটু দেখা করতে এলাম। বাবা কোথায়?"

"এই একটু কাছেপিঠে বেরিয়েছে হাঁটতে। এক্ষুনি ফিরে আসবে।"

কেয়া অনির দিকে তাকিয়ে বলে, "কী রে অনি, তোর কী খবর? শুনলাম আমাদের পাড়ায় সর্বাণীদের বাড়িতে তুই নাকি প্রায়ই যাস। আমাদের বাড়িতে একটু ঘুরে যেতে পারিস না? দিদিকে ভুলে গেলি?"

হেমছায়া বলে ওঠেন, "এই অনি, যা না দিদিকে একটু পাড়ার ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে আয়। ট্রামডিপোর কাছে এবার বিরাট করে মণ্ডপ করেছে, দারুণ প্রতিমা। কেয়া, যাবি অনির সঙ্গে? এর মধ্যে তোর বাবা ফিরে আসবে।"

"সেই ভাল অনি। আমার এবার ঠাকুর দেখা হয়নি। চ' তোর সঙ্গে ঘুরে আসি। তোর তো দেখা পাওয়াই ভার। সবাই যখন তোর প্রশংসা করে, আমার একটু হিংসে হয়। কিছুদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে হবে।"

অনি বলে, "চল দিদি, তোকে কিছু ক্লাসিক ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে আসি। তোদের সপ্তর্ষিশ্রীর মতো এখানে এত জাঁকজমক নেই আমাদের বেহালায়। এখানে আছে আন্তরিকতা, প্রাণের অর্ঘ্য।"

দিদিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনি। হাঁটা পথেই। চেনাজানার সঙ্গে দেখা হয় কেয়ার। কুশল বিনিময় চলে। আর্য সমিতির ঠাকুর দেখাবার পর হঠাৎ কেয়া বলে, "অনি, জানিস তো, আমার শ্বশুরবাড়িতে তোর খুব কদর। শ্বশুরমশাই প্রায়ই বলেন, 'বউমা, তোমার গোল্ড মেডেলিস্ট ভাই আসে না কেন?' তোর সন্দীপদাও তোকে খুব ভালবাসে। বলে, 'দেখো, অনি একদিন বড় সায়েন্টিস্ট হবে'।"

হঠাৎ কেয়া বলে ওঠে, "জানিস অনি, তোকে বিয়ে করার জন্য আমার শ্বশুরবাড়ির দু'জনে খুব পাগল— একজন হচ্ছে আমার বড় ভাগনের শালী, রাখী। খুবই মিষ্টি দেখতে। আর্ট কলেজে পড়ে। এন্টালিতে থাকে। বিরাট বাড়ি। আর-একজন রত্না। লেখক জরাসন্ধের মেয়ে। নিউ আলিপুরে থাকে। দুটোই খুব বনেদি ঘর।"

অনি হাসতে হাসতে বলে, "আমার জন্য যদি দু'জন পাগল হয়েই থাকে, পাগল বউ কি ঘরে আনা ঠিক হবে দিদি? তার পর আবার ওরা বড়লোক। আমি এখন চারশো টাকার স্কলার। নিজেরই চালচুলো নেই— এর মধ্যে আবার বাইরের লোক। আমি এর মধ্যে নেই।"

"সব কথাতেই তোর ইয়ার্কি। সত্যি বল-না অনি। রূপে গুণে দুটো মেয়েই খুব ভাল। তোর তো এখনই বিয়ে করতে হচ্ছে না। বিলেত, আমেরিকায় ঘুরে আয়— তার পর বিয়ে করবি।"

অনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, "দিদি, আমি যদি কাউকে বিয়ে করি, সে সর্বাণী। অবশ্য তোর শ্বশুরবাড়ির মতো ওদের বিত্ত নেই, ঐশ্বর্য নেই। সামান্য টেলিফোন কোম্পানির অপারেটরের মেয়ে। তবুও সর্বাণীর তুলনা হয় না আমার কাছে। আমি সত্যিই ওকে ভালবাসি। ও আমার কাছে অপরূপা।"

কেয়া প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে ওঠে, "অনি, তুই চিরকালের বোকা। সারাজীবন ধরে কষ্ট পাবি। তোর সঙ্গে আমার ঠাকুর দেখার এতটুকু ইচ্ছে নেই।" এই বলে একটা রিকশা ডেকে উঠে বসল। অনি হতভম্ব। কী করবে বুঝতে পারছে না। সুর কেটে গেছে। এখন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। হাঁটতে হাঁটতে পর্ণশ্রীর মাঠে লেকের পাশে এসে বসল। এখানে পুজোর ভিড় নেই, আলোর মালা নেই, মাইকের গান নেই। চুপচাপ, নিঝুম। অনেক রাত ধরে ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের তারা দেখল। এই বিরাট মহাবিশ্বে অনি যে একটু জায়গা পেয়েছে ক্ষণিকের জন্য, এর জন্য সে কৃতজ্ঞ এই চিরস্রষ্টার কাছে। ছোটখাটো তুচ্ছতা, মলিনতা কাছে ঘেঁষতে দেবে না। বুঝতে পারছে বিরাট ঝড় আসছে বাড়িতে। পুরনোর সঙ্গে নতুনের সংঘাত। আদর্শের সঙ্গে

ঐশ্বর্যের। এই বিকিকিনির হাটে নিজের প্রিয়াকে ছোট করবে না।

অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল অনি। ঘরের সব আলো নিভে গেছে। দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকতেই আনন্দশেখরের জলদগম্ভীর গলা শুনতে পেল—

"অনি, এই ঘরে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে।" হেমছায়া ঘরের আলো জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। অনি দু'জনের মুখের দিকে তাকায়। প্রচণ্ড রাগ দু'জনের মুখে-চোখে। আনন্দশেখর বলে ওঠেন, "অনি, কেয়ার মুখে যা শুনলাম, সব সত্যি? তুই নাকি সর্বাণীকে বিয়ে করবি বলে কথা দিয়েছিস?"

অনি আনন্দশেখরকে এরকম রাগতে কখনও দেখেনি। মনে পড়ল সেই কলোনির বাড়িতে অঙ্ক শেখাবার কথা। প্রচণ্ড রাগে চড় মারার পর খাট থেকে পড়ে মাথা ফেটে গিয়েছিল অনির। সারা শরীর কাঁপছে আনন্দশেখরের।

হেমছায়া বলেন, "অনি, সর্বাণীকে বিয়ে করলে আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। এ বিয়েতে আমাদের একদম মত নেই।"

অনি বলে, "সর্বাণী কী দোষ করল? তোমাদের আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে বলো।"

আনন্দশেখর বলেন, "দেখো, এই অসবর্ণ বিয়েতে আমার মত নেই। ওর মা টেলিফোন অপারেটর। খুবই সাধারণ। ওদের কী আছে? কিসের জন্য ওই বাড়িতে বিয়ে করবি?"

"আমরাই বা কী অসাধারণ? কলোনির কথা ভুলে গেলে? তোমরা এত প্রগ্রেসিভ হয়ে হঠাৎ জাত ধর্ম নিয়ে এত মেতে উঠলে কবে থেকে? সর্বাণীর মা সামান্য টেলিফোন অপারেটর হতে পারেন, তবু একা মাথা উঁচু করে কত কষ্ট করে মেয়েকে বড় করছেন, কারও কাছে সাহায্য না নিয়ে। এর কোনও দাম নেই?" রাগে আনন্দশেখর কাঁপতে থাকেন।

"তুই যদি এই অসবর্ণ বিয়ে করিস আমাদের বংশে কলঙ্ক হবে। এই বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। এই মেয়েকে বিয়ে করলে তোর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ থাকবে না।"

"বিয়ের কথা এখন আমি ভাবছি না। সর্বাণী এখনও ছোট। ও কলেজে পড়ুক, বড় হোক, এর মধ্যে আমি বিলেত থেকে ফিরে আসি। তার পর বিয়ে করলে করতে পারি— তোমরা এত চিৎকার চেঁচামেচি করছ কেন?"

হেমছায়া বলেন, "সর্বাণীর আমি কোনও দোষ দেখি না। ও ছোট মেয়ে, ও কী বোঝে? যত দোষ ওর মা'র। কত কষ্ট করে ছেলে বড় করলাম— টুক করে পূর্ণিমা আমার ছেলেকে নিয়ে গেল। আর কি? তোমরা এখন বড় হয়েছ, ডানা গজিয়েছে, এখন আর ঘরের ওপর কোনও টান নেই। যতসব স্বার্থপর। এদের আবার কষ্ট করে বড় করা।"

অনি বাবা-মাকে এভাবে কখনও দেখবে ভাবেনি। ওর মা-বাবার গালাগালি অভিসম্পাত শুনে স্তম্ভিত হয়, ব্যথা পায় মনে। সর্বাণীকে ওঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ছেলের বউ হিসেবে। কী প্রচণ্ড দাম্ভিকতা। এ কি কেয়ার বড়লোক বাড়িতে বিয়ে হবার ফল?

অনি বুঝল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তিক্ততা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল অনি। এই প্রথম মনে হল যে-বাড়ির ছায়ায় ও প্রতিদিন বড় হয়েছে তার দেয়ালগুলো কেমন যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে। অনির প্রচণ্ড রাগ হল কেয়ার ওপর। যত নষ্টের মূল এই কেয়া। ওর বিয়ের জন্য কত কী করেছে অনি। এই তার পরিণতি? বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়ে কেয়া প্রচণ্ড অহংকারী হয়ে গেছে। অভিমান হল মা'র ওপর। হেমছায়াকে চিরকাল দরদী বলে জেনে এসেছে। বাবাকে অনি ভয় পেত। কিন্তু মা'র প্রতি চিরকালই অনির একটা বিশেষ টান ছিল। সব ভেঙে যাচ্ছে। সর্বাণী কতবার এ বাড়িতে এসেছে। তখন অনির মনে হয়েছে বাড়ির সবাই সর্বাণীকে ভালবাসে। সবটাই কি অভিনয়? অনি বুঝতে পারেনি যে সর্বাণী ওর মা-বাবার কাছে এতটা অপ্রিয়। এর পেছনে কেয়ার হাত অনেকটা আছে বুঝতে পারে। কেয়াকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না অনি। সর্বাণীকে ছেড়ে কোনওদিনই থাকতে পারবে না অনি। এরজন্য ও সব-কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

* * *

খুব রাত করে বাড়ি ফেরে ইন্দ্র। ঝলমলে পোশাক। মাথায় বড় চুল। খিদিরপুরের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে একটা ব্যান্ড তৈরি করেছে 'দি আর্জ'। শনি আর রবিবার পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় ওরা গান করে। ইন্দ্রই লিড্ গিটারিস্ট। ট্রিংকা, মুলারোজ, ব্লু ফক্স। রাত বারোটা পর্যন্ত গানবাজনা। তার পর বাড়ি ফেরার পালা। তখন বীট্‌লসদের যুগ। পল ম্যাকার্টনির গান অদ্ভুত গায় ইন্দ্র। 'আর্জ'-ই কলকাতার প্রথম ব্যান্ড। হেমছায়া বুঝতে পারেন ইন্দ্রর অসংলগ্ন কথা। ইন্দ্র ড্রিঙ্ক করা শুরু করেছে। আনন্দশেখর ইন্দ্রর এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা পছন্দ করতেন না। কিন্তু ইন্দ্রকে কথা বলতে গেলে ও উলটো কথা শুনিয়ে দেয়। ইন্দ্রকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। বাড়িতে দিনরাত লোক আসে ইন্দ্রর খোঁজে। ইন্দ্রর পড়াশুনায় মন নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজে ওর গানবাজনার জন্য সব মেয়ের কাছেই ও নায়ক। ইন্দ্র যেন সবার থেকে আলাদা হয়ে গেল। ঈশান আর উৎসব ইন্দ্রকে দেখে ওর শিষ্য হয়ে গেল। অপূর্ব গিটার বাজায় ইন্দ্র। বাড়িতে এখন শুধু ইংরেজি গান, স্প্যানিশ মিউজিক। ঈশান ও উৎসব কাছে পেলে ইন্দ্রর কাছে তালিম নেয়। ইন্দ্র না থাকলে ওর রেকর্ড শোনে। ইন্দ্র এখন সব ব্যাপারে পথ দেখায়। ওর গুণমুগ্ধের সংখ্যা প্রচুর। অদ্ভুত একটা নতুন গানের জোয়ার এনেছে ইন্দ্র। ইন্দ্র এক নতুন উন্মাদনায় মেতেছে। রক্ষণশীল পরিবারের নিয়মভাঙায়

ব্যস্ত। বাউল আর ভাটিয়ালির সঙ্গে পাশ্চাত্যসুরের অদ্ভুত সংমিশ্রণ করে নতুন গানের জোয়ার আনল ইন্দ্র। শুরু হল অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জনে’ রঘুপতির অভিনয় করে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে ও রূপনারায়ণ নন্দন লেনে সর্বাণীর সঙ্গে দেখা করে আসে। আনন্দশেখর বাড়ির সবাইকে বলে দিয়েছেন সর্বাণীর বাড়ির সঙ্গে কেউ যেন যোগাযোগ না রাখে। কিন্তু ইন্দ্রকে নিয়মে বাঁধা যায় না। ইন্দ্র ওই বাড়িতে গিয়ে হাসিঠাট্টা করে সবাইকে জমিয়ে রাখে।

অনি আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজের মধ্যেই থাকে। উইকএন্ডে সর্বাণীদের বাড়িতে যায়। ওকে নিয়ে যায় রবীন্দ্রজয়ন্তী, থিয়েটার, নানা ধরনের কালচারাল ফাংশনে। মঞ্জুবীথিতে সর্বাণী আর আসেনি। এর মধ্যে মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’তে নায়িকার ডাবিং করল সর্বাণী। মৃণাল সেন সর্বাণীদের আত্মীয়, পূর্ণিমার মামা হন। ‘ইন্টারভিউ’র প্রিমিয়ারে অনি, সর্বাণী ও পূর্ণিমা গিয়েছিল। মৃণাল সেন খুব ভালবাসেন সর্বাণীকে। একমাত্র ইন্দ্রই যোগাযোগ রাখে সর্বাণীর সঙ্গে। মঞ্জুবীথির আর কেউ আসে না ওদের বাড়িতে।

অনির চতুর্থ ভাই ঈশান ভর্তি হয়েছে বি ই কলেজে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। একদিন সর্বাণীকে নিয়ে অনি ঈশানের সঙ্গে দেখা করল হস্টেলে। সবাই মিলে খুব হইচই হল। অনি ঈশানকে বলল ওর বিলেত যাওয়া সব ঠিকঠাক। বাড়িতে এখনও খবরটা জানায়নি। দুর্গাপুজোর সময় দিদির সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতার পর অনির বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কমই। খুব ভোর-ভোর বরানগরে চলে যায়। ফেরে রাত করে।

ঈশান চিৎকার করে বলে, “দাদা, বিলেতে যাচ্ছিস? তোর দেখাদেখি আমরাও এক এক করে যাব। কবে যাচ্ছিস?”

“পুজোর ঠিক আগেই। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।”

“পামেলা রবিনসনের সঙ্গে কাজ করবি য়ুনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে, তাই না?” বিকেলবেলা অনি আর সর্বাণী ঈশানের কাছ থেকে বিদায় নিল। ঈশান বাসে তুলে দিল।

“দাদা, কী ভাল লাগছে আমার। তুই আর সর্বাণী হুট করে চলে এসেছিস আমার হস্টেলে। সর্বাণীর জন্য কোনও চিন্তা করিস না। আমি আর মণিদা আছি। আস্তে আস্তে বাবা-মা রাজি হয়ে যাবে। একটু সময় দে।”

ফেরার পথে সর্বাণী বলে, “মাঝে মাঝে ভাবি অনিদা, তোমার সঙ্গে শিমুলতলায় না দেখা হলেই ভাল হত। মা-মেয়ে বেশ ছিলাম। হঠাৎ তুমি এলে আমাদের মাঝে। তোমাকে নিয়ে আমরা দু’জনেই স্বপ্ন দেখলাম। কেমন যেন সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। তোমার বাবা-মা বলেন, আমি নাকি তোমার যোগ্য নই।

কেন আসো আমাদের বাড়িতে। এবার লন্ডনে গিয়ে টুকটুকে মেমসাহেবকে নিয়ে এসো বউ করে। তোমার মা-বাবা খুশি হবেন। আমাদের কথা ভেবো না। মা বলেছে, দিল্লি বা বম্বেতে ট্রান্সফার নেবে যাতে ভবিষ্যতে কোনওদিন তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকে।"

"এসব কথা বোলো না সর্বাণী। এ হচ্ছে প্রবীণের সঙ্গে নবীনের সংঘাত। যুগে যুগে এরকম ঘটনা হয়ে এসেছে। বাবা-মা'র সম্মতি থাক আর নাই থাক, তুমি চিরকালই আমার থাকবে। তুমি আমার 'দুখ-জাগানিয়া ঘুম-ভাঙানিয়া'। আমাদের প্রেম যদি খাঁটি হয়, কোনও বাধা, কোনও প্রলোভন আটকাতে পারবে না।"

কথা বলতে বলতে ওরা রূপনারায়ণ নন্দন লেনে এসে পড়ে। পূর্ণিমা অনিকে দেখে বলে—"কী ব্যাপার অনি, মনে হচ্ছে তোমরা তর্ক করতে করতে এসেছ শিবপুর থেকে?"

"মা, ও বিলেতে চলল। খবরটা নিজের ভাইকে প্রথম দিল, তার পর আমাকে।" আমি হচ্ছি সেকেন্ড প্রেফারেন্স।"

"সত্যি অনি? এর চেয়ে ভাল খবর হয় না। আশীর্বাদ করি তুমি অনেক বড় হও। ফিরে এসে যদি আমাদের খুঁজে না পাও, চিন্তা কোরো না। বাবা-মা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে পছন্দ করে দেবে। অসবর্ণ বিয়ে নাকি সুখের হয় না। বিয়ে করে সবাইকে নিয়ে আনন্দে থেকো। আমাদের কথা ভেবো না। ঠিক করেছি আমি দিল্লিতে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাব। ওখানে নতুন করে বড় করব সর্বাণীকে। কষ্ট হবে ঠিকই তোমায় ছেড়ে থাকতে সর্বাণীর। বিশ্বাস করো অনি, তোমার ওপর কোনও রাগ, কোনও অভিমান নেই। আমার অদৃষ্ট। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম আমি একটা সামান্য টেলিফোন অপারেটর। তোমার বাবা-মা গত সপ্তাহে এসে আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমার পরিচয় সমাজের চোখে। আমরা সমাজের নিচুতলার লোক। তোমরা অনেক ওপরের।" দু' চোখ দিয়ে জল ঝরছে পূর্ণিমার। অনি কিছুই জানত না যে ওর মা-বাবা পূর্ণিমাকে অপমান করে গেছেন। সব ঘটনা শুনে নিজেকেই ছোট মনে হচ্ছে অনির মা-বাবার ব্যবহারে।

থমথমে পরিবেশ পালটানোর জন্য অনি বলে, "সর্বাণী, আমাদের অ্যালবামটা নিয়ে এসো। পুরনো ছবি দেখি সবাই মিলে।"

সর্বাণী অ্যালবামটা নিয়ে আসে। "তোমার সাজানো অ্যালবাম তুমিই দ্যাখো।"

অনি শিমুলতলার ছবি, সর্বাণীর ছবি সব নিজের হাতে এনলার্জ করে অ্যালবামে সাজিয়ে রেখেছিল গত চারবছর ধরে। সবাই মিলে পুরনো ছবি দেখতে বসে। নীলাবরণের সেই ছোট্ট মেয়েটাকে দেখছে ছবিতে। নলডাঙার রাজবাড়িতে, লাট্টু পাহাড়ে, ত্রিকূট পাহাড়ে, লালকুঠিতে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আলিপুর চিড়িয়াখানায়— কত ছবি তুলেছে সর্বাণীর। ছবি

তুলেছে ব্যান্ডেল চার্চে, বেলুড়মঠে। সব ঘটনা মনে পড়ছে অনির।

পরের শনিবার সর্বাণীকে নিয়ে অনি বেরিয়ে পড়ে। পূর্ণিমাকে জানায় ফিরতে রাত হবে। ওরা বাইরে খেয়ে আসবে। ইন্দ্র ওদের নেমন্তন্ন করেছে পার্ক স্ট্রিটের ট্রিংকাতে। ইন্দ্র এখন পার্ক স্ট্রিটের হোটেল আর রেস্টোরেন্টে বাজায়। ওরা আলো-অন্ধকারে ট্রিংকাতে বসে আছে। ইন্দ্রই ওদের নিয়ে গেল টেবিলে। সর্বাণীর পছন্দমতো সব খাবার এল। তার পর হল ওদের ব্যান্ডের গানবাজনা। ইন্দ্র মাইকে বলে, "আই ওয়ান্ট টু ডেডিকেট দিস সং টু মাই ব্রাদার অনি অ্যান্ড ভাবী সর্বাণী।"

মনপ্রাণ দিয়ে গাইল ইন্দ্র। খুব গর্ব লাগছিল অনির ভাইয়ের জন্য। অনি কখনও ইন্দ্রকে ওর ব্যান্ডের সঙ্গে গাইতে শোনেনি। গান শেষ হলে ব্যান্ডের সবাই অনিদের টেবিলে ভিড় করে। বেশ রাত করে সর্বাণীকে বাড়ি পৌঁছে দেয় অনি। সন্ধেটা খুব ভাল কাটল। সর্বাণীও অনেক স্বাভাবিক এখন।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনি লন্ডনে রওনা দিল ডক্টরেট করার জন্য। কাজ করবে য়ুনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনে। এই কলেজে রবীন্দ্রনাথও ভর্তি হয়েছিলেন অল্প বয়সে, ইংরেজি সাহিত্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অনেক কলেজ নিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। ইম্পিরিয়াল কলেজ, কিংস কলেজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স। সব কলেজগুলো লন্ডনের চারপাশে— ছড়ানো ছেটানো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা ঘেরা নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। য়ুনিভার্সিটি কলেজ গাওয়ার স্ট্রিটে, অনেকটা কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের মতো। চারিদিকে বইয়ের দোকান, কফি হাউস, পাব। অনি থাকবে কলেজের হস্টেলে। পামেলা রবিনসন এই য়ুনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক। অনি কাজ করবে পামেলার সঙ্গে।

রাতের দিকে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন ছাড়ে। সকালবেলা ইন্দ্র বলল, "দাদা, আমি সর্বাণী আর পূর্ণিমাদিকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাব। কোনও চিন্তা করিস না। তুই সব গোছগাছ করে নে।"

এয়ারপোর্টে অনেক লোক এসেছিল অনিকে বিদায় জানাতে। অনি শেষ ঝড়ের আভাস পাচ্ছে সর্বাণীকে নিয়ে। মনে হয় দুটো দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। একদিকে মা, বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন। আর-একদিকে ইন্দ্র, অভীক, সর্বাণী আর পূর্ণিমা। বেশ থমথমে পরিবেশ। অনি সর্বাণীর কাছে গিয়ে বলে, "দেখতে দেখতে একবছর কেটে যাবে। কাজ শেষ হলেই কলকাতা ফিরে আসব। চিঠি লিখব ঘনঘন। কোনও চিন্তা করবে না। ভাল করে পড়াশুনা করবে, গান গাইবে। ইন্দ্র আর অভীক তোমাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখবে।"

কাস্টমস অফিসার সর্বাণীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আপনি ওঁর সঙ্গে ভেতরে

যেতে পারেন।” অনি সর্বাণীকে নিয়ে ভেতরে গেল। শেষ কিছু কথা। কাচের ভেতর দিয়ে বাড়ির সবাই অনি আর সর্বাণীকে দেখছে। সর্বাণীর কোমরে একটা ছোট্ট বাটিকের রুমাল গোঁজা ছিল। অনি সেটা তুলে নিল। “এটা আমার কাছে থাক। রুমালটা দেখলে তোমায় মনে পড়বে।”

এবার যাবার পালা। সর্বাণীর কথা ভাবতে ভাবতে এয়ার ইন্ডিয়ায় উঠে পড়ল অনি। প্রচণ্ড গর্জন করে প্লেন আকাশে উঠে গেল।

‘বিদায় সর্বাণী।’ মনে মনে বলে অনি। ‘ভাল থেকো। তোমার জন্য সবসময় আমার মন পড়ে থাকবে কলকাতায়।’

১২

অনি হাতঘড়িতে দেখল রাত দুটো বাজে। এবার উঠতে হয়। বেশ-কিছু লোক ডাইনিংরুমে ঢুকল এত রাতে। নিশ্চয়ই কোনও ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট এসেছে। অনি উঠে দাঁড়ায়। একটানা চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে। অনির চোখে ঘুম নেই। পুরনো দিনের কথা ভাবছে। কাল ভোর দশটায় প্লেন। ন'টার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছনো দরকার। অবশ্য মিনিট দশেক লাগবে হোটেল থেকে টিকিট কাউন্টারে যেতে। মনে হচ্ছে আজ রাতে আর ঘুম হবে না। ঘণ্টা চারেক পথ ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতা। ঈশান নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে আসবে অনিকে নিতে। অনি কিছুতেই ভাবতে পারছে না ইন্দ্র আর নেই। যতবার বিদেশ থেকে কলকাতার ফিরেছে, ইন্দ্র সবসময় এয়ারপোর্টে আসত। এবার আসবে না ভাবতেই অনির দুঃখ উথলে উঠল। ইন্দ্র ছাড়া মা কী নিয়ে থাকবে? কী হবে নিশা, তুলি আর বাপির? ইন্দ্রর কথা ভেবে দু'চোখ ভরে জল আসে অনির।

হোটেলের কুড়ি তলায় ইন্দ্রর ঘর। দরজা খুলে ঢোকে। অ্যালার্ম দেয় সকাল আটটায়, নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। মনে হয় না ঘুমতে পারবে। পুরনো ঘটনাগুলো সাজাতে থাকে। ষাট দশকের শেষ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি। অনির বিলেত যাওয়া, ফিরে এসে সর্বাণীর সঙ্গে বিয়ে, ইন্দ্রর নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া— জেলখাটা, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জব্বলপুরে ভূপালে ইন্দ্রর চাকরি, আকাশের জাহাজে জাহাজে পৃথিবী ঘোরা, ঈশানের বি ই কলেজে পড়া, আর কী কী ঘটনা ঘটেছিল ভাবতে থাকে অনি।

লন্ডন থেকে ফেরার দিন ইন্দ্রই সর্বাণীকে নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছিল। সর্বাণী অনেক বড় হয়ে গেছে। তন্বী, সুন্দরী। এয়ারপোর্টে অনিকে নিতে অনেকে এসেছে— মা বাবা ভাই বোন, বেশ-কিছু বন্ধু— এমনকী কেয়া ও সন্দীপ। লন্ডনে অনির ডক্টরেটের কাজ শেষ হয়ে গেছে— গবেষণা ছাপা হবে বিখ্যাত রয়্যাল

সোসাইটির ট্রানজাকশনে। আনন্দশেখর খুব খুশি। "অনি, তুই আমার স্বপ্ন সফল করলি।" আনন্দশেখর হাসতে হাসতে বলেন।

ইন্দ্র বলে, "দাদা, তুই মা-বাবার সঙ্গে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফের। আমি আর ঈশান সর্বাণীকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। বহুদিন পরে খুব হইচই হবে মঞ্জুবীথিতে। বাড়িটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগত তোর অভাবে।"

সর্বাণী বলে, "অনিদা, তোমাদের বাড়ি যেতে ভয় করছে। এই দেড় বছরে তোমাদের বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। ইন্দ্রদাই মাঝে মাঝে আসত। মিথ্যে কথা বলে আমাকে ক্ষ্যাপাত, তুমি নাকি এক মেমসাহেবকে বিয়ে করেছ লন্ডনে। প্যারিসে নাকি হনিমুনে গেছ। একটার পর একটা গল্প বানিয়ে বলত। ইন্দ্রদা এলে আমাদের খুব ভাল লাগত। তোমার মা-বাবা যদি আবার আমায় অপমান করেন আমি কিন্তু নিতে পারব না।"

ইন্দ্র আশ্বাস দেয় সর্বাণীকে, "আমি যতক্ষণ আছি, কোনও চিন্তা নেই।"

অনি হেসে বলে, "লক্ষ্মণভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে।"

বহুদিন পরে মঞ্জুবীথিতে এসে খুব ভাল লাগছে অনির। মাঝের ঘরে বিরাট ফরাস পাতা। সবাই অনির কাছে লন্ডনের গল্প শুনতে চাইছে। অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এর মধ্যে। আনন্দশেখর রিটায়ার করেছেন সম্প্রতি। আকাশও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে শীঘ্র দেশ-দেশান্তরে বের হবে। সিন্ধিয়া কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে আকাশ। 'জলরত্ন' জাহাজে বের হচ্ছে মাস দুয়েকের মধ্যে। ইন্দ্র ফিজিওলজি অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাস করেছে। এখন পুরোপুরি গানের মধ্যে ডুবে, ওদের ব্যান্ড 'আর্জ' সারা ভারতে নাম করেছে। শীঘ্রই ওরা ব্যাঙালোরে বাজাতে যাচ্ছে। অনি ইন্দ্রর জন্য একটা লাল রঙের ইলেকট্রিক গিটার এনেছে। গিটারটা পেয়ে ইন্দ্র দারুণ খুশি। জোরে জোরে বাজাতে শুরু করে। সঙ্গে ইংরেজি গান, পল ম্যাকার্টনির। দারুণ গাইছে ইন্দ্র। একটার পর একটা বিট্‌লদের— সাইমন আর গারফিংকেলের গান। সবাইকে জমিয়ে রাখছে ইন্দ্র। ইন্দ্র সত্যিকারের মিউজিশিয়ান হতে চায়। গানগুলো লন্ডনে খুব পপুলার। ইন্দ্রর গান শুনে মনে হচ্ছে লাইভ কনসার্ট শুনছে। একটু পরে হঠাৎ গলা গম্ভীর করে ইন্দ্র ঘোষণা করে—

"এবার আমাদের আসরের শেষ শিল্পী সর্বাণী মিত্র— উনি সুচিত্রা মিত্রের প্রিয় ছাত্রী। লন্ডন ফেরত দাদার পছন্দসই রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করবেন সর্বাণী দেবী আজকের সভায়। তার পর শুরু হবে হেমছায়া দেবীর খাদ্য পরিবেশন।"

সবাই হেসে ওঠে। সর্বাণী হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। তবলায় ইন্দ্র। আনন্দশেখর বলেন, "আমার বেহালাটা এনে দাও।"

অনি ভাবছে, এবার বুঝি বরফ গলার পালা। এই প্রথম বোধহয় আনন্দশেখর স্বীকৃতি দিলেন সর্বাণীকে।

সর্বাণী মনপ্রাণ দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইল কয়েকটা। রান্নাঘরে হেমছায়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন দরজার আড়াল থেকে। অনি দেখে মার চোখে জল। অনি ভাবছে, সংসারটা কিছুতেই ভেঙে দিতে দেবে না। সবাইকে নিয়ে ও থাকতে চায়— মা-বাবা, ভাই-বোন, সর্বাণী ও আত্মীয়স্বজন। সর্বাণী এ ঘরের বড়বউ হিসেবে যেন স্বীকৃতি পায়। তার জন্য ও সব চেষ্টা করবে।

লন্ডন থেকে ফিরেই অনির চাকরি হয়ে গেল আই এস আই-এ। লেকচারারের পদ। মাইনেপত্র বেশ ভাল। জি এস আই এ-এর বন্ধুদের মতো মাইনের স্কেল। অশ্রুও থেকে গেছে আই এস আই-তে অনির সঙ্গে সঙ্গে। ওরও গবেষণার কাজ শেষ। বিমলদার কাছেই ডক্টরেট করেছে। বিমলদা হঠাৎ ঠিক করলেন বিদেশে চলে যাবেন পাকাপাকিভাবে। ডিপার্টমেন্ট পলিটিক্সে হাঁপিয়ে পড়েছেন। কানাডা থেকে দারুণ অফার পেয়েছেন। ঘটনাটা এত আকস্মিক কেউ প্রস্তুত ছিল না। যাবার আগে লেকচারারশিপ ঠিক করে দিলেন। বিমলদা চলে যাওয়াতে জিওলজি ডিভিশন টলমল করে উঠল, নেতৃত্ব দেবার লোক নেই। ডক্টর জৈন নতুন হেড হলেন ডিপার্টমেন্টে। লক্ষ্ণৌর লোক, সুন্দর উর্দু বলেন। ফসিল মাছের এক্সপার্ট। উনিও বেশ-কিছুদিন লন্ডনে কাটিয়েছেন পামেলার ডিপার্টমেন্টে। অনির সঙ্গে ডক্টর জৈনের ভাল সম্বন্ধ। গোদাবরী উপত্যকা থেকে যেসব নতুন নতুন ডাইনোসর পাওয়া গেছে, সে-সবের ওপর কাজ করতে বলেন অনিকে। অনি অবশ্য নিজেই অনেক নতুন ফসিল আবিষ্কার করেছে গোদাবরী উপত্যকা থেকে। সে-সব কাজ এখনও বাকি।

অনির জীবনে অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ প্রদেশে প্যালিওন্টলজি ফিল্ড স্মরণীয় ঘটনা। প্রতিবছর শীতকালে দলবেঁধে ওরা ফিল্ড করতে যায় আই এস আই থেকে। সঙ্গে জিপ, তাঁবু, রান্নার লোক, টেকনিশিয়ান থাকে। কলকাতা থেকে ওরা জিপে করে যায়। বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প হয়। অনির ফেভারিট জায়গা নানিয়াল বলে ছোট্ট একটা গ্রামে। গ্রামের শেষে একটা নিম গাছের ছায়ায় ওদের সার সার তাঁবু পড়ে। একটা অনির, একটা ড্রাইভারের, একটা কুক, একটা টেকনিশিয়ানের। সামনেই একটা পোড়ো পুলিশ স্টেশন। কেউ থাকে না। পুলিশ স্টেশনটা অনির অফিস ঘরের মতো। সামনেই রিজার্ভ ফরেস্ট। ভোরবেলা ময়ূর এসে ওদের তাঁবুর সামনে ভিড় করে। মাঝে মাঝে হরিণ। কাজ করতে করতে কতদিন বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে নদীর বালিয়াড়িতে। রবিবার দিন কাছের শহর বেলামপল্লিতে যায় সারা সপ্তাহের বাজারের জন্য। গভীর জঙ্গলে দেখা মেলে খরগোশ, হরিণ, নীলগাই, সম্বর এমনকী বাঘের। এখানকার এক স্থানীয় জমিদার রাজা রেড্ডি ওদের সব ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেন। বাঙালিদের ওপর অন্ধ্র প্রদেশের লোকের অগাধ শ্রদ্ধা। পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর দেশ। অন্ধ্রের ঘরে ঘরে শরৎচন্দ্রের বই। রাজা রেড্ডি মাঝে মাঝে অনির ক্যাম্পে আসেন তাঁর

স্ত্রীকে নিয়ে। মজার মজার গল্প বলেন। গ্রাম প্রধানকে বলেন যাতে কোনও কষ্ট না হয় অনিদের। কাছেই শাল-সেগুনের বন। মাঝে মাঝে আমলকী গাছ থেকে কত ফল মাটিতে পড়ে আছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জিপ চলাচলের রাস্তা। ওদের ম্যাপে সব দেখানো আছে। অনির মাঝে মাঝে রামায়ণের গল্প মনে হয়। মহাকবি বাল্মীকি রাম-লক্ষ্মণ, সীতার বনবাস এরকম জঙ্গলেই কল্পনা করেছিলেন গোদাবরী তীরে। এরকম জঙ্গলেই এসেছিল রাবণ সীতাহরণে।

অনি নতুন করে রামায়ণের গল্প অনুভব করে গোদাবরীর জঙ্গলে। গভীর জঙ্গলে সরু হাঁটাপথ দেখে মনে হয়, হয়তো রাম লক্ষ্মণ, সীতা এই পথ দিয়েই হেঁটেছিল কোনও দিন? হয়তো কোনও নদীর তীরে পর্ণচ্ছায়ায় তাদের কুটির ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে অনি অতীতের মধ্যে হারিয়ে যায়। "অস্তি গোদাবরী তীরে।"

অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে অনি নিত্যনতুন ফসিল আবিষ্কার করেছে প্রতিবছর। তার মধ্যে একটা ঘটনা এখনও মনে পড়ে। অনি যে পাথরের স্তর নিয়ে কাজ করে তার নাম ম্যালেরি ফর্মেশন। লাল মাটি আর সাদা বালির পাথরে তৈরি। প্রায় বাইশ কোটি বছর আগে একটা বিরাট নদী ছিল গোদাবরী উপত্যকায়। তার চার পাশে ছিল গভীর অরণ্যানী। জলে ও ডাঙায় ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানাধরনের প্রাণী। সেটা ছিল ডাইনোসর যুগের ঠিক শুরুতে। ট্রায়াসিক পর্বে। তখনকার দিনের ডাইনোসরগুলো ছিল ছোট্ট কুকুরের মতো। কিন্তু এদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল নানাধরনের বিদ্ঘুটে জন্তু জানোয়ার, রিঙ্কোসর, ফাইটোসর, মেটোপোসর, ডাইসাইনোডন্ট। কেউ ছিল জলে, কেউ ছিল ডাঙায়। বন্যায় এসব জন্তু মাঝে মাঝে চাপা পড়ত পলিতে। পাথরের স্তরে তাই পাওয়া যায় এদের ফসিল। আজ এরা সব লুপ্ত হয়ে গেছে।

অনির সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা মনে পড়ে। ওদের ক্যাম্প থেকে মাইল দশেক দূরে মুত্তাপুরম বলে একটা গ্রাম। ভোর ভোর কাজে বেরিয়েছে অনি। সূর্যের তেজ যখন কম তখন ফসিল খুলতে সুবিধে হয়। লাল মাটিতেই ফসিল বেশি। ওদের জিপেই খাবারদাবার, জল, প্লাস্টার, খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতি। অনির সঙ্গে আছে ধয়া প্রধান, ওড়িশার অধিবাসী। পামেলাই ধয়াকে নিয়ে আসেন আই এস আই-তে বেশ কয়েক বছর আগে। আসানসোলের কাছে এক ফিল্ডে গিয়েছিলেন পামেলা, সঙ্গে তপন রায়চৌধুরী, সোহনলাল জৈন। ষোলো বছরের এক কিশোর ধয়া তাঁবুর কাছে ঘুরঘুর করত। ধয়া কোনওদিন স্কুলে যায়নি, লেখাপড়া শেখেনি। কিন্তু আশেপাশের প্রতিটি পাথরের স্তর ওর মুখস্থ। পামেলাই ওকে নিয়ে ফিল্ডে যান, চিনিয়ে দেন ফসিলের হাড় কেমন দেখতে। কিছু দিনের মধ্যেই ধয়া সবাইকে হারিয়ে দিল নিত্য নতুন ফসিল খুঁজতে। এ এক অসাধারণ প্রতিভা। পামেলা বলেন, এইরকম ফসিল আবিষ্কার করার প্রতিভা দেখেছেন সাউথ আফ্রিকার কিচিং বলে এক প্যালিওন্টলজিস্টকে। কিচিং নাকি

চলন্ত ট্রেন থেকে ফসিল আবিষ্কার করতে পারত। ধয়া এখন ফসিল খোঁজায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু ফসিল খোঁজায় নয়, কী করে মাটি আর পাথর থেকে ফসিলটা আলাদা করে প্লাস্টার জ্যাকেটের মধ্যে নিয়ে আসতে হয়, ধয়ার মতন কেউ পারে না। হাড় ভেঙে গেলে ডাক্তার যেমন প্লাস্টার ব্যান্ডেজ করে, তেমনি ডাইনোসরের হাড় যখন পাথরে পাওয়া যায় হাড়ের মধ্যে বড় বড় ফাটল থাকে। যত্ন করে ব্রাশ, পিন ভাইস, স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে হাড়ের আশেপাশের মাটি আর পাথর সরিয়ে ফসিলগুলো শক্ত করতে হয় ল্যাকার বা ওই-জাতীয় আঠা দিয়ে। ফিল্ডে হাড়গুলো যতটা সম্ভব পাথরের মধ্যে রাখা দরকার। কিন্তু ফিল্ড থেকে ল্যাবরেটরিতে আনার সময় হাড়গুলো যেন চুরচুর না হয় সেজন্য পাথরসুদ্ধ ফসিলের হাড় প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজের জ্যাকেট করতে হয়। প্লাস্টার জ্যাকেটে ফসিলের হাড়গুলো শক্ত করে আটকে থাকায় অন্ধ্র থেকে কলকাতা আনার পথে কোনওরকম ভেঙে-চুরে যায় না। আই এস আই-তে ফিরে করাত দিয়ে কেটে সেই প্লাস্টার জ্যাকেট খোলা হয়। আস্তে আস্তে ফসিলের হাড় জোড়া হয়। পাথর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হয় যাতে প্যালিওন্টলজিস্টরা গবেষণা করতে পারে কী ধরনের জন্তু জানোয়ার কোটি কোটি বছর আগে বেঁচে ছিল। কী ভাবে হাঁটত, কী খেত, জলায় থাকত না ডাঙায়, ওদের কী নাম, কী পরিচয়, কোন গোষ্ঠীর, কেনই বা বিলুপ্ত হল— আই এস আই-এ এ-ব্যাপারে অনিকে সাহায্য করে প্রণব মজুমদার। কলকাতা থেকে আর্ট কলেজের ভাস্কর্যে নামকরা ছাত্র ছিল প্রণব। পাটনার ছেলে, লম্বা চওড়া পাঞ্জাবিদের মতো দেখতে। দারুণ ছবি আঁকে, দারুণ গান গায়, আবৃত্তি নাটকে পারদর্শী এই প্রণব। কাজের চেয়ে গল্প করতে প্রণব বেশি আগ্রহী, প্রণবকে ল্যাবরেটরিতে সাহায্য করে ধয়া। প্রণবের কাছ থেকে ফসিল প্রিপারেশনের সব-কিছু শিখে নিয়েছে ধয়া।

সেদিন ভোর আটটার মধ্যে মুত্তাপুরমে পৌঁছে যায় অনি আর ধয়া। ওদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা করে ব্যাকপ্যাক— তাতে ফসিল খোঁড়াখুঁড়ির সব হালকা যন্ত্রপাতি। একটা গাছের ছায়ায় জিপ নিয়ে বসে আছে। গৌর ওদের ড্রাইভার। অনির সঙ্গে আছে গ্রামের এক গাইড, মালয়া। রাস্তাঘাট সব চেনে মালয়া। ভাঙা ভাঙা হিন্দি আর তেলুগুতে অনি কথা বলে মালয়ার সঙ্গে। মালয়া শিখে গেছে কী করে ফসিল খুঁজতে হয়। জিপ থেকে নেমে অনি, ধয়া আর মালয়া তিনদিকে চলে গেল। ঘণ্টা দুয়েক ওরা সব ছাড়াছাড়ি হয়ে ফসিল খুঁজবে। দশটার মধ্যে জিপে ফিরে আসবে চা-এর জন। ফ্লাস্কে গরম গরম চা আছে। সেই সময় কে কী ফসিল পেল তাই নিয়ে আলোচনা চলে। দিন দুয়েক আগে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টির তোড়ে মাটি ধুয়ে ধুয়ে অনেক ফসিলের হাড় বেরিয়েছে। সবার চোখ লালমাটির দিকে। ধয়া আর মালয়া দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। জায়গাটা অসমতল— উঁচুনিচু ঢিবি। গাছপালা কিছু হয় না লালমাটিতে। ইংরেজিতে বলে.

"ব্যাড ল্যান্ড"। এই ধরনের মাটিতে কোনও সার নেই। আয়রন অক্সাইডের জন্য মাটির রং লাল, মরচে ধরা এই লাল মাটি। মাইলের পর মাইল এই লাল মাটি অন্ধ্রপ্রদেশের। লালের সঙ্গে হলুদ, সবুজ, বেগুনি— নানা ধরনের আভা এই মাটিতে। যেন কোনও শিল্পীর আঁকা রঙিন মরুভূমি। ভোরবেলা অথবা সন্ধেবেলা সূর্যের লাল আলোতে মিশে অপূর্ব সুন্দর দেখায় ম্যালেরি ফর্মেশন। পুরনো পাণ্ডুলিপির পাতার মতো পাথরের পরতে পরতে লেখা আছে পৃথিবীর ইতিহাস। যখন সমস্ত মহাদেশ একসঙ্গে জোড়া ছিল, বিরাট সুপারকন্টিনেন্ট— প্যানজিয়া। ভারত তখন দক্ষিণ মহাদেশে অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝে আটকে ছিল। নিজস্ব কোনও সত্তা ছিল না। তখন ছিল না হিমালয়, আল্পস অথবা রকি পর্বতমালা। আজ যেখানে হিমালয়— সেখানে ছিল এক লুপ্ত সমুদ্র— টেথিস সাগর। মাত্র ছ'কোটি বছর আগে ভারত দক্ষিণ মহাদেশ 'গন্ডোয়ানা' থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে একটা দ্বীপের মতো আলাদা হয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করে। প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার ভারতের এই সমুদ্রযাত্রা।

ভারত যতই উত্তরদিকে ভাসতে থাকে, টেথিস সাগর ক্রমশই সংকুচিত হতে থাকে চাপে— এশিয়া আর ভারতের মাঝে। এই উত্তরমুখী যাত্রার পথে ভারতের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এশিয়া মহাদেশের। টেথিস সাগর আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে বুজে যায়। ধাক্কার জোড়ে প্রচণ্ড আলোড়ন জলে স্থলে। টেথিস সাগর লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল আকাশচুম্বী হিমালয়। আজ তাই মাউন্ট এভারেস্টের চুড়োয় পাওয়া যায় সামুদ্রিক মাছ, শামুক ও ঝিনুক— যেগুলো টেথিস সাগরের জলে ভাসত। আজকের পর্বত পুরনো দিনের সংকুচিত সমুদ্র। ভাবতে আশ্চর্য লাগে টেথিস সাগরের সমুদ্রের মেঝে আজ উঁচু হয়ে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছে। ভারতের উত্তরমুখী যাত্রার গতি এখনও কমেনি। ভারত এখনও উত্তর দিকে ঠেলা দিচ্ছে— এশিয়া মহাদেশকে— সৃষ্টি করছে লম্বা লম্বা ফল্ট বা চ্যুতি। স্যাটেলাইট ফোটোগ্রাফ থেকে দেখা যায় এশিয়া মহাদেশের বুকে বড় বড় ফাটল। ভারতের ঠেলাঠেলিতে তৈরি হচ্ছে ভূমিকম্প— হিমালয়ে, তিব্বতে, চিনে। চিনদেশের ভয়ংকর ভূমিকম্পের জন্য দায়ী ভারতের এই উত্তরমুখী ধাক্কা। সে ধাক্কা এখনও অব্যাহত।

ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে। অনি মাথা নিচু করে হাঁটছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ফসিলের টুকরো। হঠাৎ দেখে একটা বড় জন্তুর মাথা। লালমাটি ধুয়ে গত সপ্তাহের বর্ষায় বেরিয়েছে। কুমিরজাতীয় লম্বামুখ ঘড়িয়ালের মতো দেখতে। মাছখেকো ঘড়িয়াল চিড়িয়াখানায় অনেক দেখেছে। অনি বসে পড়ে মাটিতে। আস্তে আস্তে ব্রাশ দিয়ে ওপরের মাটি সরিয়ে দেয়। ব্যাকপ্যাক থেকে খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতি বের করে, স্ক্রু ড্রাইভার, পিন ভাইস, খুরপি, ছুরি। আস্তে আস্তে মাটি সরিয়ে দেয়। পুরো মাথাটা আছে। সঙ্গে অসংখ্য দাঁত— সরু সরু ধারালো, কুমিরের মতো। এই জন্তুকে ফাইটোসর বলে। অনি মাথার পেছন দিকটা পরিষ্কার

করে। পরপর শিরদাঁড়া, আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ে বুকের পাঁজর, হাত, পা লেজ— মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ জানোয়ার। ধয়াকে এখন ভীষণ প্রয়োজন। ধয়া ছাড়া কেউ এই ফসিলটাকে পরিষ্কার করতে পারবে না। ও জিনিসপত্র ওখানে রেখে জিপের দিকে রওনা দেয় মাইলখানেক দূরে। দশটা বেজে গেছে। মালয়া আর ধয়ার ফেরার সময় হয়ে গেছে চা খাবার জন্য।

জিপের কাছে ফিরে দেখে ধয়া আর মালয়া ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। চা বিস্কুট বের করেছে। অনিকে দেখে ধয়া জিজ্ঞেস করে—

"কিছু পেলেন স্যার? আমি প্রচুর হাড়ের টুকরো দেখেছি। বৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অনেক ফসিল বের হয়েছে।"

অনি হাসে। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু ভেতরের উত্তেজনা চাপতে পারছে না। ধয়াকে না বলে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

অনি ঘুরিয়ে ধয়াকে বলে, "বুঝলে ধয়া, ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরব ফিল্ড শেষ করে। এখন মনে হচ্ছে আটকে গেলাম।"

এর মধ্যে গৌর সবাইকে চা আর বিস্কুট এগিয়ে দেয়। ধয়া বলে, "হেঁয়ালি ছেড়ে কী পেলেন বলুন স্যার। তল্‌কা?" তেলুগুতে তল্‌কা মানে মাথা। ফসিলের মধ্যে মাথা পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। প্রায়ই ভেঙেচুরে টুকরো হয়ে যায় বৃষ্টি আর নদীর স্রোতে।

অনি বলে, 'শুধু তল্‌কা নয় রে ধয়া, পুরো জানোয়ার, একটা আস্ত ফাইটোসর।"

"বলেন কী? আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন এবার।" ধয়া চোখ বড় বড় করে।

সবাই খুব উত্তেজিত। এর আগে সম্পূর্ণ ফসিলের জানোয়ার কখনও পাওয়া যায়নি ভারত থেকে। যদিও ফাইটোসর এর আগে পাওয়া গেছে জার্মানি ও আমেরিকা থেকে, পৃথিবীর মধ্যে এই প্রথম ফাইটোসরের আস্ত কঙ্কাল এই অন্ধ্রপ্রদেশে। ধয়া, গৌর, মালয়া সবাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ফসিল দেখবার জন্য। অনি সবাইকে নিয়ে গেল ফসিলের সেই জায়গায়।

ধয়ার অ্যানাটমি বা শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। শরীরের যে-কোনও জায়গার হাড় দেখে ও অনায়াসে বলে দিতে পারে, কোন জায়গার হাড়। মাঝে মাঝে অনি ভাবে কী করে এমন হয়? যে ধয়া একটা সই করতে পারে না, যে কোনওদিন কোনও স্কুলে যায়নি, তার বিজ্ঞানের এই দিকটা এত পরিষ্কার কী করে হয়? বিদেশ বিভুঁইয়ে এ ধরনের প্রতিভার সমাদর অনেক।

ওরা চারজনই স্ক্রু ড্রাইভার, ব্রাশ, পিন ভাইস দিয়ে আস্তে আস্তে খোঁড়াখুঁড়ি করে। ধয়ার নিপুণ হাতে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটা যেন প্রাণ পেল। মনে হচ্ছে মাটি ছেড়ে হাঁটা শুরু করছে জন্তুটা।

"স্যার, দেখেছেন, ফাইটোসরটা ঠিক হাঁটার ভঙ্গিতে। মনে হচ্ছে বন্যায় হঠাৎ চাপা পড়ে মারা গেছে।"

ঠিকই বলেছে ধয়া। লাল মাটির মধ্যে ক্রমশই ফাইটোসরের কঙ্কালটা জীবন্ত হয়ে উঠছে। দশফুটের ওপর লম্বা। চওড়ায় ফুট চারেক। মাটির ওজন অনেক। এতবড় ফসিলটা যদি একটা প্লাস্টার জ্যাকেটের মধ্যে নিতে হয় তার ওজন হবে তিন-চার মন। এর জন্য বিরাট করে চারিপাশে পরিখা করতে হবে। লোকজন দরকার হবে অনেক খোঁড়াখুঁড়ির জন্য।

"স্যার, আপনি কলকাতায় এক্ষুনি তপনবাবুকে টেলিগ্রাম করে দিন। এক্ষুনি টেলিগ্রাম করতে আপনি আর গৌর বেলামপল্লিতে চলে যান। আমি আর মালয়া খোঁড়াখুঁড়ি করি। বহুত লোকজন দরকার। দরকার টাকাপয়সার। তপনবাবুকে তাড়াতাড়ি আসতে বলবেন টাকাপয়সা নিয়ে।"

গৌর বলে, "ধয়া ঠিকই বলেছে। চলুন আমরা বেলামপল্লি পোস্ট অফিসে যাই। ঘণ্টা তিনেকের পথ এখান থেকে। টেলিগ্রাম করে আমরা সন্ধের মধ্যেই পৌঁছব। ধয়া আর মালয়া এখানেই থাক। ওদের লাঞ্চ, জল, চা ইত্যাদি নামিয়ে রাখি।"

গৌর আর অনি রওনা দেয় বেলামপল্লির দিকে। কাছাকাছি ছোট্ট শহর। ওখানেই ওরা সপ্তাহের বাজার করে, কেরোসিন তেল কেনে হারিকেনের জন্য, পেট্রোল কেনে জিপের জন্য, শাকসবজি, মাছ খাবার জন্য। ডিম দুধ আর মুরগি গ্রামেই পাওয়া যায়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে সরু মেঠো পথ। একটু ভুল হলেই জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরপাক খাবে। এইজন্য প্রতিটি বাঁক গৌর মুখস্থ করে রেখেছে।

বেলামপল্লি পৌঁছে অনি তপন রায়চৌধুরীকে টেলিগ্রাম করে আই এস আই-এর ঠিকানায়। তপনদা এবার ফিল্ডে আসেনি। বলেছিল, "অনি, যদি দরকার হয়, আমাকে টেলিগ্রাম কোরো।" অনি টেলিগ্রাম করে, "ডিসকভার্ড কমপ্লিট স্কেলিটন অফ এ ফাইটোসর। প্লিজ কাম কুইকলি বাই ট্রেন টু হেলপ আস ডিগিং। ব্রিং এক্সট্রা মানি।"

অনি আর গৌর যখন মুত্তাপুরমে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জিপের শব্দ শুনে মালয়া আর ধয়া উঠে দাঁড়িয়ে নাচছে আর চিৎকার করছে, "রণ্ডু, রণ্ডু"। তেলুগুতে রণ্ডু মানে দুই। অনি বুঝতে পারে না, ওরা কী বলছে।

কাছে যেতেই ধয়া উত্তেজিত হয়ে বলে, "স্যার, দুটো জানোয়ার পাশাপাশি মারা গেছে, 'লায়লা-মজনু'।" অনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, ওরা চলে যাবার পর ধয়া আর মালয়া আরেকটা সম্পূর্ণ ফাইটোসরের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছে, ঠিক পাশেই। অনি ভাবে, ধয়া ঠিকই বলেছে, দুটো জন্তু পাশাপাশি হয়তো বন্যার জন্য দৌড়েছিল উঁচু জায়গায় যাবে বলে, সেই দৌড়োবার ছন্দ ওদের হাত-পায়ে বাঁধা। হঠাৎ বন্যার জলে চাপা পড়ে মারা গেছে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীতে দুটো পাশাপাশি ফাইটোসর কখনও পাওয়া যায়নি। দারুণ আবিষ্কার।

অনির অবর্তমানে ধয়া আর মালয়া কঙ্কাল দুটো সুন্দরভাবে পরিষ্কার করেছে। পুরু করে লাগিয়ে দিয়েছে বার্নিশ যাতে হাড়গুলো মাটির সঙ্গে শক্ত হয়ে লেগে থাকে। যদি হঠাৎ বৃষ্টি হয়, বার্নিশ লাগাবার জন্য হাড়গুলো ভাঙবে না। তবুও সাবধানের মার নেই। ওদের সাদা কাপড় ছিল প্লাস্টার করার জন্য। কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল কঙ্কালদুটোকে। তার পর মাটি চাপা দিয়ে রাখল যাতে গ্রামের লোকেরা বুঝতে না পারে। হাড়ের ওপর বার্নিশ লাগালে সোনার মতো চকচক করে। স্থানীয় গ্রামের লোকের ধারণা অনিরা সোনারুপোর খোঁজে দিনের পর দিন মাঠে মাঠে ঘোরাফেরা করে। অনিরা তাঁবুতে ফিরে গেলে ওরা কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসে। বেশ-কিছুদিন আগে ভেঙ্কটপুরম গ্রামে একটা ভাল ফসিল ওরা বার্নিশ করে রেখে আসে। যাতে পরের দিন গিয়ে প্লাস্টার করে নিয়ে আসতে পারে। গিয়ে দেখে ফসিলটা গ্রামের লোকেরা ভেঙেচুরে নষ্ট করে দিয়েছে। কেউ কেউ নাকি হাড়গুলো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গরম জলে সেদ্ধ করে পরীক্ষা করেছে, ভেতরে সোনা আছে কি না। অবশ্য গরম জলে হাড়গুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। ওরা আর সোনার সন্ধান পায়নি।

অন্ধকার হয়ে গেছে। ক্যাম্পে ফেরার পালা। সবাই খুব উত্তেজিত। কী করে অতবড় ফসিল কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে ভাবতে পারছে না। খোঁড়াখুঁড়ি করতে প্রচুর লোকজন লাগবে।

তাঁবুতে ফিরেই ওরা তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নেয়। ঠিক হল রাত্রিবেলা ওরা রাজা রেড্ডির বাড়ি যাবে খবব দিতে। মাইল তিরিশ দূর, বেশির ভাগই জঙ্গলের পথ। রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে রাজা রেড্ডির বাড়িতে।

রাজা রেড্ডির বাড়ি যখন পৌঁছল বেশ রাত হয়ে গেছে। রাজা রেড্ডি অত রাতে ওদের দেখে আশ্চর্য হয়। পুরনো ধরনের জমিদার বাড়ি, বেশ খোলামেলা। লাইব্রেরিতে হাজার দশেকের মতো বই। রাজা রেড্ডির বিজ্ঞানে দারুণ উৎসাহ। ওখানকার জিওলজি সম্বন্ধে খুবই পরিচিত। অনি ফসিল আবিষ্কারের কথা বলে। ছবি এঁকে দেখায় পাশাপাশি দুটো ফাইটোসরের কঙ্কাল। রাজা রেড্ডি শুনে বলেন— "অনি, তুমি কিছু ভেবো না। কাল ভোর ভোর তোমাদের সঙ্গে আমি যাচ্ছি নানিয়ালে। ওখানে গিয়ে সব ঠিক করব। খুব ভাল করেছ তপনকে টেলিগ্রাম করে; কনগ্রাচুলেশন।" আজকে তোমরা এখানেই বিশ্রাম করো। আমার অনেক ঘর আছে। তোমাদের শোবার কোনও অসুবিধেই হবে না।"

পরের দিন ভোর ভোর ওরা বের হয়। রাজা রেড্ডি জিপ নিয়ে আগে যাচ্ছে। অনি তার পাশে বসে গল্প করছে। পেছনে গৌর আসছে। সকাল দশটার মধ্যে ওরা নানিয়ালের ক্যাম্পে পৌঁছে যায়। সেখানে একটু ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওনা দেয় মুত্তাপুরমের দিকে। ধয়া আর মালয়া মাটি আর কাপড় সরিয়ে বের করে

ফাইটোসরের কঙ্কালদুটো। ভাগ্যিস গ্রামের লোকেরা এখনও টের পায়নি। রাজা রেড্ডি ফসিল দুটো দেখে দারুণ উত্তেজিত। ভারত থেকে এ ধরনের আস্ত ফসিল কখনও পাওয়া যায়নি।

"অনি, আমাদের স্ট্র্যাটিজি ঠিক করতে হবে। প্রথমেই চলো গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখিয়ার কাছে। ওদের বোঝাতে হবে এরা সব জন্তুজানোয়ারের হাড়। ওরা গোরু-ছাগলের কঙ্কাল দেখে অভ্যস্ত। ওদের যদি বোঝানো যায় এর মধ্যে সোনাদানা কিছু নেই— এরা প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার, ওরা তা হলে কোনও ক্ষতি করবে না। তবুও সাবধানের মার নেই। আমাদের একটা ছোট ঝোপড়া বা ঘর তৈরি করতে হবে ঠিক এইখানে। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটা পাহারাদার দরকার। পয়সা দিলে গ্রামেরই কোনও চাষি রাজি হবে, বিশেষ করে রাতে পাহারা দিতে হবে। দিনের বেলা তো তোমরাই থাকবে। জঙ্গল থেকে ডালপালা এনে আজকের মধ্যে ওরা ঝোপড়া বানিয়ে ফেলুক। এই বলে মালয়াকে তেলুগুতে নির্দেশ দিল কিছু গ্রামের লোক নিয়ে একটা ছোট ঘর বানাতে।

রাজা রেড্ডি অনিকে নিয়ে মুত্তাপুরম গ্রাম-মুখিয়ার কাছে গেলেন। সঙ্গে কিছু ফসিলের হাড়। উপহারস্বরূপ মুখিয়াকে দিলেন ফসিলগুলো, বললেন, "এরা সব পুরাকালের জানোয়ারদের হাড়। রাম-রাবণের যুদ্ধের অনেক আগেকার জন্তুজানোয়ার। মানুষ তখন ছিল না। মুখিয়া বুঝতে পারে, ঘাড় নাড়ে। মুখিয়া অঙ্গীকার করে, আজকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিঙে সবাইকে ডেকে বলবে এইসব জানোয়ারের কথা। রাজা রেড্ডি বলেন, "শহরের জাদুঘরে এইসব জানোয়ার রাখা হবে, যাতে সবাই দেখতে পারে। এতে গ্রামের সম্মান বাড়বে।" রাজা রেড্ডিকে আশ্বাস দেয় মুখিয়া, কেউ জানোয়ারগুলোর হাড় নষ্ট করবে না।

ফসিলের জায়গায় দু'জনে ফিরে এসে দেখে মালয়া ও তার দলবল একটা ছোট ঘর ডালপালা দিয়ে এর মধ্যে তৈরি করেছে। সামনেটা খোলা। ওখানে বসে ফসিলের দিকে চোখ রাখা যায়। চার-পাঁচজন অনায়াসে সেই ডালপালা দিয়ে তৈরি ঝোপড়ার ভেতর বসতে পারে। গৌর একটা তাঁবুর ত্রিপল পেতে দিয়েছে নীচে। ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে চা খেতে খেতে রাজা রেড্ডি বললেন, "অনি, তোমার কাছে মেজারিং টেপ আছে?"

টেপ নিয়ে মেপে বললেন, "আমরা যদি ফসিলের চারিদিক একফুট করেও মার্জিন রাখি, সমস্ত জায়গাটা একটা চতুর্ভুজের মতো, দশফুট বাই পাঁচ ফুট। আমরা চারকোণে চারটে খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে যদি জায়গাটা ঘিরে রাখি গ্রামের কেউ দড়ি ডিঙোবে না। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি এই ফসিলের আবিষ্কার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। যতদিন তোমরা ওটাকে না তোলার ব্যবস্থা করবে, এ ভিড় তুমি আটকাতে পারবে না। গ্রামের লোকেরা সোজা, সরল মানুষ, কৌতূহলী, শহরের লোকেরা কী করছে দেখতে আসবে। এর মধ্যে যদি ধর্মের

ছোঁয়া পায়, তা হলে তো দেখতে হবে না। ওরা হয়তো পুজো শুরু করে দেবে। হাজার হাজার লোক গোরুর গাড়ি করে তোমাদের ফসিল দেখতে আসবে। এইজন্য তোমরা তৈরি থেকো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ফসিলটা তুলে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে।”

বিকেল হয়ে এসেছে। রাজা রেড্ডি মালয়া আর গ্রামের কিছু লোককে চারটে ভাল খুঁটি আনতে বললেন জঙ্গল থেকে। ওরা বেরিয়ে গেল কুঠার নিয়ে। জিপের ভেতর যন্ত্রপাতির বাক্সের মধ্যে একটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা শক্ত দড়ি পাওয়া গেল, তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে গেলে ওগুলো দিয়ে শক্ত করা হয়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে খুঁটি আর দড়ি দিয়ে ফসিলের চারিদিকে বেড়া হয়ে গেল। সন্ধে হয়ে গেছে। রাতের প্রহরী এর মধ্যে এসে গেছে খাবারদাবার নিয়ে, পাহারাদার বলতে গ্রামের এক চাষি এসেছে। সঙ্গে এনেছে ছোট বিছানা কম্বল। সারা রাত শুয়ে শুয়ে গ্রামের এই চাষি পাহারা দেবে ফসিল। পরের দিন সকালে অনিরা ফিল্ডে এলে পাহারাদার ঘরে ফিরবে।

নানিয়াল ফিরে ডিনার খেতে খেতে রাজা রেড্ডি বলেন, “অনি, এত বড় মাটির ব্লক তোলা চাট্টিখানি কাজ নয়। বেলামপল্লিতে একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে। তার চিফ ইঞ্জিনিয়ার ভাস্কর রাও আমার বন্ধু। মনে হচ্ছে কয়েকটন ওজন হবে। ওদের বড় ট্রাইপড স্ট্যান্ড ক্রেন আছে। ওরা ফসিল ব্লকটা তোলার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এর মধ্যে কলকাতা থেকে তপন চলে আসবে। আমি সামনের সপ্তাহের মধ্যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ভাস্কর রাওকে নিয়ে আসব তোমার কাছে। মি. রাও ইয়ং ছেলে, আই আই টি থেকে পাস করা, কানাডায় ছিল বছর তিনেক, তোমাদের যূথিকা রায়ের ভক্ত। বাড়ি ভর্তি যূথিকা রায়ের রেকর্ড। এখনও ব্যাচিলর। ভাল লাগবে ভাস্কর রাওকে।”

পরের দিন অনি তার দলবল নিয়ে ভোর ভোর মুত্তাপুরমে পৌঁছয়। গিয়ে দেখে রাতের পাহারাদার ঝোপড়ায় বসে চা খাচ্ছে। রাতে কেউ বিরক্ত করতে আসেনি বলল। মালয়াকে গ্রামে পাঠাল অনি। জন চারেক শক্তপোক্ত লোক খোঁড়াখুঁড়ির জন্য দরকার। ওদের ভাড়া করতে হবে সপ্তাহ দুয়েকের জন্য। সবারই মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করার যন্ত্রপাতি আছে, শাবল, কোদাল, শক্ত ঝুড়ি। ফসিলের চারিদিকে দড়ির বেড়ার পাশ দিয়ে বিরাট পরিখা খুঁড়তে হবে। দু' ফুট চওড়া, তিন ফুট গভীর। পরিখা খোঁড়া হয়ে গেলে ফসিলের চতুর্ভুজটা দাঁড়িয়ে থাকবে মাটির ওপর। তখন পরিখার ভেতর বসে বসে শাবল দিয়ে আস্তে আস্তে মাটির সমান্তরাল গর্ত করতে হবে সারিসারি— পরিখার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত। গর্তের মধ্য দিয়ে প্লাস্টারের ব্যান্ডেজ দিয়ে শক্ত করতে হবে ফসিলের ব্লকটা।

দু' সপ্তাহ ধরে পরিখা খোঁড়াখুঁড়ি চলল। এর মধ্যে রাজা রেড্ডি যা আশঙ্কা

করেছিলেন তাই হল। অনি, ধয়া আর গৌর দিনের বেলা ঝোপড়ায় বসে পরিখা খননের কাজ দেখে। এর মধ্যে গ্রামে গ্রামে রটে গেল ফসিল আবিষ্কারের কথা। গুজবে রটে গেল মাটির ভেতর লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলে রামসীতা। স্থানীয় মুসলমানদের কাছে হয়ে গেল ফাইটোসর লায়লা-মজনু। ভোরবেলা থেকে গোরুর গাড়ি করে কৌতূহলী লোকজনের আসা শুরু হয়ে গেল। রাজা রেড্ডি এর মধ্যে একটা পুলিশের সেপাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বন্দুক হাতে সেপাইজি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে। পরিখার মাটি উঁচু করে ফেলে একটা বেদির মতো করা হয়েছে। সেখানে গ্রামের লোকেরা ফুল, ফল, ধূপ, মোমবাতি, পূজার অর্ঘ্য রেখে যায়। প্রদীপ আর ধূপকাঠি জ্বালিয়ে যায়। হাতজোড় করে প্রণাম করে। সকাল থেকে আসা শুরু। ভিড় চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অনি আর ধয়া ঝোপড়ার মধ্য দিয়ে দেখে হাজার হাজার লোকের মেলা। কলকাতা থেকে তপনদার কোনও টেলিগ্রাম এখনও পৌঁছয়নি। অনির হাতে টাকাপয়সা ফুরিয়ে এসেছে।

এর মধ্যে রাজা রেড্ডি বেলামপল্লি সিমেন্ট ফ্যাক্টরির চিফ ইঞ্জিনিয়ার মি. ভাস্কর রাওকে নিয়ে এলেন। ভাস্কর রাও সুদর্শন যুবক। ফরসা রং, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছেন। সঙ্গে সহকারী। দু'জনে মিলে অনেক মাপজোক করে একটা খসড়া খাড়া করেছে। কী ভাবে ফসিলটা তোলা হবে মাটি থেকে। অনিকে স্কেচটা দেখায়। অনিদের দশ ফুট বাই পাঁচ ফুটের ফসিল ব্লকটার দেড়ফুটের বেশি গভীর হবে না। প্রথমে ফসিলের ওপরটা ও চারিপাশ প্লাস্টারের ব্যান্ডেজ দিয়ে শক্ত করতে হবে। গ্রামে খুব ভাল ছুতোর মিস্ত্রি পাওয়া যায়। ওরা কাঠের পাটাতন দিয়ে চারপাশ ঘিরে একটা বিরাট বাক্স বানাবে ফসিলের ব্লকটা ঘিরে। সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে লম্বা লম্বা লোহার রডে নাট বল্টুর ব্যবস্থা করবে। সেই দিয়ে লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি ভাবে পাটাতনগুলো শক্ত করা হবে। তার পর সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ক্রেন আর লরিতে অতবড় কাঠের বাক্স তোলা হবে। নিয়ে যাওয়া হবে বেলামপল্লি ফ্যাক্টরিতে। সেখান থেকে একটা লরি ভাড়া করে আই এস আই-এ নিয়ে যাওয়া হবে। ভাস্কর রাও অনিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "অনির্বাণ, ইট উড বি অ্যান অনার ফর মি টু হেল্প ইউ লিফটিং দিস রিমার্কেবল ফসিল ব্লক। ডোন্ট ওরি, আই উইল সি দ্যাট ইট রিচেস সেফলি টু ক্যালকাটা।"

রাজা রেড্ডি বললেন, "অনি, তোমাকে বলা হয়নি, হায়দ্রাবাদ থেকে আমার বিশেষ বন্ধু জগমোহন রেড্ডি ও তার বাড়ির সবাই পরশুদিন ভোর ভোর তোমার ক্যাম্পে আসবেন। আমি ও আমার স্ত্রী আসব ওঁদের সঙ্গে। যতক্ষণ আমরা না আসি তুমি ক্যাম্প থেকে বের হবে না। মিসেস রেড্ডি সব খাবারদাবার নিয়ে আসবে। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। সারাদিন হইচই হবে, পিকনিক হবে ফসিলের জায়গায়। জগমোহন রেড্ডি সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস। খুব ক্ষমতাশালী। কোনও

কারণে ফসিলটা যদি কলকাতায় কেউ না নিতে দেয় জাস্টিস রেড্ডি সাহায্য করতে পারেন। সারা অন্ধ্রপ্রদেশে এই ফসিল আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে গেছে। গ্রামের লোকের ভিড়ের মধ্যে হায়দ্রাবাদ থেকে একজন জার্নালিস্ট ছিল। সে তোমাকে না জানিয়ে কিছু ছবি তুলে নিয়ে বিরাট করে খবর ছাপিয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ লেখালেখি করেছে অন্ধ্রপ্রদেশের ফসিল হায়দ্রাবাদের মিউজিয়মে থাকবে। কলকাতা নিয়ে যাবার দরকার কী? খুব সাবধানে থাকবে। জাস্টিস রেড্ডি একবার ফসিলটা দেখে গেলে আমাদের কোনও চিন্তা নেই। যতক্ষণ জাস্টিস রেড্ডি না আসেন ফসিলটা প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দিয়ো না।"

বেশ ভোর ভোর গোটা ছয়েক জিপ এসে দাঁড়াল অনির ক্যাম্পে। রাজা রেড্ডি পরিচয় করিয়ে দিলেন জাস্টিস রেড্ডি তাঁর স্ত্রী, মেয়ে ঊর্মিলা, ছেলে গৌতম, হায়দরাবাদের বিশিষ্ট কিছু লোক, একজন জার্নালিস্ট, সব মিলিয়ে জনকুড়ি লোক হবে। হালকা করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সবাই রওনা দিল মুত্তাপুরম গ্রামে। সবাই ট্রেঞ্চের ভেতর নেমে ফাইটোসর ফসিল দুটো দেখছেন। অনি ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে বলেছে ট্রায়াসিক যুগে অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত কোথায় ছিল পৃথিবীর মহাদেশে, ডাইনোসরের উৎপত্তি, ফাইটোসররা জলে কেমন থাকত কুমিরের মতো, ইত্যাদি। বাইশকোটি বছর আগের পৃথিবীর জন্তুর ইতিহাস। জগমোহন রেড্ডির "লায়লা-মজনু" নামটা ভাল লেগেছে। এর মধ্যে দিন সাতেক ধরে ধয়া ফসিলের চার-পাশটা ছুঁচলো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পরিষ্কার করেছে। আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ফসিল দুটো এখন। ধয়া অনিকে ডেকে বলে,

"অনিবাবু, আমি ফসিলের চারপাশটা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি, দু'জনের পেটের মধ্যে ছোট ছোট জন্তু। আপনাকে বলা হয়নি। একটু দেখবেন স্যার?"

অনি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখে দুটো জানোয়ারের পেটের ভেতর। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জানোয়ার। এটা কিছুতেই ওদের বাচ্চা নয়। তার মানে খাবার হজম হবার আগেই দুটো ফাইটোসরের মৃত্যু হয়েছে? একি কোনও রকমের ফুড পয়জনিং না কী? ঠিক খাবার পরেই দুটো জানোয়ার বন্যায় চাপা পড়েছিল যাতে হাড়গুলো হজম হয়নি? অনি সবাইকে দেখায় ধয়ার আবিষ্কার। সবাই দারুণ উত্তেজিত। দশ বছর পরে অনি ফাইটোসরের পেটের ভেতরের জন্তুর নাম দেয় ম্যালেরিসরাস্, ম্যালেরি ফর্মেশনের নামে। অনি তখন ওয়াশিংটন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞানী, ম্যালেরিসরাসের আবিষ্কারের কথা সারা পৃথিবীতে খুব হইচই তুলেছিল।

হায়দ্রাবাদে ফিরে জাস্টিস রেড্ডি ডেকান হেরাল্ডে আর টাইমস অব ইন্ডিয়ায় সুন্দর করে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন মুত্তাপুরম গ্রামের ফাইটোসরের ওপর। এর মধ্যে কলকাতা থেকে তপন রায়চৌধুরী পৌঁছেছেন নানিয়াল ক্যাম্পে। সঙ্গে ফিল্ডের টাকাপয়সা। অনির আর চিন্তা নেই। ফাইটোসরের চারিদিক প্লাস্টার হয়ে

গেছে। গ্রামের ছুতোর চারিদিক ঘিরে বাক্স বানিয়ে দিয়েছে। ভাস্কর রাও পাঠিয়ে দিয়েছেন লোহার রড। ফাইটোসর দুটো এখন কাঠের বাক্সে বন্দি। এর মধ্যে একদিন ভাস্কর রাও তাঁর লোকজন, ক্রেন, ট্রাক্টর ইত্যাদি নিয়ে মাটি থেকে সেই কাঠের বাক্স ট্রাক্টরে তুলে বেলামপল্লি সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গেলেন। তপনদা আর অনি বেলামপল্লি থেকে একটা ট্রাক ভাড়া করে এল। ঠিক হল পরের দিন ট্রাকটা ফাইটোসরের ভারী বাক্সটা নিয়ে রওনা দেবে কলকাতা অভিমুখে।

পরের দিন তপনদা, অনি, ধয়া আর গৌর সকাল ন'টার মধ্যেই বেলামপল্লি সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে যায়। ভীমারাম গ্রাম থেকে রাজা রেড্ডি এসে গেছেন। ক্রেন দিয়ে কয়েকটন ওজনের ভারী ফসিলের বাক্স কলকাতাগামী লরির মধ্যে তোলা হল। লরির ড্রাইভার রাজা রেড্ডির চেনা, বিশ্বাসী। ওর হাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়া হল যাতে পথে কোনও অসুবিধে না হয় কোনও চেকিং পোস্টে। বেলামপল্লিতেই একটা চেকিং পোস্ট। লরির পেছন পেছন অনি আর রাজা রেড্ডির জিপ চলছে। হঠাৎ বেলামপল্লি চেকিং পোস্টে লরিটা পুলিশ ঘিরে ফেলল। কিছুতেই এই ফসিল অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কলকাতা যেতে দেবে না। হায়দ্রাবাদ থেকে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এসেছেন। রাজা রেড্ডি যতই বোঝাবার চেষ্টা করেন পুলিশ সুপারকে, যে, আই এস আই— সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দপ্তর, সারা ভারতে খোঁড়াখুঁড়ির অধিকার আছে, পুলিশ সুপার নারাজ। এ ফসিল হায়দরাবাদে থাকবে, অন্ধ্রপ্রদেশের সম্পত্তি। রাজা রেড্ডি পকেট থেকে জাস্টিস জগমোহন রেড্ডির চিঠি দেখায়: "এই লরিটা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কলকাতা যাচ্ছে, পথে যেন কোনওরকম অসুবিধে না হয়।" জাস্টিস রেড্ডির চিঠি দেখে পুলিশ সুপার ভয় পেয়ে যায়। লরিটিকে ছেড়ে দেয়। তপনদা আর অনি রাজা রেড্ডিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ভালভাবেই লরিটা আই এস আই-এ ফসিলের কাঠের বাক্সটা পৌঁছে দেয়। কলকাতার স্টেটসম্যান আর আনন্দবাজারে বিরাট করে লেখা বেরিয়েছিল ফাইটোসর আবিষ্কারের গল্প নিয়ে।

১৩

প্রায় ভোর হয়ে গেছে। হোটেলের অ্যালার্ম ক্লকে দেখে ভোর পাঁচটা। অনি ব্যাঙ্ককে শুয়ে শুয়ে তিরিশ বছর আগেকার দিনে চলে গিয়েছিল। অনি তখন পূর্ণ যুবক। আঠাশ ছুঁই-ছুঁই।

অশান্তির দশক শুরু হয়েছে। সত্তরের দশক মুক্তির দশক। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অনি ধারণা করতে পারেনি ইন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে

পড়েছে। সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক ছাত্রই অসীম চ্যাটার্জির নেতৃত্বে শুরু করেছে সরকার বিরোধী মিছিল ও সংঘটন। কলেজে কলেজে গোলমাল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিছু কলেজ বন্ধ। মিছিল, বিক্ষোভ— মনীষীদের মূর্তিভাঙার জোয়ার— বিদ্যাসাগর, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহনের মূর্তির মস্তক দেহচ্যুত। কলকাতার দেয়ালে নকশালবাড়ি সংগ্রামের সমর্থনে পোস্টার: 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চিনের পথ আমাদের পথ।' দিনের বেলা ছুরি দিয়ে, ভোজালি দিয়ে অতর্কিতে পুলিশ খুন, রাইফেল ছিনতাই। রাস্তার লোকেরা ভয়ে পালায়। চারিদিকে পুলিশের ধড়পাকড়, বোমাবাজি, স্কুলকলেজ ভাঙচুর, পুলিশ অথবা শোধনবাদী পার্টির কর্মীদের হত্যা এইসব কলকাতার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বেহালায় বিছানায় শুয়ে সারারাত বোমার আওয়াজ শোনে অনি। কখনও পুলিশের গাড়ি, ছোটাছুটি, রাইফেলের আওয়াজ বাড়ির সামনের রাস্তায়। পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, নকশাল আন্দোলনকারীরা নতুন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনতে চায়, দেশ জুড়ে সমতা আনতে চায়, তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত এরা।

সপ্তাহে। বউভাতের দিন সারারাত ধরে ইন্দ্র আর ঈশান গানবাজনা দিয়ে সবাইকে জমিয়ে রেখেছিল।

ইন্দ্র যে নকশাল আন্দোলনের জড়িয়ে পড়েছে অনি বুঝতে পারেনি। বছর দুয়েক ধরে ইন্দ্রকে দেখেছে সন্ধেবেলা ঝলমলে পোশাক পরে গিটার নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওদের ব্যান্ড ব্ল্যাক ক্যাকটাস, পার্ক স্ট্রিটের সব হোটেলে গান গায়। রাত করে ইন্দ্র বাড়ি ফেরে ট্যাক্সি করে। অনি বুঝতে পারে ইন্দ্র ড্রিংক করে এসেছে। কথা জড়ানো। ওদের ব্যান্ডে বেশির ভাগ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে। ওরা কেউ পার্ক স্ট্রিটে, কেউ খিদিরপুরে থাকে। রাজনীতির ব্যাপারে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা নির্বিবাদী। ইন্দ্র মাঝে মাঝে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখত বেশ-কিছু বড় মাপের নকশাল নেতাদের— যাদের মারার জন্য পুলিশ তৈরি। বিদেশি গান রক ব্যান্ডের সঙ্গে যে নকশাল আন্দোলনের যোগাযোগ থাকতে পারে, অনি বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি পুলিশের লোকেরা।

বেশ-কিছুদিন ধরে ইন্দ্রর পরিবর্তন লক্ষ করেছে অনি। ইন্দ্রর মাথায় বড় বড় চুল নেই। চুল সাধারণ, ছোট করে কাটা। ইন্দ্র আর ঝলমলে পোশাক পরে না। তার বদলে মোটা রঙিন খদ্দরের পাঞ্জাবি, পাজামা, হাওয়াই চটি। বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে চলে। দিনের বেলা বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে থাকে। সন্ধেবেলা কোথায় চলে যায়। বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে ইন্দ্র। হেমছায়া কিছু জিজ্ঞেস করলে চোটপাট করে উত্তর দেয়। গিটারটা বাক্সে তুলে রেখেছে। ইন্দ্র আর গান গায় না।

দিনরাত লুকিয়ে কী সব বই পড়ে, বন্ধু এলে তক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পার্ক স্ট্রিট হোটেলে আর গান গায় না ইন্দ্র।

বিয়ের ঠিক পরেই অনি একদিন বেশ রাত করে দমদম থেকে একটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছে। রাত হবে বলে সর্বাণীকে নিয়ে যায়নি। রাতের বেলা কলকাতা আতঙ্কগ্রস্ত। লোকেরা রাতে যাতায়াত করা বন্ধ করে দিয়েছে। বেহালা থানার স্টপ থেকে মঞ্জুবীথি বেশ ঘোরানো পথ। বেশ কিছুটা মেঠো রাস্তা— পুকুরের পাশ দিয়ে বকুল গাছের ফাঁক দিয়ে পায়ে চলার আঁকাবাঁকা পথ। রাত বারোটা বেজে গেছে। রাস্তাঘাটে লোক নেই। পুকুরপারের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় মনে হল দূরে ইন্দ্র হাঁটছে পাঞ্জাবি পাজামা পরে— একা একা— হাতে সিগারেট। ইন্দ্রের পিছনে একটা লোক হাঁটছে, সাদা জামা আর ধুতি পরা। একটু পরেই ইন্দ্র লোহার দরজাটা খুলে বাড়ি ঢুকল। অনির মনে হল লোকটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রকে দেখছে। ইন্দ্র টের পায়নি। অনি কাছে আসতেই লোকটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা। কোঁকড়া চুল— চোখের নীচে একটা বড় কাটা দাগ। রাস্তার ল্যাম্পে স্পষ্ট মুখটা দেখতে পেয়েছে অনি। টেবিলের ওপর ইন্দ্রর খাবার ঢাকা। নিজেই নিয়ে খেতে বসে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। সর্বাণী ইন্দ্রর কাছে এসে বসে। অনি ইন্দ্রকে বলে লোকটার কথা। ইন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বলে "শালা— পুলিশের ইনফর্মার, ওর মজা দেখাচ্ছি— কলেজ স্ট্রিট থেকে আমাকে ফলো করছে। এ পাড়ায় থাকে ব্যাটা। যতসব বিভীষণের দল।"

সর্বাণী জিজ্ঞেস করে, "তোকে কেন ফলো করবে? তুই কী করেছিস?"

ইন্দ্র রেগেমেগে উত্তর দেয়, "তুমি এসব কিছু বুঝবে না বৌদি। ঘুমতে যাও।"

বিয়ের পর হানিমুনে সর্বাণীকে নিয়ে অনি বেড়াতে যায় ভুটানে। হিমালয় চিরকাল ভাল লাগে অনির। থিম্পু থেকে ফিরে এসে দেখে বাড়ি থমথমে। হেমছায়া বলেন, "অনি, আমার কিছুই ভাল লাগছে না। ইন্দ্র যাবার আগে বলে গেল শিলিগুড়িতে কী কাজ আছে। চারু মজুমদারের ওখানে যায়নি তো ইন্দ্র? পুলিশ তা হলে ওকে মেরে ফেলবে। ইন্দ্র কোনওদিন পলিটিক্স করল না। এখন যেন মরণখেলায় মেতে গেছে। ভয়ডর কিছু নেই। বাড়ির কারও ওপরে কোনও টান নেই। হঠাৎ এমন করে বদলে গেল কেন ইন্দ্র? সুদীপই ওর মাথাটা খেয়েছে। দিনরাত গুজুর গুজুর। সুদীপ কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে পড়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রই সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী। আমাদের বাড়ির ছেলেগুলোই সব বোকা।"

"ইন্দ্র যে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে আমাকে তো কোনওদিন বলনি?"

"বলব কি? সবসময় ভয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। যাবার আগের রাত্রে বোধহয় রাত দুটো হবে— হঠাৎ বাইরে ধুপধাপ শব্দ শুনে তোর পিসিমাকে

পাঠিয়েছি দেখতে। পিসিমা দেখে এসে বলে, ইন্দ্র আর তার দলবল পুকুরের কোণে বিরাট গর্ত করে প্ল্যাস্টিক ব্যাগে করে কী চাপা দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখল। অনি, রাইফেল, বন্দুক লুকিয়ে রাখেনি তো? আমি বাড়ির কাউকে বলিনি এসব কথা। তোরা থিম্পু যাবার পর ইন্দ্রর সঙ্গে তোর বাবার খুব ঝগড়া হত এই নকশাল আন্দোলন নিয়ে। আকাশটা এখন জাহাজে। আমি ঈশানকে ছুটির দিন বাড়িতে আসতে না করে দিয়েছি। পাড়ার কত ছেলেকে জেলে নিয়ে গেছে জানিস? আমি আর ভাবতে পারি না অনি। ইন্দ্রকে না জানি কোনদিন মেরে ফেলবে।"

মাসখানেক পরে এক গভীর রাতে হঠাৎ ধুপধাপ শব্দে অনির ঘুম ভেঙে যায়। দরজা ধাক্কার শব্দ। অনি উঠে পড়ে। সর্বাণীও উঠে গেছে। অনি দরজা খুলতেই দেখে চারিদিক সি আর পি বাড়িটা ঘিরে ধরেছে। পিসিমা খেয়াকে নিয়ে মাঝের ঘরে শোয়। সি আর পি-রা ঢুকে মশারির দড়ি ছিঁড়ে তিনটে ঘরেই ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে সবাই বিছানা ছেড়ে উঠে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। রিভলভার নিয়ে এক বাঙালি অফিসার হেমছায়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, "আলমারি খুলুন।" পুলিশরা এর মধ্যে বিছানা সব তছনছ করে ফেলেছে— বাথরুম, পায়খানা, রান্নাঘর সব সার্চ করছে। আলমারির ভিতর থেকে জিনিসপত্র সব টেনে টেনে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। বালিশগুলো ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সারা ঘরে তুলো ছড়িয়ে ফেলছে। পুলিশের তাণ্ডবে চারদিক ছত্রাকার।

আনন্দশেখর চিৎকার করে বলে ওঠেন, "এসব কী হচ্ছে? আপনাদের কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?"

পুলিশ অফিসার হাতের রিভলভারটা আনন্দশেখরের মুখের সামনে তুলে ধরে বলে, "আপনি এই চেয়ারে বসুন আনন্দবাবু। আপনার গুণধর ছেলে ইন্দ্র যদি কোথায় আছে বলেন আমরা আর কোনও বিরক্ত করব না। বিপ্লব করছে। যতসব স্কাউন্ড্রেল, খুনি, বদমাশ, শুয়োরের বাচ্চা।"

হঠাৎ অনির দিকে ফিরে অফিসারটা ব্যঙ্গ করে বলে,

"এই যে সায়েন্টিস্ট। থিম্পু কেমন লাগল? আপনি যে মাসখানেক বাইরে ছিলেন আমাদের কাছে খবর আছে। আপনি গুণী লোক, সজ্জন লোক, আপনার ভাইটা বেশ ছিল, পার্ক স্ট্রিটে গানবাজনা করত। হঠাৎ এই মাও সে তুং-এর দলে যোগ দিল কেন? ভাল করে শুনে রাখুন। ইন্দ্রকে পেলে আমরা শেষ করে ফেলব।"

এই বলে কটমট করে তাকিয়ে সি আর পি-দের বলল, "পাখি পালিয়েছে। কতদূর পালাবে দেখা যাক।" এই বলে বাইরে বেরিয়ে দুটো দাঁড়ানো ভ্যানে উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হল অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণ— কাছে-পিঠেই। হয়তো সি আর পি-র সঙ্গে নকশালদের খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে।

আনন্দশেখর অপমানে, লজ্জায় চুপ করে গেছেন। হেমছায়া বলেন, "ভাগ্যিস ঈশান এখন বি ই কলেজ হস্টেলে। ঈশান থাকলে ইন্দ্রর বদলে ওকেই থানায় নিয়ে মারত ইন্দ্রর কথা জানতে।" খেয়া আর ছোটভাই উৎসব ভয়ে কাঁদছে। পিসিমা আস্তে আস্তে সব গুছিয়ে রাখে। বিছানার ওপর সি আর পি-র বুটের কাদার ছাপ। এগুলো কাচতে হবে। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। পিসিমা সবার জন্য চা করতে চলে গেল। খেয়া কাঁদতে কাঁদতে একটা থলিতে তুলোগুলো তুলে রাখছে। আবার নতুন করে বালিশ বানাতে হবে।

এই ঘটনার পর হেমছায়া কেমন চুপ হয়ে গেছেন। রাত হলে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন। যদি ইন্দ্রর ছায়া দেখা যায়। মাস ছয়েক হল ইন্দ্রর কোনও খবর নেই। ভাতের থালা নিয়ে খেতে বসে ইন্দ্রের কথা মনে পড়ে। খেতে কিছু ইচ্ছে করে না। এর মধ্যে আকাশ জাহাজ থেকে ফিরেছে। আকাশ মাকে সান্ত্বনা দেয়— "ইন্দ্রর মতো ছেলের কিছুই হবে না। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না মা।" আকাশ বিদেশ থেকে অনেক কিছু জিনিস সবার জন্য এনেছে। রেফ্রিজারেটর, স্টিরিও, পারফিউম, সাবান, নতুন জামাকাপড়। ইন্দ্রর জন্য একটা সুন্দর চামড়ার জ্যাকেট। বছর দুয়েক আকাশ বাড়ি ফেরেনি। ও কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না ইন্দ্র নকশাল হয়ে গেছে। বাড়ির থমথমে পরিবেশ কাটাবার জন্য আকাশ সবাইকে নিয়ে গানবাজনায় বসে— সিনেমায় নিয়ে যায়— রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায় ভাইবোনদের— নতুন বউদিকে।

ইন্দ্রর বেহালার অনেক বন্ধু জেলে, অনেক বন্ধু পুলিশের গুলিতে মারা পড়েছে। ইন্দ্রর কোনও খবর নেই। হেমছায়া মাঝে মাঝে ভাবেন— ইন্দ্র কি একটা ছোট চিঠিও লিখতে পারে না? "মা, আমি ভাল আছি। আমার জন্য কোনও চিন্তা কোরো না।"— এর বেশি কিছু আশা করেন না— মনে মনে প্রার্থনা করেন— ইন্দ্রকে যেন ভগবান প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেন।

হঠাৎ একদিন গভীর রাতে দরজায় আস্তে আস্তে খটখট শব্দ শুনে পিসিমা দরজা খুলে দেয়। দেখে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে। শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়। একগাল দাড়ি— চোখ গর্তে— জীর্ণ, কঙ্কালসার চেহারা। হেমছায়া ইন্দ্রকে দেখে সব জানলা বন্ধ করে দেন। কেউ যদি দেখে পুলিশকে খবর দিয়ে দেয়। ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদেন হেমছায়া— "কোথায় ছিলি ইন্দ্র, আর কত কষ্ট দিবি আমাকে?"

সর্বাণী ছুটে আসে, "একী চেহারা হয়েছে, ইন্দ্র?"

ইন্দ্র বলে, "আমার সারা গায়ে কাদা, খোসপাঁচড়া। আমি একটু স্নান করে আসি— ডেটল বা পটাশিয়াম পারমাংগানেট আছে? খালি পায়ে কাদায় চাষ করে হাজা হয়ে গেছে। পিসিমা একটু গরমগরম ভাত করো। কতদিন মাছের ঝোল খাই না। পান্তাভাত আর লঙ্কা খেতে খেতে মুখে অরুচি লেগে গেছে। মা,

এন্টারোকুইনল আছে তো? আমার ভীষণ দরকার। পুকুরের জল খেয়ে আমার রক্ত আমাশা হয়েছে।"

ইন্দ্র স্নান করতে চলে গেল। হেমছায়া পরিষ্কার পাঞ্জাবি পাজামা নিয়ে আসে ইন্দ্রর জন্য। এর মধ্যে যা রান্না ছিল পিসিমা গরম করে নিয়ে আসে। ইন্দ্র খেতে খেতে বলে, "কতদিন এত ভাল খাইনি। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।" হেমছায়া বলে, "ইন্দ্র, তুই আমার কাছে শুবি। সারারাত আমি তোর পাশে বসে থাকব। তোকে একটু প্রাণ ভরে দেখতে ইচ্ছে করছে।"

ইন্দ্রর সঙ্গে কারও বেশি কিছু কথা হল না। ইন্দ্র কথা বলতে চাইছে না। ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল হেমছায়ার বিছানায়। হেমছায়া আস্তে আস্তে ইন্দ্রর চুলে হাত বোলান। বহুদিন পরে আদরের ছেলেকে কাছে পেয়েছেন। এবার ইন্দ্রকে কোথাও যেতে দেবেন না।

সারারাত ঘুমোননি হেমছায়া। পরের দিন আস্তে করে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ইন্দ্র ঘুমোচ্ছে ঘুমুক। খাবার টেবিলে চা খেতে খেতে সবাইকে বললেন, "ইন্দ্র যতদিন বাড়ি আছে— সবাইকে খুব স্বাভাবিক থাকতে হবে। যে যার কাজ করবে। অনি, তুই অফিসে যাবি, সর্বাণী গোখেল কলেজে যাবে, খেয়া উৎসব স্কুলে যাবে। ইন্দ্রর কথা ঘুণাক্ষরে কেউ যেন জানতে না পারে। আমি ইন্দ্রকে আগলে রাখব। ওর সারা হাত পা ঘায়ে ভর্তি। আকাশ, সন্ধেবেলা তোর ডাক্তারবন্ধু দেবাশিসকে যদি একবার আনতে পারিস ভাল হয়। আমার কাছে অয়েন্টমেন্ট আছে। সারা পায়ে লাগিয়ে দিয়েছি। মনে হচ্ছে কঠিন অসুখ বাধিয়ে এসেছে। ওকে একবার ডাক্তার দেখানো দরকার।"

অনি সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে দেখে ইন্দ্র তখনও ঘুমচ্ছে। বাড়ি চুপচাপ। দরজা জানালা বন্ধ। সর্বাণীর কাছে শোনে ইন্দ্র একবার উঠে স্নান করে খেয়েদেয়ে আবার ঘুম। দেবাশিস দেখে কিছু ওষুধ দিয়ে গেছে। রক্ত নিয়ে গেছে কিছু টেস্ট করার জন্য। ইন্দ্র কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ওকে কিছু নিয়ে পীড়াপিড়ি করতে বারণ করল সর্বাণী।

দিনপাঁচেক ধরে ইন্দ্র শুধু ঘুমিয়ে কাটাল। অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর হেমছায়া শুধু জানতে পেরেছেন ইন্দ্র নাকি সুন্দরবনের কোনও এক গ্রামে এক চাষি বাড়িতে আছে। সেখানে চাষবাস করছে। এর বেশি ইন্দ্র বলতে নারাজ। চোটপাট করে ওঠে। ভাইবোনেরা কেউ ইন্দ্রর কাছে যায় না। দূর থেকে দেখে ও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

পূর্ণিমা এখন একা একা থাকেন নাকতলায়। সর্বাণীর বিয়ে হবার পর খুব নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে। ছুটির দিন অনি সর্বাণীকে নিয়ে যায় পূর্ণিমার বাড়ি। শনি রবি ওখানে কাটিয়ে আসে। মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে বেড়াতে নিয়ে যায় পুর্ণিমাকে ছুটির দিনে। শনিবার সকাল সকাল সর্বাণী তৈরি হয় নাকতলা যাবার জন্য। অনি হেমছায়ার ঘরে ঢুকে দেখে ইন্দ্র ঘুমিয়ে— হেমছায়া পাশে বসে আছেন। আনন্দশেখর বাজারে বেরিয়ে গেছেন। অনি আর সর্বাণীকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন হেমছায়া। "কী করবি বাড়িতে বসে, তোরা নাকতলা থেকে ঘুরে আয় দু'দিন। ইন্দ্র কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না। আমি ওর কাছে থাকব। কোনও চিন্তা করিস না।"

রোববার ভোরে পূর্ণিমার বাড়িতে চা খেতে খেতে খবরের কাগজটা পড়ছে অনি। সর্বাণী তখনও ঘুমে। পূর্ণিমা ভোর ভোর নাকতলা বাজারে গেছেন। আকাশকে অত ভোরে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় অনি। চুল উসকো খুসকো, লাল চোখ। "কী রে আকাশ এত ভোরে? সব খবর ভাল তো? ইন্দ্র কেমন আছে?"

"দাদা, ইন্দ্র কাল রাতে ধরা পড়েছে। বেহালা জেলে ওদের রেখেছে। প্রচণ্ড মার দিয়েছে। হাতমুখ রক্তারক্তি। গতকাল সন্ধেবেলা একটা ছেলে এসে বলে 'ইন্দ্র, তোদের বাড়ি আজ রেড হবে। আজকে রাতে বাড়ি থাকিস না।' রাত দশটার সময় ইন্দ্র খেয়েদেয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে যায়— মাকে বলে, কোনও চিন্তা কোরো না— আমি যোগাযোগ করব। ওরা নাকি চারজন ব্যানার্জিপাড়ার রায়চৌধুরীর বাড়িতে ছিল— রাস্তার মোড়ের সেই বড় হলুদ বাড়িটা। ওদের সঙ্গে ছিল বেহালা কমিটির চেয়ারম্যান সৌরেন। সৌরেনের জন্যই মনে হয় ওদের চারজনকে পুলিশ মারার তাক করছে। কয়েকদিন আগেই নীলকে থানার মধ্যে মেরে ফেলল— নীল পরে ছিল ইন্দ্ররই একটা সার্ট। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। কত লোক যে নীলকে দেখতে এসেছিল। বেহালা থানার ওসি হচ্ছে রতন বোস। ভীষণ পাজি, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে— জনতাকে বলে, 'বাথরুম করার নাম করে নীল পালাচ্ছিল— সি আর পি গুলি চালিয়ে দিয়েছে।' এটা ওদের নতুন ট্যাকটিকস হয়েছে। যদি জেলে নিয়ে যায়— সেটা অনেক সেফ। থানায় থাকলে মেরে ফেলবে। দাদা, তুই এক্ষুনি আয়— থানায় যেতে হবে, মা কান্নাকাটি করছে। বাবা কেমন চুপ করে আছে।"

এর মধ্যে আকাশকে দেখে সর্বাণী উঠে এসেছে। সব শুনে বলে, "আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি বেহালা থানায়। এর মধ্যে পূর্ণিমা বাজার থেকে এসেছেন। অনি পূর্ণিমাকে বলে বিদায় নেয়। সঙ্গে আকাশ ও সর্বাণী। গড়িয়া থেকে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি আসছিল। হাত থামিয়ে বলে, "বেহালা থানা।"

অনি থানার মধ্যে ঢুকতেই দেখে সেই পুলিশ অফিসারটা— যে ওদের বাড়িতে ইন্দ্রকে খুঁজতে এসেছিল। আকাশ আস্তে আস্তে বলে, "এই হচ্ছে রতন

বোস— কত লোককে যে খুন করেছে ইয়ত্তা নেই।" অনিকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে বলে—

"আসুন আসুন অনির্বাণবাবু, আপনার গুণধর ভাইকে দেখতে এসেছেন? ওরা ভালই আছে।"

পুলিশের মুখে নিজের নাম শুনে অনি আশ্চর্য হয়ে যায়।

"রামশরণ, অনির্বাণবাবু ওর ভাইকে দেখতে এসেছেন। কালকে রাত্রে যারা ধরা পড়েছে ওঁদের একটু দেখিয়ে দাও।"

রামশরণ ওদের সেলের কাছে নিয়ে যায়। সর্বাণী ইন্দ্রর সব বন্ধুদের চেনে। সবার জামাকাপড়ে রক্তারক্তি। ইন্দ্রর কপালে চোখের কাছে বিরাট কাটা দাগ। সারা মুখে রক্তের দাগ শুকিয়ে গেছে। সবাইকে পিঠমোড়া করে বাঁধা— পায়ে শেকল— কেউ নড়াচড়া করতে পারছে না। দাদাকে দেখে ম্লান হাসে ইন্দ্র।

সর্বাণী ইন্দ্রকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। "তোকে মেরে কী করেছে ইন্দ্র?"

"বউদি, কিছু ভাবিস না। এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?"

অনি রতনবাবুর কাছে গিয়ে অনুনয় করে, "এদের কি একটু চা শিঙাড়া খাওয়াতে পারি?"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। পাশেই মিষ্টির দোকান। আপনি নিয়ে আসুন। আমি রামশরণকে হাতের বাঁধন খুলতে বলি।"

আকাশকে নিয়ে অনি পাশের দোকান থেকে কিছু শিঙাড়া, মিষ্টি আর ভাঁড়ে চারটে চা নিয়ে আসে। রতনবাবু ওদের সেলের কাছে নিয়ে যায়।

"এই দ্যাখ, ইন্দ্র। তোর দাদা তোদের সবার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। মাও সে তুং আনেনি। খেয়ে নে শুয়োরের বাচ্চারা। এই বোধহয় তোদের শেষ খাবার।"

ওদের হাতের বাঁধন খুলে নিয়েছে। সর্বাণী ওদের দেখে কাঁদছে। চার বন্ধু চা শিঙাড়া মিষ্টি খেয়ে নিল। ইন্দ্রর দিকে তাকানো যায় না। বেহালা কমিটির চেয়ারম্যান বলে সৌরেনকে বোধহয় সবচেয়ে বেশি মেরেছে কথা আদায়ের জন্য। ও ধুঁকছে।

অনি রতনবাবুর কাছে বলে, "ইন্দ্রকে বেলে ছাড়ানো যায় না?"

"দূর মশাই— এসব নকশালরা খুনি। এদের আবার কিসের বেল? চাবকে এদের ছাল ছাড়িয়ে নিতে হয়। এরা আবার বিপ্লব করবে। একটা মজা দেখবেন আসুন।" এই বলে অনিকে নিয়ে আবার সেলের কাছে আসে। ওদের আবার পিঠমোড়া করে বাঁধা।

"রামশরণ, দরজাটা একটু খুলে দাও। দরজা খুলে রতনবাবু সেলে ঢোকে। হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে সৌরেনের কাছে আসে— "এই যে নেতা—

বল শালা চিনের চেয়ারম্যান আমার বাবা।" সৌরেন জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকে রতনবাবুর দিকে।

"তিন গুনছি, এর মধ্যে যদি না বলিস দেখবি মজা। এক, দুই, তিন।" হঠাৎ হাতের বেটনটা দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড মারে সৌরেনকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাটিতে পড়ে যায় সৌরেন। রক্ত ফিনকি দিয়ে সর্বাণীর শাড়িতে ছিটিয়ে পড়ে।

সর্বাণী চিৎকার করে, "আপনারা কি মানুষ, না পশু?"

রতনবাবু হাসতে হাসতে বলে, "ম্যাডাম, ওরা যখন নিরীহ পুলিশ মারে—তখন কি ওদের মনে থাকে ওরা মানুষ কি পশু?"

অনি বুঝল ইন্দ্রকে বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে কিছু করতে হবে। বেহালা থানার ও/সি যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে ওর ধারণা ছিল না। সর্বাণী ও আকাশকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়।

রতনবাবু হঠাৎ ডেকে বলে, "ভাল কথা অনির্বাণবাবু, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। বাথরুম পায়খানার নাম করে নকশাল ব্যাটারা পালাতে যায়। ওদের মেরে মেরে আমাদের টিপ এখন নির্ঘাত। পালাবার চেষ্টা করলেই মৃত্যু। আপনার ভাইয়ের অপমৃত্যুর কথা শুনলে চমকে যাবেন না।"

থানা থেকে বেরিয়েই আকাশ বলে, "দাদা, ইন্দ্রদের দু-একদিনের মধ্যেই মেরে ফেলবে। রতনবাবু দম্ভের সঙ্গে জানিয়ে দিল কী করে মারবে। আইন, অনুমতি, বিচার লাগে না এইসব তরুণদের হত্যা করার জন্য। সবাই এক্সপেন্ডেবল। প্রতিবাদ করার কেউ নেই।"

অনি বলে, "আকাশ, তুই সর্বাণীকে নিয়ে বাড়ি যা। আমি দিদির বাড়ি যাই। দিদির শ্বশুর নামকরা অ্যাডভোকেট। উনি নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন।"

অনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভবানীপুরের দিকে যায়। বহুদিন পরে দিদির বাড়ি যাচ্ছে অনি। কেয়া কিছুতেই সর্বাণীকে মেনে নিতে পারেনি। এইজন্য অনি দিদির বাড়ি বহুবছর যায়নি। অনিকে দেখে কেয়া আশ্চর্য হয়ে যায়।

"সব খবর ভাল তো অনি? কতদিন পরে এলি। সর্বাণীকে আনলি না কেন? তোর সন্দীপদা সর্বাণীর গানের খুব প্রশংসা করে।"

"না রে দিদি, খবর ভাল নেই।" এর মধ্যে সন্দীপ এসে যোগ দিয়েছে। "কাল রাতে ইন্দ্রকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। খুব মেরেছে। এইমাত্র বেহালা থানা থেকে ফিরছি।" এই বলে সব ঘটনা জানাল।

সন্দীপদা সব খবর শুনে বলল, "অনি, আমার ভাল ঠেকছে না। মনে হচ্ছে সেলের মধ্যে মেরে ফেলবে। এই মুহূর্তে কিছু করা দরকার। চল বাবার সঙ্গে কথা বলি। তবে কী জানিস? এইসব অ্যামেচার ছেলেরা প্রফেশানালদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে। মেরে ছাতু বানিয়ে দেবে। আমি তো ইন্ডিয়ান নেভিতে ছিলাম। আমি তোকে বলে দিচ্ছি এসব নকশাল আন্দোলন বেশিদিন টিকবে না।"

খুব মন দিয়ে অনির কথা শুনলেন দিদির শ্বশুর। বললেন, “আমি এক্ষুনি মি. কমল সেনকে ফোন করে দিচ্ছি। খুব বড় ক্রিমিনাল অ্যাটর্নি। সন্দীপ, তুই তো কমলের বাড়ি চিনিস। অনিকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যা।”

দিদির বাড়ির সামনেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানো ছিল। সন্দীপ ট্যাক্সিটা নিয়ে নির্দেশ দেয় ট্যাক্সিওয়ালাকে, “আলিপুর চলিয়ে।”

কমল সেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সব শুনে বললেন, “কালকের মধ্যেই চারজনকে কোর্টে আনার ব্যবস্থা করছি। সেখান থেকে আলিপুর জেলে। নকশাল বন্দিদের কোনো বিচার নেই। তবু জেলের মধ্যে অনেক সেফ। হাত-পা খোলা। প্রতিটি সপ্তাহে একবার বাড়ির লোক দেখে যেতে পারবে। জেলে থাকলে প্রাণে বেঁচে গেল। যেভাবে পুলিশ পটাপট করে নকশালদের থানার মধ্যে মারছে! সন্দীপ, কোনও চিন্তা কোরো না, আমি কালকের মধ্যেই ওদের আলিপুরে আনার ব্যবস্থা করছি।”

বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে এল। বাড়ির সবাই অনির জন্য অপেক্ষা করছে। অনি জানে হেমছায়া খুব শক্ত। অকারণে কোনওদিন হেমছায়াকে কাঁদতে দেখেনি অনি। অনিকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন।

“অনি, ইন্দ্রকে মেরে ফেলবে না তো?”

“কোনও ভয় পেয়ো না মা। ইন্দ্রকে যদি থানার থেকে জেলে নিয়ে যাওয়া যায়, তার চেষ্টা করছি।” আনন্দশেখর চুপচাপ। সি আর পি-র বাড়ি তছনছ হবার পর কেমন যেন অসহায় হয়ে গেছেন আনন্দশেখর। হঠাৎ অনির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠেন, ‘অনি, তুই বাড়ির বড় ছেলে, ইন্দ্রকে বাঁচাবার দায়িত্ব তোর।”

পরের দিন অনি আর আই এস আই গেল না। দু' সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। ইন্দ্রর ব্যাপারে এখন অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে। কাউকে চেনে না। ইন্দ্রর ব্যাপারে কার কাছে যাবে কিছুই বুঝতে পারে না। পরের দিন সন্দীপের সঙ্গে কেটে গেল। হাতকড়া বেঁধে ইন্দ্র আর তিন বন্ধুকে আনা হয়েছে। পরিষ্কার জামাকাপড়। রক্তের দাগ নেই। মুখগুলো যেন থেঁতলে দিয়েছে বেহালার পুলিশ। অনিকে দেখে ইন্দ্র হাত তোলে। ম্লান হাসি। কমল সেনের যুক্তিতে আলিপুর কোর্টের জজসাহেব চার নকশাল বন্দিকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। একটা ঢাকা কালো ভ্যানে অনির চোখের সামনে হাতকড়া বেঁধে চারজনকে তোলা হল। অনির বুকটা ফেটে যাচ্ছে ইন্দ্রকে দেখে।

“ইন্দ্র, কিচ্ছু ভাবিস না। তোর জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।”

“মাকে দেখিস, দাদা। মাকে বলিস আমার জন্য যেন চিন্তা না করে।” কথা শেষ না হতেই কালো ভ্যানটা ইন্দ্রকে নিয়ে কোথায় চলে গেল।

সন্দীপ পাশে দাঁড়িয়ে। "মন খারাপ করিস না অনি। চ, কোথাও বসে একটু খেয়ে নিই।"

টোস্ট আর চা খেতে খেতে সন্দীপ হঠাৎ বলে, "কিছু মনে করিস না অনি— ইন্দ্রর ব্যাপারে আমি আর কিছু করতে পারব না। আমার কাছে খবর এসেছিল— ওরা সুন্দরবনে গোসাবায় ছিল। বাড়িতে যে কোনওদিন একগ্লাস জল গড়িয়ে খায়নি— সে ছেলে কী করে চাষবাস করবে? ওরা নাকি ওখানকার জোতদারকে মারবার প্ল্যান করছিল। আরে বাপু, ভোজালি আর পিস্তল দিয়ে কি বিপ্লব আনা যায়? ইন্দ্রর মতে আমি ওদের শ্রেণীশত্রু— জোতদার। ইন্দ্র আর ওর নকশাল বন্ধুরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে— সেই বিশ্বাসে আমি ওদের শত্রু। হয়তো জামাইবাবু বলে, একক ব্যক্তি হিসেবে ইন্দ্রর আমি শত্রু নই। কিন্তু তুই তো জানিস, আবাদে, সুন্দরবনে আমাদের কাছারি বাড়িতে বন্দুক রিভলভার সবই আছে। নকশালরা যদি আমার জমি দখল করতে আসে, আমি কিন্তু ছেড়ে দেব না।"

অনি বুঝতে পারে নকশাল রাজনীতিতে ইন্দ্র আর সন্দীপ বিপরীত মেরুতে। এই সর্বনাশা রাজনীতিতে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

"থ্যাঙ্ক য়ু সন্দীপদা, ইন্দ্রর ব্যাপারে আপনাকে আর কোনওদিন বিরক্ত করব না।" এই বলে বেরিয়ে পড়ে অনি।

এই ভরদুপুরে কোথায় যাবে বুঝতে পারে না। ইন্দ্রর ব্যাপারে আত্মীয়স্বজন এর মধ্যে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। তাদেরও সব উঠতি বয়সি ছেলে আছে। সবাই যেন কেমন অচেনা, অজানা হয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা বাস আসতে ও উঠে পড়ল। কোথায় যাবে জানে না। কন্ডাক্টর আসতে বলে ওঠে, ডালহৌসি। পূর্ণিমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে চায় অনি।

টেলিফোন ভবনে অনি এর আগেও অনেকবার এসেছে সর্বাণীকে নিয়ে। পূর্ণিমাকে খবর দিতে উনি নীচে নেমে এলেন।

"অনি, ইন্দ্র ভাল আছে? তোমার ফোন পেয়ে আমি ঘণ্টা খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি। বাইরে চলো। চা খেতে খেতে সব শোনা যাবে। ইন্দ্রর ওপর আমার একটা দুর্বলতা আছে। তোমাদের বাড়ির মধ্যে ইন্দ্রই মেরুদণ্ড সোজা করে চলেছে। যখন আমাদের নিয়ে তোমাদের বাড়িতে অশান্তি, ইন্দ্রই যোগাযোগ রেখেছে, সর্বাণীকে নিয়ে বেড়াতে গেছে। ইন্দ্র মানুষের মতো মানুষ। ওর জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

অনির এই মুহূর্তে মনে হল ইন্দ্রর ব্যাপারে সাহায্য করার মতো মনের জোর বা সাহস কারও নেই— পূর্ণিমা ছাড়া।

"মনে হয়, আজকেই ইন্দ্রদের আলিপুর জেলে নিয়ে আসবে। সবাই বলছে জেলের ভেতর থাকাটা নাকি অনেক সেফ থানার চেয়ে।"

"শোনো অনি, আমাদের কাছে সব আনলিস্টেড ফোন নাম্বার আছে। আমি আলিপুর জেলের সুপারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারি। আমি সব খোঁজখবর নিয়ে রাখব। তুমি নিশ্চয়ই আই এস আই যাচ্ছ না। কালকে একসময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে, বিকেল তিনটে নাগাদ?"

"নিশ্চয়ই, কালকে আমি আসব আপনার অফিসে।"

পরের দিন পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা করে অনি টেলিফোন ভবনে।

"অনেক খবর আছে অনি। জেলসুপারের নাম নন্দদুলালবাবু। ইন্দ্রদের জেলে নিয়ে এসেছে সে খবর বলল। ওদের নাকি বেশ-কিছুদিন জেলের হাসপাতালে রাখবে। সেখানে খাওয়াদাওয়া ভাল। বিশ্রামও হবে। থানায় ওদের প্রচণ্ড মারধর করেছে। ইন্দ্র ঠিক আছে, কিন্তু ওদের একজনের নাকি পা ভেঙে দিয়েছে। ভাল কথা, রোববার রোববার বিকেল চারটের সময় ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে পারবে আলিপুর জেলে। মাসিমার ভাল লাগবে। যদি চাও, আমি তোমাদের বাড়ি আসতে পারি। সেখান থেকে আমরা সবাই মিলে আলিপুরে যাব।"

বাড়ি ফিরে এসে অনি সব কথা বলে। হঠাৎ হেমছায়া বলে ওঠেন, "জানিস অনি, পূর্ণিমাই পারবে ইন্দ্রকে জেল থেকে বের করতে। ওর পরামর্শ নিস। পূর্ণিমাই বাঁচাতে পারবে ইন্দ্রকে।"

অনির হঠাৎ মনে হল এই পূর্ণিমাকেই হেমছায়া আর আনন্দশেখর কী অপমান করেছিলেন। প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল, অভিমান হল অনির। কাকে যে কখন দরকার হয় এই জীবনের নাট্যশালায় আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কোন অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর এইসব লীলার খেলায় আমরা হাসছি, কাঁদছি— কে জানে?

রোববার বিকেল চারটের আগেই আলিপুরের জেলে হাজির— অনি, পূর্ণিমা, আর হেমছায়া। হেমছায়া একটা ঝোলানো ব্যাগে ইন্দ্রর জন্য জামাকাপড়, খাবারদাবার নিয়ে এসেছেন। অনি কিনেছে বেশ-কিছু চারমিনারের প্যাকেট আর ম্যাগাজিন। একটা ছোট ঘরে ইন্দ্রকে আনা হল। মুখে কাটা দাগগুলো অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। হেমছায়া ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠেন।

অনি ইন্দ্রকে ব্যাগটা দেয়। জামাকাপড়, খাবারদাবার পেয়ে খুশি। চারমিনার প্যাকেট দেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, "জেলে সিগারেটের খুব রেশনিং। এক সপ্তাহ আমার ভাবতেই হবে না। আর যাই করিস দাদা, সিগারেটের সাপ্লাইটা চালিয়ে যাস।"

"কী করে সময় কাটে তোর? জেলের খাবারদাবার কেমন?" হেমছায়া জিজ্ঞেস করেন?

"সুন্দরবনের পর সব খাবারই ভাল লাগে। আর জেলের ভেতরই তো আসল কাজ—ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পরিকল্পনা।" মাকে রাগাবার জন্য ইন্দ্র বলে।

"ইন্দ্র, জেলের ভেতর কোনওরকম বোকামি করিস না। জেল ভেঙে বের হবার কোনো পথ নেই। সাবধানে থাকিস। জেলের ভেতর আন্দোলন করে প্রাণটা দিস না। এইসব বোকা মারটরডমের কোনও মানে নেই। দেশ যেমন চলছিল তেমনি চলবে। মাঝখান থেকে বেশ-কিছু ভাল ছেলে হারিয়ে গেল চিরকালের জন্য।"

ইন্দ্র হঠাৎ রেগে যায়, "দাদা, এই নিয়ে তোর সঙ্গে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। এনাফ ইজ এনাফ।"

পূর্ণিমা কথা ঘোরাবার চেষ্টা করেন। "ইন্দ্র, জেলের মধ্যে তুমি তো বিপ্লবের গান লিখতে পার। সুর দিতে পার।"

"ঠিক ধরেছ। আমি গান লেখার চেষ্টা করছি। রাতের খাওয়া হয়ে গেলে একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে বিপ্লবের গান ছড়িয়ে পড়ে। অদ্ভুত লাগে তখন এই বিপ্লবের গান। 'ভাগীরথী তুমি মেকং নদীর সীমানা ভাঙো, আগুন জ্বালো'। রাত দশটার সময় জেলে আলো নিভিয়ে দেয়। জান তো? জেলে বালিশ দেয় না। আমাদের কংক্রিটের বাঁধানো বালিশ। একটা কম্বল একটা চাদর। ছারপোকায় ভর্তি। সারারাত জেগে জেগে কত কথা ভাবি। বাড়ির কথা, দেশের কথা, বিপ্লবের কথা।"

রবিবার রবিবার আলিপুর জেলে ইন্দ্রকে দেখা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। হেমছায়া পূর্ণিমা আর অনি যায়। কতদিন আলিপুর জেলে ছিল ইন্দ্র, মনে পড়ে না। হয়তো মাস চারেক। এরই মধ্যে জেলে নকশালদের আন্দোলন শুরু হল। পুলিশের সঙ্গে হাতহাতিতে বেশ-কিছু নকশাল জেলে মারা গেল। এখনও নামের তালিকা ওরা জানায়নি। অনি পূর্ণিমাকে ফোন করে— যদি ইন্দ্রর কোনও খবর আনতে পারেন জেল সুপারকে ফোন করে।

"অনি, সন্ধেবেলা চলে এসো নাকতলা, এর মধ্যে আমি সব খবর জোগাড় করে রাখব।"

সন্ধেবেলা অনি নাকতলা গেল পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা করতে। অফিস থেকে ফিরেছেন ক্লান্ত হয়ে। ছিমছাম, গোছগাছ ঘর। সর্বাণীর ছবি দেয়ালে। সর্বাণীর বিয়ের পর ভীষণ একা একা হয়ে গেছেন পূর্ণিমা। অনির খারাপ লাগছে পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে। মনে হচ্ছে ঋত্বিক ঘটকের এক চরিত্র, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত। তবু মাথা তুলে আছেন।

"সর্বাণী কেমন আছে, অনি? তোমরা বহুদিন আসনি এ বাড়িতে। ইন্দ্রর ব্যাপারে তোমরা খুব চিন্তিত জানি। তবু আমারও তো মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে করে?"

"সামনের শনিবার সর্বাণীকে নিয়ে নিশ্চয়ই আসব। ইন্দ্রর খবর পেলেন? ইন্দ্র কেমন আছে?"

"ইন্দ্র ভালই আছে, অনি। তবে বেশ-কিছু নকশাল মারা গেছে আলিপুর জেলে। ইন্দ্রদের সামনের সপ্তাহে দমদম জেলে ট্রান্সফার করছে। আমি দমদম জেলের সুপার অনিন্দ্য মুখার্জির সঙ্গে কথা বলেছি। ওখানকার ব্যবস্থা নাকি অনেক ভাল। সলিটারি সেলে রাখবে না। অনেকের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে। খাওয়াদাওয়া ভাল। ওখানকার ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা একই রকম। রোববার চারটের সময় দেখা করতে পারবে। প্রথমদিন আমিও তোমাদের সঙ্গে দমদম জেলে যাব ইন্দ্রকে দেখতে।"

ইন্দ্র জেলে যাবার পর আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউই মঞ্জুবীথিতে আসে না। হেমছায়ার মনে পড়ে প্রফুল্লনগর কলোনির কথা। তখন বাস্তুহারা কলোনিতে কোনও আত্মীয়স্বজন ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসত না। ইন্দ্রর ব্যাপারে আবার সবাই বর্জন করেছে। ইন্দ্রর জন্যে অনি কত লোকের সঙ্গে দেখা করেছে। সবাই অপারগ সাহায্য করতে। মনে আছে ইন্দ্রর এক প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা। ওর বাবা ডি আই জি। ইন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং-এ বহুবাব দেখা করেছে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। কিছুই হয়নি। ইন্দ্রর বড় পিসেমশাই শ্যামাপতি তখন মেদিনীপুর জেলের এস পি, মাঝে মাঝে বাঘাযতীনের বাড়িতে আসেন। বড় পিসির বাড়িতে ইন্দ্র যাদবপুরের পড়ার সময় কত সময় কাটিয়েছে। ইন্দ্রর ব্যাপারে বড়পিসেমশাই শ্যামাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেল ইন্দ্র। খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে শ্যামাপতিকে। মাসে একবার আসেন বাঘাযতীনের বাড়িতে চুপিচুপি। মেদিনীপুর পুলিশ কোয়ার্টারে একাই থাকেন শ্যামাপতি। তাঁরও জীবন সংশয়। কখন কে মেরে দেয় ঠিক নেই।

"শোন অনি, কাগজে তো পড়েই থাকিস মেদিনীপুরে ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে নকশালদের আন্দোলন। কত নিরীহ, পুলিশ, সাধারণ লোককে নকশালেরা মেরেছে বিপ্লবের নামে, জানিস না। আমি জানি। আমাকে সামলাতে হচ্ছে। আমার এক্তিয়ার মেদিনীপুরে। কলকাতার পুলিশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই। ইন্দ্রর ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। সরি অনি।"

অনি বুঝতে পারে ইন্দ্রদের চোখে পিসেমশাই শ্রেণীশত্রু। পিসেমশাইয়ের চোখে ইন্দ্র খুনি, সমাজবিরোধী। সন্দীপেরও তাই ধারণা ইন্দ্রর সম্পর্কে। ইন্দ্রর জন্য ওরা একঘরে হয়ে গেছে। কেউ আর আসে না। থমথমে মঞ্জুবীথিতে সময় কাটে ওদের।

একটা ঘটনা অনির মনে পড়ল। ইন্দ্র তখন দমদম জেলে। রবিবার রবিবার ওকে দেখতে যায় খাবারদাবার নিয়ে। ইন্দ্র এখন অনেক সুস্থ। জেলের ব্যবহার ভাল। অনি অনেকটা নিশ্চিন্ত। একদিন সকালবেলা অনি অফিসে যাবার জন্য তৈরি। হঠাৎ বাড়ির সামনে ছোটাছুটি, বোমার আওয়াজ। চিৎকার, চেঁচামেচি। তার পর সব চুপচাপ। অনি বেরিয়ে পড়ে অফিসের দিকে।

রাস্তা ফাঁকা। বাড়ির সামনেই একটা লোক রাস্তায় পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে চারিদিক। বুকে ভোজালিটা লাগানো। সেই সাদা শার্ট, ধুতি পরা, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে ওঠে, "অনিদা, দাঁড়াবেন না। শালা ইনফর্মারকে খতম করে দিয়েছি। আপনি তাড়াতাড়ি বাসস্ট্যান্ডে চলে যান। এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে। ইন্দ্রদের এই ব্যাটাই ধরিয়ে দিয়েছিল।"

অনির মনে হল কোথায় যেন মুখটা দেখেছে আগে। হঠাৎ মনে পড়ল এই লোকটাই একদিন ইন্দ্রর পেছন পেছন ফলো করেছিল বাড়ি পর্যন্ত। ইন্দ্রকে ঘটনাটা বলার পর উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, 'শালা ইনফর্মার।' এই লোকটাই ইন্দ্রদের ধরিয়ে দেয়।

রক্তে ভাসা সদ্যমৃত লোকটার কথা ভেবে গা গুলিয়ে উঠল অনির। হয়তো এর বাড়িতেও স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে। তাদের কী অবস্থা কে জানে? আজ রাতে পুলিশ নেবে এর বদলা। রাতে সি আর পি দিয়ে চড়াও হবে বাড়ি। কেউ যাবে জেলে, কেউ যাবে শ্মশানে। কতদিন চলবে এই অস্থিরতা, অমানুষিকতা কে জানে?

আর-এক দিনের কথা মনে পড়ে অনির। বেশ রাত করে বাড়ি ফিরছিল। বাস থেকে নেমে দেখে বেহালা থানার উল্টোদিকে কালীমন্দিরে আনন্দশেখর বার বার মাথা ঠুকে প্রণাম করছেন। আশ্চর্য হয়ে যায় অনি। বাবাকে কোনওদিনই পুজো আর্চা করতে দেখেনি। বাবা বিজ্ঞানের ছাত্র। ইন্দ্রর জেলে যাবার পর কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছেন আনন্দশেখর। রিটায়ার্ড লাইফ। সময় কাটে না। নানা ধরনের গাছগাছড়া দিয়ে বাড়িতেই ওষুধ তৈরি করেন। আনন্দশেখর বাড়ির দিকে হাঁটছেন। অনি পেছন পেছন হাঁটছে। অন্ধকার মাঠের মাঝে একটা বকুল গাছ। তার নীচে শিবলিঙ্গ। কতলোক পুজো দিয়ে যায়। অনি বাবাকে দেখছে। ভাঙা গলায় কেঁদে ওঠেন আনন্দশেখর শিবমন্দিরের সামনে—

"ঠাকুর, ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও আমাদের। আর কিছু চাই না।"

অনি চুপ করে বাবাকে দেখছে। মানুষ অসহায় হয়ে গেলে যখন নিরুপায়, তখন ভগবানের কাছে মাথা খোঁড়ে। যুগে যুগে, কালে কালে। সেই অন্ধকারে শিবমন্দিরের নীচে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনি কাউকে জানাবে না সেই কথা। সেই আর্তি, সেই বুকফাটা কান্না চিরন্তনের— সন্তানের কল্যাণকামনায় বাবা-মার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা: "কৃপা করো ঠাকুর। কৃপাহি কেবলম্। তুমি ছাড়া কোনও গতি নেই।"

"নানারোগোত্থদুঃখাদ্রুদনপরবশ শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রী মহাদেব শম্ভো।"

মঞ্জুবীথিটা কেমন যেন পোড়ো, ভৌতিক বাড়ি হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় অনেকে বলে "এই বাড়িতে নকশাল নেতা ইন্দ্র থাকত। এখন জেলে।" খেয়া শোনে এই সব কথা। মাকে জানায়। কেয়া আর সন্দীপ এখন আসে না এ বাড়িতে। আসে না বড়পিসি, মেজপিসি, কাকাকাকিমার দল। মামা-মামি কেউ আসে না। আসে না আনন্দশেখরের পুরনো বন্ধুবান্ধব। ইন্দ্রর জন্য সবাই এখন এ বাড়িতে আসা বন্ধ করেছে। অনি আর সর্বাণী একদিন এই কথা বলছিল পূর্ণিমার কাছে, নাকতলার বাড়িতে। ইন্দ্রর জন্য রবিবার আর আসা হয় না নাকতলায়। পূর্ণিমা এর জন্য অভিযোগ করে না।

"সত্যিই অনি, তোমাদের বাড়িটা কী জমজমাট ছিল। আজ কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। এর মধ্যে ঈশানও নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে। বি ই কলেজে সবসময় গণ্ডগোল লেগে আছে। কবে এরা পাস করবে ঠিক নেই। এর মধ্যে ঈশানদের কলেজ থেকে পুলিশ একবার জেলে নিয়ে গেছে ওদের ক্লাসের কুড়ি জনকে। ভাগ্যিস দিন দুয়েক থানায় ছিল। তোমাকেই ছুটে ছুটে যেতে হয়েছে হাওড়ায়— ঈশানকে ছাড়াতে। তোমাদের ওই বাড়িতে অভিশাপ লেগে আছে। ও বাড়ি ছেড়ে দাও অনি। এ পাড়ায় একটা নতুন বাড়ি উঠেছে। খুব সুন্দর বাড়ি। একতলা। বিরাট ছাদ। গ্রিল দেওয়া। রাস্তার ওপরেই। তিনটে ঘর। তোমরা বেহালা না ছাড়লে ইন্দ্রকে কখনওই ছাড়াতে পারবে না। পুরনো নকশাল বন্ধুরা মাঝে মাঝে খেতে অথবা শুতে আসবে। পুলিশ কিন্তু কড়া নজর রেখেছে তোমাদের বাড়ির ওপর। চলো-না, বাড়িটা দেখে আসি।"

সবাই মিলে নতুন বাড়ি দেখতে গেল। চারিদিকে খোলামেলা। বিরাট ছাদ। তিনটে ঘর। আধুনিক কায়দায় তৈরি। মোজেইক ফ্লোর। অনির দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। বাস, দোকানবাজার, সব-কিছুই খুব কাছে। বাড়িওয়ালা টালিগঞ্জে থাকে। ভাড়া মাত্র চারশো টাকা। অনি রাজি হয়ে যায়। সামনের মাসেই নতুন বাড়িতে আসবে। এখানে কেউ চিনবে না ওদের। ওরা আবার নতুন জীবন শুরু করবে। এ পাড়ায় সর্বাণীদের অনেক আত্মীয়-স্বজন। কাছেই বুদ্ধদেব বসু, তাপস সেন-এর বাড়ি। অনি নতুন বাড়ির কনট্রাক্ট সই করে মঞ্জুবীথিতে ফেরে। এখানে নকশাল আন্দোলনের আগুন নেই। সবাই নির্বিবাদী, মধ্যবিত্ত, সি পি এম। শান্ত পরিবেশ। বেহালার মতো দিনরাত পুলিশের ভ্যান ঘোরাঘুরি করে না।

অনি বাড়ি ফিরে নাকতলা বাড়ির কথা বলে। খেয়া বলে, "দাদা, স্কুলে যেতে পারি না। বন্ধুবান্ধবেরা টিটকারি মারে— মণিদার কথা বলে।" উৎসব বলে, "দাদা, ক্লাসেব বন্ধুরা আমাকে এড়িয়ে চলে, বলে 'ছোট নকশাল'।" আকাশ বলে, "কিছু ভাবিস না দাদা, আমার বন্ধুর ট্রাক আছে। বাড়ি পাল্টানোর সব ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দে।" আনন্দশেখর বলেন, "তোমরা যা ভাল বোঝ তাই

করো। এ বাড়িতে ইন্দ্রর সব স্মৃতি আমাকে গিলে ধরছে। নতুন জায়গায় গেলে ভালই লাগবে।"

হেমছায়া বলেন, "অনি, তোকে একটা কথা বলিনি।— যত তাড়াতাড়ি এ বাড়ি ছাড়ি, তত ভাল। গত সপ্তাহে একটা ছেলে রাত্রিবেলা এসে আমাকে ডেকে বলে, 'মাসিমা, কাগজের এই বান্ডিলটা রাখুন তো সাবধানে, পুলিশ আমাকে তাড়া করেছে। আমি দিন তিনেক পরে নিয়ে যাব।' চিনি না, জানি না ছেলেটাকে। কাগজ খুলে দেখি কয়েক হাজার টাকা। হয়তো কোনও ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে বা কাউকে মেরে টাকাটা নিয়েছে। কয়েকদিন ঘুমোতে পারিনি এই কখন পুলিশ এল বাড়ি সার্চ করতে। বালিশের ওয়ারের মধ্যে সেলাই করে টাকাটা রেখেছিলাম। কালকেই রাতে সেই ছেলেটা এসে টাকাটা নিয়ে গেল। আমি আর পারি না এখানে থাকতে। আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে চল।"

পরের দিন অনি সবাইকে নিয়ে গেল নাকতলার বাড়িতে। সবাই বাড়ি দেখে ভীষণ খুশি। অতবড় ছাদ দেখে আনন্দশেখর বলে ওঠেন, "ইন্দ্র জেলে যাবার পর আমাদের বাড়ি থেকে গানবাজনা উঠে গেছে। নতুন বাড়িতে এসে সন্ধেবেলা আমরা আবার শুরু করব গান-বাজনা। বেলুড়ের রামনাম সংকীর্তনম্।"

খেয়া বলে, "দাদা ভেবে দ্যাখ, মণিদা জেল থেকে ছাড়া পাবার পর এতবড় ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিটার বাজিয়ে গাইছে? কী দারুণ সারপ্রাইজ হবে তাই না?"

এক মাসের মধ্যে নাকতলার বাড়িতে ওরা চলে এল। বেহালার সেই থমথমে পরিবেশ থেকে সবাই যেন মুক্তি পেল বহুদিন পরে। পাশের ফ্ল্যাটে এক ভদ্রমহিলা, নীলিমা। দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে থাকে, বাচ্চাদের ফুটফুটে চেহারা, স্বামী মিলিটারি ডাক্তার। বাংলাদেশের যুদ্ধের জন্য বাইরে পোস্টেড। নীলিমাকে পেয়ে হেমছায়া খুশি। ঠিক যেন নিজের বোন।

বছর খানেক হয়ে গেছে ইন্দ্র দমদম জেলে। এর মধ্যে আকাশ বেরিয়ে পড়েছে জাহাজে, দেশে দেশান্তরে। প্রতি রবিবার অনি হেমছায়াকে নিয়ে যায় ইন্দ্রকে দেখতে। এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছেন হেমছায়া। মাঝে মাঝে পূর্ণিমা যান। ইন্দ্র প্রাণে বেঁচে আছে, এইটেই বড় পাওয়া হেমছায়ার কাছে। বেহালার কত ছেলে মারা পড়েছে পুলিশের গুলিতে, তাদের কথা ভাবলে কষ্ট হয়। ইন্দ্রর বেশ-কয়েকজন বন্ধু নিখোঁজ। সেদিন ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা করে ফিরছিল সবাই। সঙ্গে পূর্ণিমাও ছিল। জেলের গেটের সামনে দেখা হল এক সুদর্শন অফিসারের সঙ্গে। উল্টোদিক দিয়ে আসছিল। পূর্ণিমা বলে ওঠে, "এই বোধহয় জেলসুপার অনিন্দ্য মুখার্জি। ইন্দ্রর ব্যাপারে এর সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছি ফোনে। দেখি আলাপ করতে পারি কি না?"

"নমস্কার, আপনি কি অনিন্দ্যবাবু?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"আমার নাম পূর্ণিমা মিত্র। টেলিফোন ভবন থেকে ইন্দ্র চ্যাটার্জির জন্য আপনাকে অনেকবার ফোন করে বিরক্ত করেছি। এই হচ্ছে ইন্দ্রর বড়দাদা অনির্বাণ। আই. এস. আই.-তে কাজ করে। আমার জামাই। আর ইনি হচ্ছেন ইন্দ্রর মা।"

"নমস্কার।" হাত তুলে প্রণাম জানায় অনিন্দ্য। "ইন্দ্রকে তো ভালই দেখলেন. তাই না?"

"ইন্দ্রকে অনেক ভাল দেখাচ্ছে। আমাকে বলে, দাদা, কতদিন গিটারটা বাজাই না। খুব বাজাতে ইচ্ছে করে।"

"জানি। ইন্দ্র বড় মিউজিশিয়ান। তবে জেলের মধ্যে এসব মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিষেধ। আমার সঙ্গে ইন্দ্রর অনেক ব্যাপারে আলোচনা হয়— সাহিত্য, পলিটিক্স, মিউজিক— বেশ চৌখস ছেলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা হয় না। আমি জেলে গিয়ে একটু কাজ সেরে আসি। পাঁচ মিনিটও লাগবে না। আমার কোয়ার্টারে চলুন। কাছেই। ওখানে একটু চা খাবেন। তখন ইন্দ্রর গল্প শোনা যাবে।"

অনিন্দ্য চলে যেতেই হেমছায়া বলেন, "পূর্ণিমা, এইটুকু ছেলে অনিন্দ্য, ইন্দ্রর বয়সি হবে। এত বড় জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট? কী করে হয়?"

"মাসিমা, এরা সব য়ুনিভার্সিটির ভাল ছেলে। হয়তো আই পি এস পরীক্ষা দিয়ে এই অল্প বয়সে সুপার হয়েছে। এরা ইচ্ছে করলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সব হতে পারত।"

একটু পরেই অনিন্দ্য ফিরে আসে।

"চলুন, আমার কোয়ার্টারে।" হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌঁছে যায়। অনিন্দ্য সবাইকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে। বেয়ারা এসে চা শিঙাড়া দিয়ে গেল।

"আপনারা ইচ্ছে করলে বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে নিতে পারেন। পরিষ্কার তোয়ালে আছে।"

অনির অনিন্দ্যকে দেখে খুব ভাল লাগল। কেমন যেন আন্তরিকতা। বুক শেলফ ভর্তি বই। কিছু কবিতার, কিছু ফিজিক্সের, কিছু উপন্যাস, কিছু আইনের। দেওয়ালে কিছু ছবি। ফর্সা, সুন্দর মুখ। দারুণ স্মার্ট দেখতে অনিন্দ্যকে।

"আপনি মনে হচ্ছে ফিজিক্সের ছাত্র ছিলেন?"

"ঠিক ধরেছেন। আমি ইন্দ্রদের সমসাময়িক। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমি ইন্দ্রকে চিনতাম। ও আমাকে চিনতে পারেনি। ইন্দ্র আগে খুব পপুলার ছিল। গান বাজনা, গিটারের জন্য মেয়েরা ওকে ঘিরে ধরে রাখত। কফি হাউসের এক কোণে বসে যখন আমরা ফিজিক্সের ইকোয়েশন করতাম, ইন্দ্র তখন আর-এক কোণে

মেয়েদের নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সিনেমা, থিয়েটার, নাটক, রাজনীতি— সব বিষয়ে ইন্দ্র তখন সবার সেরা। আমরা ছিলাম বুক ওয়ার্ম। সত্যেন বোস আইনস্টাইনের গল্প শুনে ভেবেছিলাম আমিও একদিন ফিজিসিস্ট হব। এম এস্‌সি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও পুরো এক বছর বেকার ছিলাম। আস্তে আস্তে বাস্তব ধাক্কা মারছে। কলকাতায় কোথাও একটা চাকরি পেলাম না। ইচ্ছে ছিল বিদেশে যাব। আমি বিধবা মা'র একই ছেলে। অনেক কষ্ট করে মা পড়িয়েছেন। মাকে ছেড়ে বিদেশে যেতে নিজেকে স্বার্থপর লাগল। পেন স্টেটে একটা স্কলারশিপও পেয়েছিলাম ডক্টরেট করার জন্য। মাকে ছেড়ে যেতে পারলাম না। ভবানীপুরের একটা কোচিং-এ তখন অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়াচ্ছি। ঠিক করলাম আই এ এস পরীক্ষা দিই। আই পি এস পেয়ে গেলাম। এখন জেলের ঘানি টানছি। সত্যি মানুষ কত স্বপ্ন দেখে। ইন্দ্ররা স্বপ্ন দেখে নতুন করে দেশ গড়বার, আমরা স্বপ্ন দেখেছি বিজ্ঞানে গবেষণা করার। ঘুম ভেঙে দেখি ভোঁ ভাঁ। কারও স্বপ্নই সত্যি হয়নি। সবচেয়ে ট্রাজেডি কী জানেন? আমি এখনও ফিজিক্সের বইয়ের পাতা ওল্টাই। মাঝে মাঝে ভাবি এই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোনও কলেজে পড়াই। ব্লাক বোর্ডে বড় বড় ইকোয়েশন লিখে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিই। অঙ্কে আমি চিরকালই ভাল ছিলাম।"

হেমছায়া তাকিয়ে আছেন অনিন্দ্যর দিকে। ইন্দ্রর ভাগ্য, ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ইন্দ্রর বয়সি এক সুন্দর সপ্রতিভ ছেলের হাতে।

"বাবা অনিন্দ্য, ইন্দ্রর চিন্তায় চিন্তায় দেড় বছর আমি ঘুমোতে পারিনি। তুমি করে বলছি বাবা। তোমায় দেখে আমি নিশ্চিন্ত। আমি জানি ইন্দ্রর কোনও ক্ষতি হবে না এখানে। তোমার হাতে ওর ভাগ্য সঁপে দিলাম।"

"আপনি চিন্তা করবেন না মাসিমা। ইন্দ্র ভালই থাকবে। ভাল কথা, সামনের সপ্তাহে যখন দেখা করতে আসবেন— আপনারা একঘণ্টা আগে আসুন— তিনটে নাগাদ। আমিও থাকব। গিটারটাও নিয়ে আসবেন। দেখি মাঝে মাঝে ওকে গিটারটা বাজাতে দিতে পারি কি না।"

ফেরার পথে হেমছায়া বলেন, "জানো পূর্ণিমা, ইন্দ্রর জন্য সবাই আমাদের ত্যাগ করেছে। তুমি আজ একটা বিরাট উপকার করলে অনিন্দ্যর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে। ওকে দেখে আমি কী ভরসাই পেলাম। ভগবান এতদিন পরে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। মনে হল এ যাত্রা ইন্দ্র বেঁচে গেল।"

অনি মনে মনে ভাবে, 'ইন্দ্রদের চোখে অনিন্দ্যও কি শ্রেণীশত্রু?'

অনিন্দ্যর জন্য ইন্দ্রর সঙ্গে ইন্টারভিউ অনেক সহজ হয়ে গেল। ওরা তিনটের সময় যায়। ঘণ্টাখানেক সময় কাটায় ইন্দ্রর সঙ্গে। ইন্দ্র মাঝে মাঝে গিটার বাজায়। মাঝে মাঝে হেমছায়াকে রাগাবার জন্য বলে ওঠে সাংকেতিক ভাষা, "আর কেন?

এবার 'ছোজা'কে একদিন রান্না করে খাইয়ে দাও। 'ছোজা' মানে ছোট জামাই। খেয়ার সঙ্গে ছোজাকে মানাবে ভাল।" ইন্দ্র টিপ্পুনি কাটে।

"সেজো ছেলে যায় খুন করে জেলে
ছোট জামাই তারে ছাড়াইয়া আনে
লালন ফকির বলে শোনো ভাই কথা
কতই রঙ্গ দেখি কালে কালে।"

বাউল গানের মতো গেয়ে ওঠে ইন্দ্র। কথায় কথায় গান বাঁধতে পারে ইন্দ্র।

"আস্তে ইন্দ্র, 'ছোজা' শুনতে পাবে।" হেমছায়া হাসতে হাসতে বলেন।

অনিদের নাকতলার নতুন বাড়ি থেকে পূর্ণিমার বাড়ি কাছেই— একটা গলি পেরিয়ে। পাঁচমিনিটের হাঁটা পথ। অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিনই অনি আর সর্বাণী পূর্ণিমার কাছে যায়। অনেকক্ষণ গল্প করে। মেয়েকে কাছে পেয়ে পূর্ণিমা খুব খুশি। সেদিন পূর্ণিমা বললেন, "সিনেমা দেখতে যাবে অনি? মিনা মামার নতুন বই 'কলকাতা একাত্তর'?"

চিত্র-পরিচালক মৃণাল সেন পূর্ণিমার নিজের মামা। স্বামী মারা যাবার পর পূর্ণিমা সর্বাণীকে নিয়ে চারু মার্কেটের কাছে একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন। একটা নেপালি আয়া ছিল। সর্বাণীকে সারা দিনের জন্য দেখত। সর্বাণীর তখন বছর দুয়েক বয়েস। পূর্ণিমার সারাদিন টেলিফোন ভবনে কাটে। সন্ধেবেলা তাড়াতাড়ি ফেরেন। মেয়েকে দেখার জন্য সারাদিন মন ছটফট করে। এই কোনও বিপদ হল কি না। চারু মার্কেটের বাড়িতে প্রায়ই মৃণাল সেন আসতেন। তখন তিনি সংগ্রামী পরিচালক। দু-একটা ফিল্ম করার চেষ্টা করছেন। বাড়িতে সংসার চলে না। এর মধ্যে একটা ছেলে হয়েছে মিনা মামার। কুণাল নাম। সর্বাণীর চেয়ে ছোট হবে বছর খানেকের। টালিগঞ্জে যাবার পথে মাঝে মাঝে পূর্ণিমা আর সর্বাণীকে দেখে যেতেন মিনামামা। মাঝে মাঝে টাকা ধার চাইতেন: 'পূর্ণিমা, তোর কাছে দশ টাকা আছে? ডিরেক্টর যদি স্টুডিয়োত ট্যাক্সি থেকে না নামে কেউ পাত্তা দেয় না।' পূর্ণিমা ছিল মিনামামার দুঃখের দিনের বন্ধু। মিনামামা চিরকাল পূর্ণিমা ও সর্বাণীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন।

"অনি, মিনামামা আমাকে তিনটে টিকিট পাঠিয়েছেন। প্রিয়া সিনেমায় মিনামামার নতুন বই 'কলকাতা একাত্তর'-এর প্রিমিয়ার। কালকে সন্ধেবেলা। তার পর ওখান থেকে ওঁর ফ্ল্যাটে যেতে বলেছেন। তোমার মতামত শুনতে চান ফিল্মটা নিয়ে। কালকে ছুটির দিন। আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। তোমার কোনও কাজ নেই তো?"

অনির হঠাৎ মনে হল ইন্দ্র জেলে যাবার পর কোনও সিনেমা, থিয়েটার দেখেনি বছর দেড়েক। সর্বাণীকে নিয়েও কোথাও বেড়াতে যায়নি। আই এস আই-এর

কাজকর্ম শিথিল। ইন্দ্রকে জেল থেকে বের না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না অনি।

পরের দিন পূর্ণিমা, সর্বাণী ও অনি প্রিয়া সিনেমায় মৃণাল সেনের 'কলকাতা একাত্তর'-এর প্রিমিয়ার শো দেখতে গেল। তিরিশ বছর আগেকার বই— পুরো ঘটনা মনে নেই। সেই সময় অনির অসাধারণ লেগেছিল 'কলকাতা একাত্তর'। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায়— দারিদ্র্যের, বঞ্চনার, আর শোষণের ইতিহাসের এক দলিল। অনি যেন মৃণাল সেনের ছবিতে ওদের পরিবারের সব ঘটনা দেখতে পেল তিনটি পরিচ্ছেদে। প্রথম পর্ব ১৯৪৩ সাল। বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষে অনির জন্ম। মার মুখে কত গল্প শুনেছে এই দুর্ভিক্ষের, 'মা গো একটু ফ্যান দাও মা।' মৃণাল সেনের ছবির প্রথমে দেখতে পেল দুর্ভিক্ষের সেই হাহাকার— রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার দেহ, না খেতে পেয়ে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু। দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫৩ সাল। দেশ বিভাগের জ্বালা, ব্যর্থতা। দ্বিতীয় পর্ব দেখে অনির মনে পড়ে কলোনির বাড়ির কথা। বৃষ্টি আর কালবৈশাখীর ঝড়ে টালির ছাদ থেকে জল পড়ছে ঘরের ভেতর। পিসিমা রান্নার হাঁড়ি, কড়াই পেতে দিয়েছে ঘরের নানা জায়গায়— যেখানে ছাদ থেকে জল পড়ছে। সেই বৃষ্টির রাতে সিনেমার শ্যামা মেয়েটার মতো আকাশ ছাতা ধরে থাকত ঘরের ভেতর। ওদের ঘরে এইরকম একটা উঁচু খাট ছিল। ঝড়-বাদলার দিনে ছোট ছোট ভাইবোনেরা খাটের নীচে চলে যেত। মৃণাল সেনের ছবির মতো কলোনির বাড়িতে অনি মার কোলে সবসময় একটা বাচ্চা দেখেছে। ঝড়জলের রাতে হেমছায়া আগলে রাখতেন কচি শিশুকে কোলে করে। তৃতীয় পর্ব সাল। বেহালায় তার দারুণ অভিজ্ঞতা অনির। ময়দানের নকশাল যুবককে দেখে অনির মনে পড়ে ইন্দ্রকে। শেষের দিকে পুলিশের তাড়া খেয়ে এ পাড়া থেকে ও পাড়া ছোটাছুটি করেছে ইন্দ্র। সিনেমার নকশাল নায়কের মতো ইন্দ্রকেও বলতে শুনেছে— "চারিদিকে এত অত্যাচার, অবিচার। লোকে কী করে নিস্পৃহ, নিশ্চিন্ত হয়ে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারে— বুঝি না। জানিস দাদা, চারিদিকে করাপশনে ভরে গেছে। ট্রিংকা, মুলারোজ পার্ক স্ট্রিটের এই অভিজাত রেস্টুরেন্টে বাজাবার সময় দেখেছি ওপরতলার ঘুণধরা সমাজ। 'কলকাতা একাত্তর'-এর ব্যান্ড দেখে মনে হচ্ছে যেন ইন্দ্রদের ব্যান্ড 'ব্ল্যাক ক্যাকটাস' বাজাচ্ছে। অনির মনে আছে, সেই সময় 'কলকাতা একাত্তর' গভীরভাবে দাগ কেটেছিল ওর মনে।

প্রিয়া সিনেমার পেছনেই মৃণাল সেনের ফ্ল্যাট। বেশ-কিছু ফিল্মের লোক এসেছেন সিনেমার পর। ভিড়ের মধ্যে মৃণাল সেন অনিকে জিজ্ঞেস করেন, "অনির্বাণ, কেমন লাগল কলকাতা একাত্তর।"

"অপূর্ব, এমন বলিষ্ঠ ছবি বাংলা সিনেমায় কখনও দেখিনি। মনে হয় যেন

আমাদের বাড়ির ঘটনা তুলে ধরেছেন। কলকাতার ওপর এই শতাব্দীর তিনটে মর্মান্তিক পরিচ্ছেদ। সত্যি, চোখের সামনে অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ঘটছে— যুগে যুগে— প্রতিবাদ করার কেউ নেই। আপনি দারুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজের এই বঞ্চনার ইতিহাস। দারুণ লেগেছে বইটা।”

“অনির্বাণ, তোমার বউ-এর কিন্তু দারুণ প্রতিভা গানে, কবিতায়, শিল্পে। ছোটকাল থেকে সর্বাণীকে দেখেছি। আমার আগের বই ‘ইন্টারভিউ’তে শেষ মুহূর্তে নায়িকার কথা ডাবিং করাই সর্বাণীকে দিয়ে। কেউ বুঝতেই পারেনি যে নায়িকার গলা সর্বাণীর।”

“ভাল কথা— পূর্ণিমার কাছে শুনেছি তোমার ভাই ইন্দ্র এখন দমদম জেলে। এই নকশাল আন্দোলনে তোমাদের বাড়ির মতো কত বাড়ি ভেঙে গেছে। কত ছেলে মারা গেছে পুলিশ আর সি আর পি-র গুলিতে। কত ছেলে নিরুদ্দেশ, কত ছেলে জেলে। আমার পরবর্তী ছবি ‘পদাতিক’ এই নকশাল আন্দোলনের ওপর করার ইচ্ছে। তোমার মুখে শুনেছিলাম ইন্দ্র নাকি ফিল্ম লাইনে ইন্টারেস্টেড। আমার পুণা ফিল্ম ইনস্টিট্যুটে অনেকের সঙ্গে চেনাজানা আছে। জেল থেকে বের হবার পর ইন্দ্র যদি ফিল্ম লাইনে ক্যারিয়ার করতে চায়— আমি পুণাতে চেষ্টা করতে পারি। আমাকে জানিয়ো কিন্তু। ইন্দ্র খুব ভাল ডিরেক্টার হতে পারবে। ও জীবনের উঁচু-নিচু— সব দেখেছে।”

মৃণাল সেনের আন্তরিকতা অনির খুব ভাল লাগে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ইন্দ্রর কথা সযত্নে এড়িয়ে চলে। তবু মৃণাল সেন খোঁজ নিলেন, আশ্বাস দিলেন। মনে মনে ভাবে, কত বড় নৈতিক সাহস থাকলে নকশালদের দিয়ে বই করার ইচ্ছে পোষণ করেন মৃণাল সেন।

ট্যাক্সি করে ফেরার সময় পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করেন, “অনি, মিনামামা তোমাকে কী বলছিল, আলাদা ডেকে?’

“আমার মতামত জানতে চাইলেন ‘কলকাতা একাত্তরের’ ওপর। আমি বললাম অসাধারণ, এ ছাড়া ইন্দ্রর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।”

সর্বাণী বলে, “আমি পুরো বইটা বুঝতে পারিনি। কেমন যেন কোলাজের মতো— কাটা কাটা ছবি দিয়ে জোড়া।”

* * *

আই এস আই-এ একদিন অনিন্দ্যর ফোন পেয়ে চমকে গেল অনি। ইন্দ্রর কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? তখন বিকেল চারটে বাজে। “অনির্বাণবাবু, আপনি একটু আমার কোয়ার্টারে আসতে পারবেন? ভাল খবর আছে। ফোনে বলা যাবে

না। ইন্দ্র ভালই আছে। চিন্তা করবেন না। আপনি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। আমি কোয়ার্টারে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

আই এস আই থেকে দমদম জেল কাছেই। অনি পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা চা বিস্কুট দিয়ে গেল।

"বেশ কিছুদিন আগে দিল্লির হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা একটা কনফিডেনসিয়াল মেমো পাই। যেসব নকশাল বন্দীদের হত্যা বা খুনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তাদের অ্যামনেস্টি দেওয়া হবে। যদিও প্রত্যেকের নামে তিন-চারটে খুনের অভিযোগ— বেশির ভাগই ফল্স। আমি ইন্দ্রর সঙ্গে কথা বলেছি। ও 'হ্যাঁ না' কিছুই বলবে না। আমরা যতদুর খবর পেয়েছি ইন্দ্র কোনও অ্যাকশন কমিটিতে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল না। ও ছিল তাত্ত্বিক নেতা। যে-সব নকশালদের প্রথম ব্যাচে ছাড়া হবে ইন্দ্র তাদের মধ্যে একজন।"

অনি ভাবতে পারছে না ইন্দ্র ছাড়া পাবে। "কবে নাগাদ ইন্দ্র ছাড়া পেতে পারে অনিন্দ্যবাবু?"

"খুব তাড়াতাড়ি। দু' সপ্তাহের মধ্যে। সেলের মধ্যে যেমন সেফ ছিল বাইরে কিন্তু ওদের শত্রু অনেক। যে-কোনও মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে। আপনাদের কোনও আত্মীয়স্বজন আছে বম্বে, দিল্লি অথবা ব্যাঙ্গালোরে? ছাড়া পাওয়ার পরের দিনেই ইন্দ্রকে কলকাতা ছাড়তে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন ইন্দ্রর এক সেফ হেভেন খোঁজার জন্য। দরকার হলে আপনি আমাকে যোগাযোগ করবেন। ভাল কথা, ইন্দ্রর ব্যাপারটা একদম গোপন রাখবেন যতদিন ও কলকাতা ছেড়ে বাইরে না যাচ্ছে।"

"আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না অনিন্দ্যবাবু। থ্যাঙ্ক য়ু সো মাচ।"

"ইউ আর ওয়েলকাম।'

ইন্দ্রর জেল থেকে ছাড়া পাবার কথা শুনে আনন্দশেখর ও হেমছায়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু ইন্দ্রকে পাঠাবেন কোথায়? কোনও আত্মীয়স্বজন কলকাতার বাইরে থাকে না। ইন্দ্র থাকবে কোথায়? অনির হঠাৎ মনে পড়ল শম্ভুদার কথা। ওদের দূর সম্পর্কের ভাই। অনিরা কলেজ থেকে একবার জব্বলপুরে জিওলজি ফিল্ডে গিয়েছিল। সেবার গিয়ে শম্ভুদার বাড়িতে ছিল দিনদুয়েক। শম্ভুদা জব্বলপুরের টেলিফোন ভবনের ইঞ্জিনিয়ার। পুরনো ডায়েরিতে ফোন নম্বর আর ঠিকানাটা পেয়ে গেল। ঠিক হল ইন্দ্রকে শম্ভুদার বাড়িতে জব্বলপুরে পাঠানো হবে। পরের দিন অনি শম্ভুদাকে ট্রাঙ্ক-কল করে ইন্দ্রর সব খবর জানায়। পূর্ণিমাই যোগাযোগ করে দেন লাইনটা।

শম্ভুদা বলে, 'অনি, কোনও চিন্তা করিস না। জব্বলপুর খুব শান্ত নিরাপদ জায়গা। আমাদের বাড়িতে ইন্দ্র থাকুক। আর ওর যখন সায়েন্সে ডিগ্রি আছে

ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি পেয়ে যাবে। আমার অনেক চেনাজানা লোক আছে। ইন্দ্র ইজ মোর দ্যান ওয়েলকাম হিয়ার।

এর মধ্যে অনি আর-একবার অনিন্দ্যর সঙ্গে দেখা করে এসেছে। ইন্দ্রর রিলিজ অর্ডার বেরিয়ে গেছে। সামনের শুক্রবার দুটোর সময় ইন্দ্র ছাড়া পাবে জেল থেকে। মুক্তির আনন্দ।

"অনির্বাণবাবু, দমদমে আসার সময় সঙ্গে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন। যদি সাহসী কোনও বন্ধু থাকে তাকেও নিয়ে আসবেন। আমার চিন্তা হচ্ছে বাড়ি যাবার পথে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। ইন্দ্রদের এখন ঘরে বাইরে শত্রু। ওকে যত তাড়াতাড়ি পারেন কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেবেন।"

অনি ঠিক করল শ্যামলমামাকে নিয়ে যাবে ইন্দ্র জেল থেকে ছাড়াবার দিনে। শ্যামলমামা আর্ট কলেজের প্রফেসর। হেমছায়ার খুড়তুতো ভাই। ছ' ফুটের ওপর লম্বা— ফর্সা লাল টুকটুকে সাহেবের মতো দেখতে। কত মজার মজার গল্প করে। গায়ে প্রচণ্ড জোর। ইন্দ্রকে খুব ভালবাসে। শ্যামলমামাকে বলতেই রাজি হয়ে যায়। "কী বলিস অনি, ইন্দ্রকে আনতে আমি যাব না? জানিস মনে মনে আমি কত প্রাউড ইন্দ্রকে নিয়ে। আমার এত বড় শরীর— কোনওদিন কিছু করতে পারলাম না, আর ওরা দিনের পর দিন পুলিশ আর সি আর পি-র সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। দেখ, ইন্দ্র জেলে যাবার খবর শুনে কতদিন ভেবেছি ছোড়দির সঙ্গে দেখা করে আসব। বেহালার গণ্ডগোলের জন্য যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই ফাঁকে ছোড়দির কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নেব তোদের নাকতলা বাড়িতে।" শ্যামলমামা আন্তরিকভাবে বলে।

নির্দিষ্ট দিনে শ্যামলমামাকে নিয়ে অনি দমদম জেলে হাজির। পার্ক স্ট্রিট থেকেই শ্যামলমামাকে ট্যাক্সিতে তুলে দমদমে এসেছে। শ্যামলমামা খাকি প্যান্ট আর শার্ট পরে এসেছে। মনে হচ্ছে এয়ারফোর্সের কোনও অফিসার। জেলের গেটের ভেতর ঢুকতেই সেপাইরা খটাখট সেলাম ঠুকে দিচ্ছে শ্যামলমামাকে— ভেবেছে দিল্লির কোন বড়সাহেব। শ্যামলমামা গম্ভীরভাবে পাল্টা সেলাম জানায়। অনিন্দ্য দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। অনি আলাপ করিয়ে দেয়। "ভাল লোককেই সঙ্গে এনেছেন। মামার দেখি ভাগ্নের চেয়ে গায়ে জোর বেশি!" শ্যামলমামার পাল্টা উত্তর: "আপনি মশাই ভাগ্যবান। সারাটা পথ ট্যাক্সিতে অনি আপনার গুণগান করতে করতে এসেছে। আপনি কি বৈষ্ণব জেলার প্রভু নিত্যানন্দ? 'মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না'?"

অনিন্দ্য হো হো করে হাসতে থাকে।

"এক্ষুনি ইন্দ্র এসে পড়বে। ভাল কথা, ঠিক করেছি আপনাদের সঙ্গে আমি যাব

ইন্দ্রকে পৌঁছে দিতে। তার পর ফিরে আসব। রাস্তায় নানা ধরনের গণ্ডগোল হতে পারে। আমার সঙ্গে রিভলভার আছে। চিন্তা নেই।"

ইন্দ্র বাইরে এসে অনিকে জড়িয়ে ধরে। শ্যামলমামাকে দেখে আশ্চর্য!

"কেমন লাগছে ইন্দ্র বাইরে বেরিয়ে?"

'মনে হচ্ছে খাঁচার পাখি মুক্তি পেয়েছে। বাইরের আকাশটা এত বড়, বাতাসটা এত সুন্দর, ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে রাস্তা দিয়ে একটু ছুটি। ছুটতে ছুটতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাব তখন ঘাসে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখব। কতদিন আকাশের তারা দেখিনি। দেখিনি অমাবস্যা আর পূর্ণিমার আকাশ। আলো-অন্ধকারের জোয়ার ভাটা। পাখির ডাক। ছেলেমেয়েদের হাসি কান্না।"

হঠাৎ গান গেয়ে উঠে ইন্দ্র

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে।"

ইন্দ্র ছুট লাগায় জেলের গেট পর্যন্ত।

একটু পরে অনি ইন্দ্রকে ট্যাক্সিতে তুলে নেয়। সঙ্গে অনিন্দ্য আর শ্যামলমামা। সারাটা পথ গল্প করতে করতে ওরা নাকতলা পৌঁছে গেল। রাত্রিবেলা অনিন্দ্য আর শ্যামলমামা থেকে গেল নাকতলার বাড়িতে।

ইন্দ্র জেলের মধ্যে বিরাট দাড়ি রেখেছে। প্রথমে এসেই দাড়ি কামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। রাত্রিবেলা বিরাট ছাদে কত গান ইন্দ্র শোনাল সবাইকে। আনন্দশেখর, হেমছায়া, ভাইবোন সব খুশি। পরের দিনই ইন্দ্র জব্বলপুর চলে যাচ্ছে শম্ভুদার কাছে। অনি আগে থেকে ট্রেনের রিজার্ভেশন করে রেখেছিল।

খেয়া বলল— "দাদা, বলেছিলাম না এই ছাদে একদিন মণিদা গান গাইবে। দেখলি তো আমার কথা ঠিক।"

১৪

অনি এবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। সারারাত দু'চোখে ঘুম আসেনি। ইন্দ্রর কথা ভাবতে ভাবতে রাতটা কাটল ব্যাঙ্কক হোটেলে। এবার কলকাতা ফেরার পালা। মা'র কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইন্দ্র আর নেই। ঘরের মধ্যেই একটা কফি পট। কিছু বিস্কুট। কফি মেকারটা চালিয়ে অনি স্নান করতে ঢোকে। চিরকালই ভোর ভোর স্নান করার অভ্যেস। বাথরুম থেকে এসে জামাকাপড় পরে তৈরি হয়। ভালই লাগছে ভোরের কফি। জিনিসপত্র মোটামুটি গুছিয়ে তৈরি হয়ে নেয়। একটা হালকা সুটকেস। সকাল আটটার মধ্যেই হোটেল থেকে চেক আউট

করে এয়ারপোর্ট চলে আসে। কাস্টমস পেরিয়ে থাই এয়ারলাইনসের লাউঞ্জে এসে বসে। প্লেন সকাল দশটা নাগাদ ছাড়বে। পৌঁছবে কলকাতায় দুপুর বারোটায়। ঈশান এয়ারপোর্টে আসবে। ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতা ঘণ্টা চারেক লাগবে।

হালকা ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ইন্দ্রর কথা ভাবতে শুরু করল অনি। ভাবছে নিজের কথা। জেল থেকে ছাড়া পাবার বছর দুয়েক হয়ে গেছে। ইন্দ্র জব্বলপুর থেকে ভূপালে চাকরি নিয়ে গেছে। ব্রিটিশ কোম্পানি 'মে অ্যান্ড বেকারের' মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন্দ্র চ্যাটার্জি। জব্বলপুর থাকতেই একটা ব্যান্ড তৈরি করেছে ইন্দ্র। আবার গানবাজনায় ফিরে গেছে। চাকরিটাও ভাল। ভালই আছে ইন্দ্র। মাঝে একবার ফিল্ড করতে পাঁচমারি গিয়েছিল অনি। ইন্দ্র তখন অনির সঙ্গে ছিল কয়েকদিন। ফেরার সময় ইন্দ্রদের বাড়ি ভূপালে গিয়েছিল। চার বন্ধু একটা বিরাট বাড়ি নিয়ে আছে। সবাই বাঙালি, তিনজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, একজন ডাক্তার। রান্নাবান্নার জন্য একজন মুসলমান বাবুর্চি। ইন্দ্রকে দেখে ভালই লাগল অনির।

এর মধ্যে আকাশ জাহাজ থেকে ফিরেছে। ঈশান বি-ই কলেজ থেকে পাস করে বাড়িতে বসে আছে। চিত্রাংশুতে ছবি আঁকা শিখছে, বাঁশি বাজাচ্ছে, সেতার বাজাচ্ছে। চাকরি করবার খুব একটা ইচ্ছে নেই। সর্বাণী গোখেল থেকে পাস করে জিওগ্রাফি নিয়ে এম এ পড়ছে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে। গান শিখছে সুচিত্রা মিত্রর কাছে রবীন্দ্রসংগীত, মঞ্জু গুপ্তার কাছে অতুলপ্রসাদ। একদিন গোলপার্কের কাছে নির্মলায় ধোসা খেতে খেতে সর্বাণী হঠাৎ বলে, "অনি, আমি বোধহয় প্রেগন্যান্ট। বাবা হবার জন্য তৈরি হও।"

প্রেগনেন্সির শেষ দিকে সর্বাণী পূর্ণিমার কাছে থাকত। মার যত্নে অনেকটা নিশ্চিন্ত। কলেজ যতদিন পারে চালিয়ে গেছে। অনির মাথায় অনেক দায়িত্ব এখন। আই এস আই-তে প্রতিদিনই যায়। কেমন যেন পরিবেশটা ভাল লাগছে না। ফাইটোসরের ওপর কাজটা শেষ হয়েছে। পেপারটা রিভিউয়ের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিওন্টলজি বিভাগের চেয়ারম্যান জোসেফ গ্রেগরির কাছে পাঠিয়ে দিল। কলকাতা, বরানগর-নাকতলা কিছুই ভাল লাগছে না। নতুন প্রজন্মের কথা ভেবে ওর বেরিয়ে পড়া দরকার বিদেশে, যেখানে কাজ করার অনেক সুবিধে পাবে। কলকাতার লোকেদের মধ্যে হিংসা আর দলাদলি বেশি। পরশ্রীকাতরতা প্রচণ্ড। অনি হাঁপিয়ে ওঠে।

বড় ছেলে শঙ্খর জন্মের ঘটনাটা মনে পড়ে অনির। সেদিন ছিল সোমবার। বিকেল চারটা। অনি অফিস যায়নি। সর্বাণী হঠাৎ বলে, "চলো, একটু ঘুরে আসি। মোড়ের একটা দোকানে ছাতু পাওয়া যায়। চলো কিনে আনি।"

"ছাতু খাওয়া কোথায় শিখলে?"

"কেন জানি না ছাতু খেতে ইচ্ছে করছে।"

"বুঝবে মজা, ছেলে গড়গড় করে হিন্দি বলবে এখন ছাতু খেলে। বাংলায় থাকবে হিন্দি টান।" অনি আর সর্বাণী হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার মোড়ের দোকানে আসে। ছাতু কেনার পর হঠাৎ সর্বাণী বলে ওঠে—"অনি, গেট রেডি। সময় হয়েছে। ব্যথাটা বেশ জোড়ে আসছে।" মোড়ের মাথায় একটা ট্যাক্সি ছিল। অনি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফেরে। পূর্ণিমা ট্যাক্সি দেখে অবাক।

"তাড়াতাড়ি চলুন শিশুমঙ্গলে।" অনি সঙ্গে একটা বই নিয়ে নেয়— আরভিং স্টোনের 'প্রাইজ'— নোবেল প্রাইজের ওপর। বইটা সদ্য কিনেছে। পড়া হয়নি এখনও। পূর্ণিমার জিনিসপত্র গোছানোই ছিল। অনি পথে হেমছায়াকে তুলে নেয়। সোজা শিশুমঙ্গলে। সারা রাত পালা করে হেমছায়া আর পূর্ণিমা সর্বাণীর কাছে। অনি ভাবনা কাটাবার জন্য বইটা পড়ছে। মনে মনে ভাবছে হয়তো বড় ছেলেও একদিন নোবেল প্রাইজ পাবে।

ভোর তখন চারটে। পাশের মন্দিরে শঙ্খ বেজে উঠল। পূর্ণিমা ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে আসে।

"অনি, তোমার ছেলে হয়েছে। ঠিক তোমার মতো দেখতে। কী নাম দেবে? ঠিক করেছ?"

অনি বলে— "আমার ছেলের নাম হবে শঙ্খ।"

পূর্ণিমা ছুটি নিয়েছেন মাস তিনেকের। শঙ্খকে বড় করার দায়িত্ব যখন তাঁর ওপর। "জান অনি, সারাজীবন শুধু দুঃখ পেয়ে গেলাম। এবার ভগবান এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন। জান তো, আসলের চেয়ে সুদ বেশি। শঙ্খ আমার সব দুঃখ ঘুচিয়েছে। ওর দিকে তাকাতে তাকাতে আমার কোথা দিয়ে সময় চলে যায়। বুঝতে পারি না।"

গড়িয়াহাটার মোড়ে একদিন পুরনো বন্ধু বারীনের সঙ্গে দেখা অনির। জি এস আই-তে চাকরি নিয়ে লক্ষ্ণৌতে ছিল বারীন। কলকাতায় কয়েকদিন হল ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে। বারীনকে দেখে শিমুলতলার কথা মনে পড়ল।

চা খেতে খেতে পুরনো দিনের কথা হল। যাদবপুরের বন্ধুবান্ধবদের কথা। "অনি, চল-না আমাদের ফ্ল্যাটে একটু ঘুরে আসবি। অদিতি দেখলে খুশি হবে। মোড়ের কাছেই গোলপার্কে বাড়ি।"

বারীনের বেশ ছিমছাম সুন্দর ফ্ল্যাট। এসব পাড়ায় থাকলে ট্রেনের সুবিধে। বালিগঞ্জ স্টেশনটা কাছে। নাকতলা থেকে বাসে করে বরানগর যাওয়া ঝকমারি।

"বারীন, এ-পাড়ায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়? ভাড়া বেশি হলে পারব না।"

"বলবি তো? আমার একজন চেনাশোনা দালাল আছে। ও-ই আমাকে এই ফ্ল্যাটটা পাইয়ে দিয়েছে। কাকুলিয়া রোডে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা ফ্ল্যাট

দেখিয়েছিল। এক্ষুনি চল, বেশি ভাড়া নয়। নতুন বাড়ি। চারশো টাকা ভাড়া। যদি দালালকে ধরতে পারি, তোর পক্ষে খুব সুবিধে হবে। বিশেষ করে ট্রেনে করে সোজা বরানগরে যেতে পারবি।"

মোড়ের চায়ের দোকানে বাড়ির দালালকে পাওয়া গেল। এক মাসের অ্যাডভান্স দিতে হবে।

"চলুন, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমার কাছে চাবি আছে। বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারি। ৭৮ কাকুলিয়া রোড— দোকান, বাজার, স্টেশন সব কাছে।"

অনির বাড়ি দেখে পছন্দ হল। ঠিক করল সামনের মাসে বালিগঞ্জে উঠে আসবে। নাকতলার বাড়িতে এখন প্রচুর ভিড়। ওদের একটা নিজস্ব ফ্ল্যাট দরকার। মাসখানেকের মধ্যে অনি কাকুলিয়ার বাড়িতে চলে এল সর্বাণী আর শঙ্খকে নিয়ে। এবার থেকে নতুন জীবন শুরু করা দরকার।

অনির কাকুলিয়া বাড়িতে উঠে আসা পছন্দ করেননি আনন্দশেখর ও হেমছায়া। রাগ করেই অনেকদিন কাকুলিয়ার বাড়িতে আসেননি। ঈশান মাঝে মাঝে চিত্রাংশু থেকে ছবি আঁকা শিখে বউদির সঙ্গে দেখা করতে আসে। সঙ্গে গার্ল ফ্রেন্ড সোমা। বড়পিসির ছেলে রঙ্গনও আসে। সঙ্গে ওরও গার্ল ফ্রেন্ড সংগীতা। ঈশান ও রঙ্গন দু'জনেই ইঞ্জিনিয়ার। এখন দু'জনেই ছবি আঁকা শিখছে। গান গাইছে। বাঁশি বাজাচ্ছে। চাকরিবাকরি করার খুব ইচ্ছে নেই। ওদের ভাবী বউরা দু'জনেই সত্যিকারে আর্ট কলেজের ছাত্রী। সর্বাণীর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল সোমা আর সংগীতার। সময় পেলেই ওরা গল্প করতে চলে আসে দিনের বেলা।

হঠাৎ এক ছুটির দিনে আনন্দশেখর কাকুলিয়ার বাড়িতে এসে হাজির। থমথমে মুখ।

"অনি, একটা বিপদ হয়ে গেছে। আকাশ একটা পাশের বাড়ির মেয়েকে ভালবাসত। খুবই ভাল মেয়ে। নাম চন্দ্রানী। বটানি নিয়ে এম এস্‌সি পড়ছে। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে ওদের বাড়িতে খুব আপত্তি ও অশান্তি।"

"আপাতত চন্দ্রানী আমাদের বাড়িতে আছে। কালকেই ওদের বিয়ে। কাউকেই নেমন্তন্ন করিনি। শুধু নিজেদের লোক। তুই আর সর্বাণী আসবি।"

সর্বাণী বলে, "তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি একটু কেনাকাটা করে নিয়ে যাব সন্ধেবেলা— বিয়ের জন্য যা যা দরকার। চন্দ্রানী মেয়েটা খুব ভাল। আমার সঙ্গে ভাল করেই আলাপ আছে। কোনও চিন্তা কোরো না।"

আনন্দশেখর বলেন, "এরকমভাবে আকাশের বিয়ে হবে ভাবতে পারিনি। কী আর বলব। সব অদৃষ্ট। যা হোক, সর্বাণীর কথায় নিশ্চিন্ত হলাম।"

ছোট করে বাড়ির ভেতর আকাশের সঙ্গে চন্দ্রানীর বিয়ে হয়ে গেল। নিজেদের

ভাইবোন ছাড়া বাইরের কাউকেই ডাকা হয়নি। এমনকী ভূপালে ইন্দ্র খবরটা পেয়ে চমকে গেল। ছোড়দার বিয়েতে আসতে পারেনি বলে।

* * *

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে অনি। চিঠিটা খুলতে চায় না। সকালে একপ্রস্থ চা খাওয়া হয়ে গেছে। চিঠিটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজ পেরিয়ে আই এস আই ক্যান্টিনের উল্টোদিকে ছায়াঘেরা বাঁধানো পুকুরের পাশে এসে বসে। পেপারটা সম্বন্ধে কী লিখেছেন প্রফেসর জোসেফ গ্রেগরি জানতে কৌতূহলী।

অনি চিঠিটা খুলে পড়ে। অনির পেপারটা খুব প্রশংসা করেছেন অধ্যাপক। শেষ প্যারাটা অনেকবার পড়ল অনি। ভুল দেখছে না তো? প্রফেসর গ্রেগরি ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভিজিটিং প্রেফেসর হিসেবে বার্কলিতে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরু। বেশি সময় নেই। পাসপোর্ট ভিসা অনেক কিছু করতে হবে। এরকম অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ পেয়ে অনি দারুণ খুশি। হাঁপিয়ে উঠেছিল আই এস আই-তে। সর্বাণীকে মনের থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ওর বাড়ির লোকেরা। সংসারের মালিন্য আর ভাল লাগে না। এবার দু'চোখ মেলে দুনিয়া দেখবে। অনি চিঠি পেয়ে সোজা কাকুলিয়ার দিকে রওনা দিল। সর্বাণীকে সবচেয়ে আগে জানাতে হবে সুখবরটা।

অনির এক বন্ধু দীপকের শ্বশুর পাসপোর্ট অফিসের বড় কর্তা। অনি একদিন দীপকের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দীপক শুনে বলল—

"দারুণ খবর অনি। কালকে সকালে আমার বাড়ি চলে আসিস। আমি তোকে পাসপোর্ট অফিসে নিয়ে যাব। আলাপ করিয়ে দেব। আমার শ্বশুরমশায় আগেকার দিনের আই এফ এস। বহুদিন লিবিয়ার অ্যাম্বাসাডর ছিলেন। তার আগে ইংল্যান্ডে। আমার বউ তো ইংল্যান্ডেই বড় হয়েছে। খুব পড়াশুনা ভালবাসেন অনিরুদ্ধ সেন। আমার শ্বশুরমশাই।"

পরের দিন দীপক অনিকে নিয়ে গেল পাসপোর্ট অফিসে। মিস্টার সেন খুব আন্তরিকভাবে অনির সঙ্গে কথা বললেন। খুব খুশি বার্কলিতে যাচ্ছে শুনে। "দারুণ ইনটেলেকচুয়াল পরিবেশ অনির্বাণ। ভীষণ ভাল লাগবে। এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার পাসপোর্ট তৈরি থাকবে।" তাঁর সঙ্গে দেশবিদেশের কত গল্প হল অনির। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনিদের বাড়িতে কে কে আছে? ঈশানের কথা শুনে বললেন—"এটা তো ভাল নয়। বাবা মা কষ্ট করে হস্টেলে রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছে। এখন বাঁশি বাজাচ্ছে আর ছবি আঁকছে। তোমার ভাই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। এম এন দস্তুর আমার বিশেষ বন্ধু।"

অনিরুদ্ধ সেন কথা রেখেছিলেন। ঈশান যখন বি ই কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং

পাস করে বছরখানেক বাড়িতে বসে ছিল, তিনি ঈশানের জন্য দস্তুরে চেষ্টা করেছিলেন। দস্তুরের চাকুরি নিয়ে ঈশান বহু বছর লিবিয়াতে চাকরি করেছিল আশির দশকে। ঈশান এখন সেখানকার চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

ভিসা নিতে আমেরিকান কনসুলেটে এসেছিল অনি। কনসুলেট জেনারেল অল্পবয়সী আমেরিকান। অনির চেয়ে একটু বড় হবেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণের চিঠি দেখে বললেন, "ডক্টর চ্যাটার্জি, ইউ সি বার্কলি ইজ ওয়ান অব দি টপমোস্ট রিসার্চ য়ুনিভার্সিটি ইন দি ইউ এস এ। কনগ্রাচুলেশন্‌স। ইউ মাস্ট বি ভেরি গুড ইন ইওর ডিসিপ্লিন টু গেট দিস ভিজিটিং প্রফেসরশিপ। আই উড বি হ্যাপি টু ইস্যু ইউ এ গ্রিন কার্ড— দি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি, সো দ্যাট ইউ ক্যান স্টে ইন অ্যামেরিকা অ্যাজ লং অ্যাজ য়ু লাইক। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিনিউ ইয়োর ভিসা এনি মোর।"

অনি রাজি হয়ে যায়। ভাল লাগে নবীন কনসুলেট জেনারেলকে। বিদায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলে আসে। নতুন করে শুরু করতে হবে জীবন নতুন দেশে। আমেরিকায়। ভারতের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যাবে। চরৈবেতি। এবার আর পেছনে ফেরার পালা নয়। বিদায় কলকাতা। 'ফ্রম ক্যালকাটা টু ক্যালিফোর্নিয়া': "যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল", উঠেছে আদেশ।... "বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ।"

সালের পয়লা জানুয়ারি অনি পৌঁছল স্যানফ্রান্সিকো। সেখানে থেকে বাসে করে বার্কলি শহর। পকেটে মাত্র আট ডলার। ক্যাম্পাসের কাছেই ইনটারন্যাশন্যাল হাউস— পাহাড়ের কোলে। সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে অনির। ছবির মতো সুন্দর শহর বার্কলি। তেমনি সুন্দর ক্যাম্পাস। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল। তার পর রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে— স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটুশনে বছর তিনেক। সেই সময় সর্বাণী ও শঙ্খ, কলকাতা থেকে চলে এসেছে। শঙ্খের তখন বয়স বছর তিনেক। সেই সময় ইন্দ্রদের একটা রেকর্ড পৌঁছয়— অশ্বমেধের প্রথম গানের রেকর্ড। অসাধারণ গানের সংকলন। অশ্বমেধের ব্যান্ডে আছে চিরকালের বিপ্লবী ইন্দ্র— এর জন্মদাতা। ওর সঙ্গে আছে ঈশান, উৎসব, রঙ্গন, এব্রাহাম। ইন্দ্রই বাংলা গানে প্রথম শুরু করল নতুন যন্ত্রের অনুষঙ্গ— কি বোর্ড, চেলো, গিটার, ড্রাম, পারকাশন, স্যাক্সোফোন। বাংলা আধুনিক গানে হারমোনিয়ামের বদলে ইন্দ্রই প্রথম গায়কের হাতে গিটারের চলন শুরু করল। ইন্দ্রই শুরু করল জীবনমুখী গান।

গিটারে পাশ্চাত্য সংগীতের কাঠামোতে বাংলা গানের পথিকৃৎ ইন্দ্র। শিল্পী যেমন নানা ছবি আঁকে, ইন্দ্র মেশালো বাউল, ভাটিয়ালির সঙ্গে ফ্লেমিঙ্কোর মরমিয়া সুর। সুরের জগতে এক নতুন মায়াজাল সৃষ্টি করল ইন্দ্র। কলকাতার সংগীত রসিকদের কাছে পৌঁছে গেল বিশ্বের সুরের ডালি। ভাষা, সংস্কৃতি,

ট্রাডিশন ভেঙে গানের জগতে নতুন জোয়ার আনল ইন্দ্র। সর্বজনীন এই গানের আবেদন। চমকে গেল কলকাতার সুধীজন। বাংলা আধুনিক গানে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করল 'অশ্বমেধের' রেকর্ড। অনি, সর্বাণী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রেকর্ড শোনে— গানগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে ওদের। যেমন কথার আবেদন, তেমনি সুরের নতুনত্ব। ইন্দ্রর জন্য দারুণ গর্ব হয় অনির। মনে পড়ে দমদম জেলের কথা—"দাদা, কতদিন গিটারটা বাজাইনি।" প্রাণভরে বাজা ইন্দ্র। দূর থেকে আশীর্বাদ করি, মনে মনে ভাবে অনি।

গান থেকে চলচ্চিত্র। ফাদার গাঁস্ত রবেজের চিত্রবাণীতে জড়িয়ে পড়েছে ইন্দ্র। নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম দেখে। তর্কের তুফান তোলে— কে ভাল পরিচালক সত্যজিৎ, মৃণাল সেন, না ঋত্বিক ঘটক। ইন্দ্র ঋত্বিকের ভক্ত হয়ে ওঠে। হয়তো নিজের বোহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে মিল পায় ঋত্বিক ঘটকের। 'তেরো নদীর পারের' বাদল সাহার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয় এই সময় ইন্দ্রর। খুব অনুপ্রেরণা দিতেন বাদল সাহা— "ইন্দ্র, তুই পারবি নতুন করে ফিল্ম করতে। তোর আছে বিপ্লবী মন, শিল্পীর চোখ, আর গায়কির কান। তোর পিছুটান নেই। তোর কাউকে খুশি করতে হবে না ইন্দ্র। তুই চিরকালের সৃষ্টিপাগল, বাউলক্ষ্যাপা।"

চিত্র-পরিচালক বাদল সাহা দেখে যেতে পারেননি ইন্দ্রর প্রথম বাংলা কাহিনী-চিত্র "শঙ্খিনী"। অল্প বাজেটে তৈরি এক অসাধারণ চলচ্চিত্র বেদে আর বেদেনীদের নিয়ে। ইন্দ্র প্রথম ছবিতেই রাষ্ট্রপতির রৌপকমল পায় শ্রেষ্ঠ বাংলা কাহিনীচিত্র হিসেবে। সে বছর অ্যান্টার্কটিকা থেকে অনি কলকাতায় যায়। ইন্দ্র সবাইকে নিয়ে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে 'শঙ্খিনী' ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছিল। হঠাৎ অনির মনে পড়ল— এই ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতেই ইন্দ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। ভাগ্যের কী পরিহাস। ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতা যাবার পথে ইন্দ্রর কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে অনির। কলকাতা গিয়ে ইন্দ্রকে আর দেখতে পাবে না ভেবে অনির বুকটা দুঃখে মুচড়ে উঠল।

সে বছর একটা জিনিস অনির ভাল লাগেনি ওদের নাকতলার বাড়িতে। এই নিয়ে ইন্দ্রর সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়। বিয়ের পর অনি আর সর্বাণী যে ঘরটায় থাকত, সে ঘরে ইন্দ্রর এক বন্ধু থাকে বহুদিন ধরে। ঘর নোংরা হয়ে আছে, চারিদিকে বইপত্র ছড়ানো। সিগারেটের ছাই টেবিলের ওপর উঁচু হয়ে আছে। "দাদা, আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে মল্লার মজুমদার, নামকরা কবি। দারুণ গান গায়। দুর্দান্ত লেখে।"

"মল্লারদা, এই হচ্ছে আমার দাদা— অনির্বাণ।"

অনি কথা বলতে গিয়ে বুঝল— মল্লার গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। ঘোলাটে চোখ। বিরাট দাড়ি। ভরাট গলা। দুর্বোধ্য, অসংলগ্ন কথা। চোখ তুলে তাকায় না। সাপুড়ে যেমন সাপকে বশ করে— মল্লার ইন্দ্রকে তেমন বশ করেছে।

অনির মনে হল ইন্দ্র এখান থেকে বের হতে পারবে না। মল্লারও ডুববে, সঙ্গে ইন্দ্রকে নিয়ে যাবে। মল্লারকে দেখে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর শাহজীর কথা মনে পড়ল-- অন্নদাদিদির প্রেমিক। সাপুড়ে শাহজী, শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রকে বশ করেছিল যেমন ভাবে।

অনি মাকে জিজ্ঞেস করে— "কতদিন ধরে মল্লার এই বাড়িতে আছে?"

"তা বছরখানেক হবে। ওর অ্যামেরিকান বউ ক্যাথি সাউথ পয়েন্টে পড়াত। খুব লক্ষ্মী বউ ছিল। ওর দুটো ফুটফুটে সন্তান— একটা ছেলে, একটা মেয়ে। মল্লারকে আর সহ্য না করতে পেরে ক্যাথি বাচ্চাদের নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেছে। মল্লারকে দেখার কেউ নেই। ইন্দ্রই ওকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। অন্তত খাওয়া-শোয়ার একটা জায়গা হয়েছে। ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই।"

"তোমাদের অসুবিধে হয় না? একটা বাইরের লোক দিনের পর দিন একটা ঘর দখল করে আছে? আর তোমরা সবাই গাদাগাদি করে অন্য দুটো ঘরে? বাড়িতে একটু প্রাইভেসিও দরকার।"

"কী করব বল। ইন্দ্রর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বললেই ও চিৎকার, চেঁচামেচি করে।"

"আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না এই ব্যাপারটা। মল্লারের চাহনিটাই কেমন যেন অস্বাভাবিক। আমার মনে হয় ওকে দিয়ে তোমাদের চরম সর্বনাশ হবে।"

হেমছায়া স্বীকার করেছিলেন পাঁচ বছর পরে— যখন মল্লার চরম সর্বনাশ করেছিল।

ইন্দ্র তখন গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল মল্লার মজুমদারকে। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেশ-কিছু বছর পরে এই মল্লারের মৃত্যুশয্যায় ইন্দ্র হাসপাতালের সমস্ত খরচ দিয়েছিল।

১৫

প্লেনে কলকাতা যাবার পথে হঠাৎ চিন ভ্রমণের কথা মনে পড়ল অনির। চিনে থাকাকালীন হঠাৎ বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে অনি আর সর্বাণী কলকাতায় ফিরে আসে মে মাসের প্রথম দিকে। ইন্দ্র খুব চিন দেশের ভক্ত ছিল। ইন্দ্রর কথা ভাবতে ভাবতে চিনের কথা মনে পড়ল।

সালের মার্চ মাসে অনি চিনদেশে একটা ফসিল একসপিডিশনে যায়। সঙ্গে কিছু ছাত্র সহকর্মী ও পুরনো বন্ধু মোর্ট আর তাঁর স্ত্রী জোয়েন। জোয়েন ভাল ফোটোগ্রাফার। মোর্ট জিওলজিস্ট— একই সঙ্গে ওরা একসময় জর্জ ওয়াশিংটন য়ুনিভির্সিটিতে পড়ত। ন্যাশনাল ফাউন্ডেশনে অ্যান্টার্কটিক রিসার্চের বড় কর্তা

ছিল মোর্ট। চায়না এই প্রথম বিদেশীদের জন্য ফসিল অনুসন্ধানের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি দিয়েছে আর্থিক সাহায্য। সর্বাণীও অনির সঙ্গে অনেক অভিযানে আগে গেছে। চিনেতেও যাচ্ছে। ওদের ছোট ছেলে অর্ঘ্য তখন বছর দুয়েক, বড় ছেলে শঙ্খ দশ বছর। ঠিক হল সর্বাণী কলকাতায় দুই ছেলেকে মার কাছে রেখে বেজিং-এ আসবে। সেখানে অনি দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার পর দক্ষিণে ইউনান প্রদেশে লুফং বলে ছোট্ট একটা গ্রামের কাছে অভিযান। এই অভিযানে সাহায্য করবে বিখ্যাত চাইনিজ প্যালিওন্টলজিস্ট ডক্টর ডং ও তাঁর তিন ছাত্র।

সর্বাণী কলকাতায় মা'র কাছে শঙ্খ আর অর্ঘ্যকে রেখে বেজিং-এ চলে আসে। অনি এর আগেও চায়না ঘুরে গেছে বছরখানেক আগে। বেশ-কিছু চেনাজানা হয়েছে লোকেদের সঙ্গে। অনি বুঝতে পারে কোথায় যেন একটা আত্মিক মিল আছে চিনাদের সঙ্গে। সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেজিং দেখাচ্ছিল টুরিস্ট গাইড— নাম 'মে'। সুন্দর সপ্রতিভ চিনা মেয়েটি। ভাল ইংরেজি বলে। টিয়েনমেন স্কোয়ারে আসার পর সর্বাণী হঠাৎ মে'কে জিজ্ঞেস করে "মাও সে তুং-এর মেমোরিয়াল দেখলে কেমন হয়? কী বিরাট এই স্কোয়ার— পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়— তাই না? মস্কোর রেড স্কোয়ার থেকে অনেক বড় হবে।" সর্বাণী বেজিং-এর গাইড বইটা পড়তে পড়তে বলে।

মে উত্তর দেয় না। একটু পরে বলে, "আমি একটা গল্প বলব। তার পর যদি তোমাদের যেতে ইচ্ছে করে মাও-এর মৃতদেহ দেখতে কাল তোমাদের নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। বেজিং-এ অনেক কিছু দেখার আছে। চেয়ারম্যান মাও-এর মেমোরিয়াল হলে গিয়ে কী হবে?"

মে ওদের নিয়ে যায় পুরনো রাজপ্রাসাদে। বৌদ্ধমন্দিরে। সিল্কের ফ্যাক্টরিতে। স্বর্গের মন্দিরে, পার্কে, সরোবরে। সন্ধেবেলা ডিনার খাবার সময় অনি জিজ্ঞেস করে—"মে, চেয়ারম্যান মাও তোমাদের অত বড় নেতা— চিনের বিপ্লব এনেছেন। আমরা দূর থেকে কত মহান ভাবি মাও সে তুং-কে। মনে হচ্ছে তোমরা কেউ খুশি নও চেয়ারম্যান মাও-এর ওপর? কী ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করে। মাও সে তুং কি চিনাজাতির জনক নয়?"

অনির কথা শুনে মে'র মুখ ম্লান হয়ে যায়। বহুদিনের চাপা বেদনা যেন বেরিয়ে আসছে। একটু থেমে কথা বলা শুরু করল মে। মর্মস্পর্শী সেই কাহিনী:

"সারা পৃথিবীতে মাও সে তুং-এর নামে একটা মিথ তৈরি হয়েছে। স্ট্যালিনের মতো মাও ছিল স্বেচ্ছাচারী। শেষের দিকে তার অত্যাচারে হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী অকারণে মারা গেছে, লাখ লাখ লোকের জেল হয়েছে। মাও সে তুং চিনের বুদ্ধিজীবীদের শেষ করে ফেলেছে। ওর সবচেয়ে বড় সাপোর্ট

কৃষিজীবীদের কাছ থেকে। সারা চিনদেশ ঘুরে দেখো, কোথাও মাও সে তুং-এর স্ট্যাচু পাবে না। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। চেয়ারম্যান মাও চিনের বিপ্লব এনেছিল ঠিকই— নতুন চিনের জন্মদাতা মাও সে তুং সন্দেহ নেই। সেই মাও শেষের দিকে বুঝেছিল ওর ক্ষমতা, আধিপত্য ক্রমশই কমে আসছে। ক্ষমতা এমন একটা জিনিস একবার পেলে কেউ ছাড়তে চায় না। শেষের দিকে মাও সে তুং হয়ে গিয়েছিল অত্যাচারী, নিষ্ঠুর— নিজের ক্ষমতা রাখার জন্য। আমাদের পরিবারের ঘটনা তার সাক্ষী। তৈরি করেছিল রেডগার্ড। হিটলারের ব্রাউন শার্টের মতো এই রেডগার্ড।